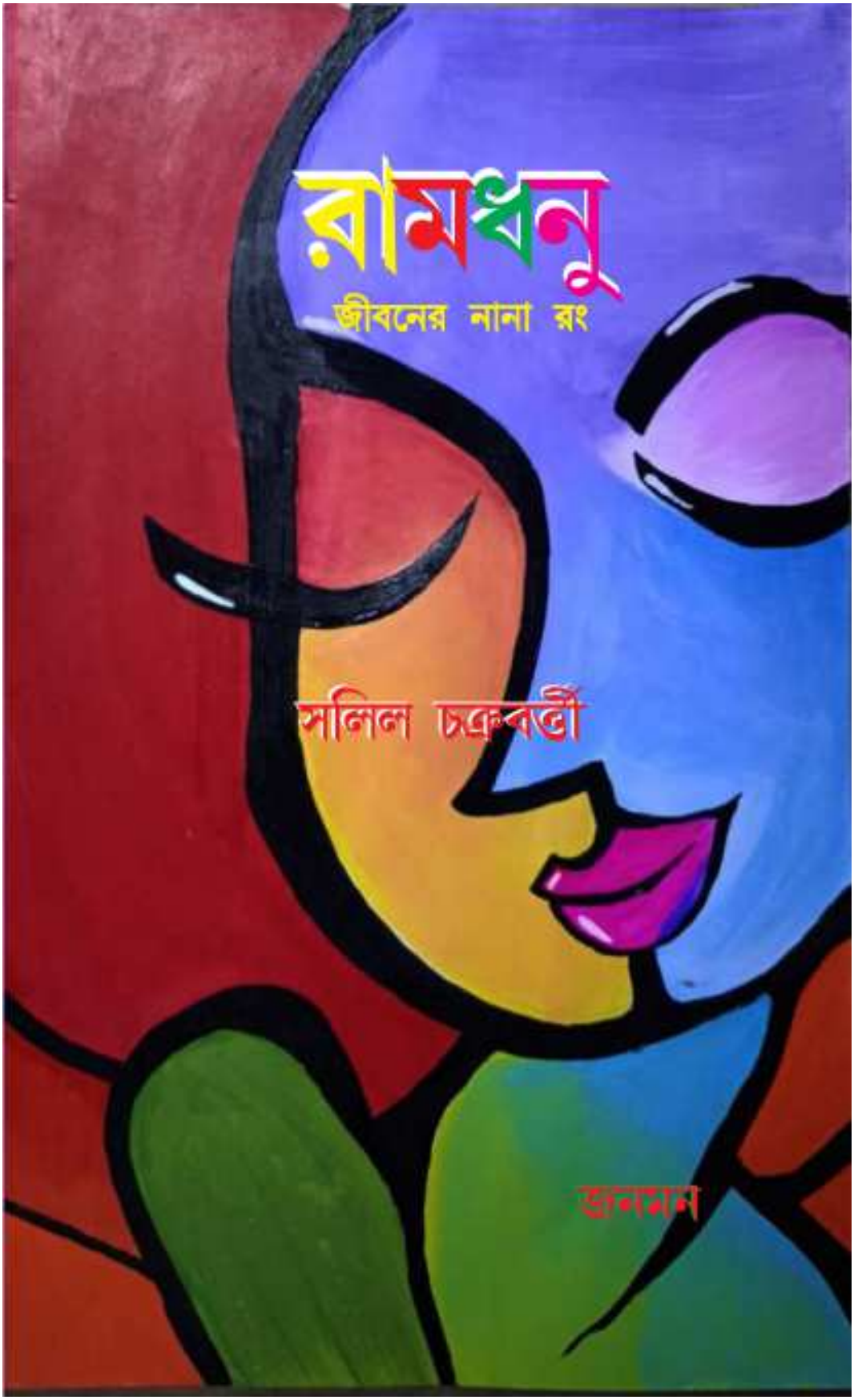
রামধনু
জীবনের নানা রং
সলিল চক্রবর্তী
জ্ঞানমান

রামধনু

জীবনের নানা রং

সলিল চক্রবর্ত্তী

জনমন
গৌরাঙ্গভবন, মধ্য দুর্গানগর (রেল টিকিট কাউন্টারের বিপরীতে)
পোস্ট অফিস ঃ রবীন্দ্রনগর, কলকাতা – ৭০০০৬৫

RAMDHANU

A COLLECTION OF BENGALI STORY Written by

SALIL CHAKRABORTY
Ph. 9674172897

Edited by

Samudra Biswas
Ph. : 8582833621

Rs. 200.00

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব : আমার স্ত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী চক্রবর্ত্তী
এবং
আমার দুই কন্যা প্রতিভা চক্রবর্ত্তী ও পৌরবী চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক : সমুদ্র বিশ্বাস
জনমন প্রকাশনী, মধ্যদুর্গানগর, গৌরাঙ্গভবন,
কলকাতা – ৭০০০৬৫, ফোন ঃ ৮৫৮২৮৩৩৬২১

প্রচ্ছদ অলংকরণ : প্রতিভা চক্রবর্ত্তী

মুদ্রক : ডি. এন. গ্রাফিক্স
৩৬, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা – ৭০০০০৯

অক্ষর বিন্যাস : বিকাশ চৌধুরী
উত্তর বাদড়া (নেতাজী লেন), কলকাতা – ৭০০০৭৯
যোগাযোগ : ৮০১৩৮০৬০৯০

পরিবেশক :
সবুজ স্বপ্ন
এ/২, সুভাষ নগর সুপার মার্কেট, দ্বিতল, দমদম ক্যান্টনমেন্ট
পোস্ট ঃ রবীন্দ্রনগর, কোলকাতা – ৭০০০৬৫
মোবাইল ঃ ৭২৭৮৮৩৯১১১

অনুদান : ২০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আমার পিতা স্বর্গীয় কার্ত্তিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
ও
মাতা স্বর্গীয়া কাবেরী চক্রবর্ত্তী-কে

আমার কথা

গল্প, কবিতা কখনো যে লিখব তা ভাবিনি। ইচ্ছা যে ছিলনা তা বলবনা। ইচ্ছার বীজ বপন হয়েছিল অনেক ছোট বেলায়। ছোট ভাইকে সন্তুষ্ট করতে না দেখা স্বপ্নের ঘটনার অবতারণ করতে হতো। একটু বড় হওয়ার পর আমি বড়দির নজরে পড়ে গেলাম। আমার চিন্তা ভাবনাকে বড়দি খাতায় লিখে ছোটছোট গল্পের রূপ দিতেন। তারপর দিদির বিয়ে হয়ে গেলে ভাবনা চিন্তায় ভাঁটা পড়ে যায়। স্কুল, কলেজ জীবনে স্বেচ্ছায় অল্পস্বল্প লিখেছি, তবে উৎসাহ হীনতায় সে সবও অস্তাচলে।

কর্ম জীবনটি আমার সাহিত্য চর্চার ভিন্ন মেরুতে। খরিদ্দাররূপী কিছু জ্ঞানীগুণী মানুষ প্রতি নিয়ত আমার কাছে আসা যাওয়া করেন। তাঁদের সান্নিধ্যে আমার সাহিত্য চর্চা জিয়ানো থাকে। সেই জিয়ানো সুপ্ত বাসনা আজ পাঠক কুলের দ্বারে এনে দিয়েছে সবুজস্বপ্ন অন লাইন পত্রিকার সম্পাদক রণজিৎ চক্রবর্ত্তী।

ছোটবেলা অতিবাহিত হয়েছে গ্রামে গঞ্জে প্রকৃতির কোলে থাকা প্রান্তিক মানুষ গুলোর সাথে। পরে শিক্ষা ও কর্মসূত্রে শহর কেন্দ্রিক হয়ে পড়ি। এই প্রৌঢ় বয়সে এসে সচক্ষে যা দেখেছি বা দেখছি সেগুলোই গল্পের আঙ্গিকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করাই আমার প্রয়াস। যদি ভালো লাগে তবে আমার প্রয়াস সার্থক হবে।

সলিল চক্রবর্ত্তী

জানা অজানা ভাবনায় চোখ মুছে যায়

লেখক সলিল চক্রবর্তীর পাঠক মহলে তেমন প্রচারের আলো পড়েনি। অতি সাম্প্রতিককালে তাঁর লেখা একগুচ্ছ গল্প নিয়ে রামধনু গল্প গ্রন্থ, আমি নিমিষেই পড়ে ফেললাম। বলা ভালো গল্পগুলো আমায় পড়তে বাধ্য করলো। কেননা, গল্পগুলোর বিষয় এবং চরিত্ররা আমাদের খুব চেনা। সমাজ জীবনে যাদের বিচরণ সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। যাদেরকে নিয়েই মানব সভ্যতার বেড়ে ওঠা।

কে ওখানে? নববর্ষ, বন্ধু, মর্তের মা, নিঃসঙ্গ প্রভৃতি গল্পে ভালোবাসার টানা পড়েন ও উত্তরণের আলো দেখা যায়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভালোবাসা একটি মানবিক অনুভূতি। বলা যায়, আবেগকেন্দ্রিক একটি অভিজ্ঞতা। বিশেষ কোন মানুষের জন্য, স্নেহের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ভালোবাসা। তবুও পণ্ডিতেরা ভালোবাসাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করে থাকেন। যার মধ্যে আবেগ ধর্মী ভালোবাসা সাধারণত গভীর হয়। লেখক সলিল চক্রবর্তীর গল্পগুলো বিনি সুতোর বাঁধনে বন্দি। শব্দচয়ন ও প্রয়োগ অত্যন্ত সাবলীল। সহজ সরল উপস্থাপনা। এগুলো গল্পকারের একটি শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য। যা রামধনু গল্প গ্রন্থের পাঠকদেরকে আকৃষ্ট করবে। প্রতিটি গল্পের পরতে পরতে বাঁধন অনুভূত হয়। যা গল্পকে গল্প হয়ে উঠতে সহযোগিতা করে। আব্বাস একটি মনের নাম গল্পের আব্বাস, শৈশব পর্ব (বিসর্জন) গল্পের ফটিক চরিত্র তাঁর জলন্ত উদাহরণ। পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে যে, দুঃখ হলো প্রতিকূলতা, ক্ষতি, নিরাশা, শোক, অসহায়তা, হতাশা প্রভৃতি বিভিন্ন অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানসিক যন্ত্রণার এক বিমূর্ত প্রকাশ। আমরা সর্বত্র লক্ষ্য করি যে, দুঃখে মানুষ চুপচাপ কিংবা অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং অন্যের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়। ফুলমনির আখ্যান গল্পে লেখক দুঃখের চিরাচরিত স্বল্প পরিসরের সংজ্ঞাকে ভেঙে দিয়েছেন। সাঁওতাল পরগনার জঙ্গল–জীবনে অভ্যস্ত মানুষেরা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটু সুযোগ পেলে শহরের বাবু লোকদের চাইতেও কোন দিক দিয়ে তারা পিছিয়ে পড়ে না। বরং বহু ক্ষেত্রে তারা শিক্ষিত জনজীবনে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। মঞ্চের চেয়ার দখল করে নিতে পারে। মাইক ছিনিয়ে নিতে পারে। গল্পের বৈশিষ্ট্য এবং উত্তরণ এখানেই সফল। গল্পের এই বিষয়ে ভাবনা ও উপস্থাপনার মধ্যে গতিময় নাট্যগুণ পরিলক্ষিত হয়।

অন্যের দুর্বলতাকে না খুঁজে বরং সবার আগে নিজের দুর্বলতাকে খুঁজে ঠিক

করা দরকার। কেননা, অন্যের দুর্বলতাকে সবাই বুঝতে পারে। কিন্তু নিজের দুর্বলতাকে অনেকেই খুঁজে বের করতে পারেনা। মানুষ সচরাচর সব জায়গায় রাজ করে। মানুষের রাজ করার বিচরণভূমি হল–ভালো বন্ধুদের মনের মধ্যে আর শত্রুদের মস্তিষ্কের মধ্যে। রাজ করা মানুষের চিরাচরিত স্বভাব। লেখকের গল্প গুলোর চরিত্ররা গুণান্বিত মনে উত্তরণের বার্তা দেয়। বাস্তু, নিয়তি, নেপো ভুতের ছানা, জামাইষষ্ঠী, এ প্লাটোনিক লাভ স্টোরি, অধিকার প্রভৃতি গল্পে এ সত্যতা প্রমাণ করে।

কথায় বলে, বৃক্ষের সার্থকতা যেমন ফল ধারণে। সেই রকম নৈতিক গুণাবলীর সার্থকতা শান্তি লাভে। চরম ও পরম শান্তি লাভের পথ হচ্ছে ক্রমাগত সৎ জীবন যাপন করা। লেখক এর প্রায় প্রতিটি গল্পে এমনই চাওয়া আছে। চাওয়া পাওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পগুলো ক্রমশ পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে যাবে। এ বিশ্বাস আমাকে বারবার ভাবিয়ে তুলেছে। আমি সবসময় নিজেকে সুখী ভাবি। কারণ, আমি কখনো কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করিনা। কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করাটা সবসময়ই দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে পিথাগোরাস বলেছেন, মেয়েদের চোখের দুই রকমের অশ্রু থাকে। একটি দুঃখের, অপরটি ছলনার। লেখকের অনেক গল্পে ভিন্ন দৃষ্টি ফেলা হয়েছে। তাই পাঠকের চিত্তে নব–বোধের জয়গানের সুর বেজে উঠবে। গল্পের ওঠানামা এ ধারণার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। গল্পকার জানে, মানুষের চাওয়ার ওপর নির্ভর করে পাওয়ার পরিধি। মানুষ যা চায় তা মানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের আকাঙ্খায় থাকে। মানুষ যা কিছু চায়, চাওয়ার আঁধার মানুষকেও চায়। তবে তা পেতে হলে, মানুষকে পদক্ষেপ নিতে হবে। জীবন থেকে মানুষ যা চান, তা পাওয়ার বড় রহস্য হলো— মানুষ কি চান তা জানা এবং বিশ্বাস করা যে, মানুষ তা পেতে পারে। প্রতিটি গল্পের ব্যঞ্জনা এখানেই যে, গল্পগুলো বারবার পাঠককে টানবে। এই বিশ্বাস রেখে, গল্প গ্রন্থটির ব্যাপক প্রচারের আশায় রইলাম।

সমুদ্র বিশ্বাস

কফি হাউস, কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা
২৪.১১.২০২২

সূচিপত্র

নিঃসঙ্গ	৯
স্বর্গ দর্শন	১৯
আব্বাস একটি মনের নাম	২৮
বাস্তু	৩৪
কেপমারি	৪০
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি	৪২
নিয়তি	৫১
শিউলি	৫৬
পাতাল পুরী	৬১
বিসর্জন	৬৮
নববর্ষ	৭৮
আত্মার আকুতি	৮২
কে ওখানে?	৯৪
ফুলমনির আখ্যান (প্রথম পর্ব)	১০২
ফুলমনির আখ্যান (দ্বিতীয় পর্ব)	১১১
আত্মা হইতে পরমাত্মা	১২৪
একুশে ফেব্রুয়ারি	১৩১
এ প্লেটোনিক লাভ স্টোরি	১৩৪
অধিকার	১৪৭
নেপো ভূতের ছানা	১৫৬
জামাইষষ্ঠী	১৬১
বন্ধু	১৬৬

নিঃসঙ্গ

আমি অনুশ্রেয়া ঘোষ, আমি বছর বত্রিশের একজন আনম্যারেড মহিলা। এস বি আই এর একটি আঞ্চলিক শাখার বি এম পদে কর্মরত।

আমরা প্রতিটা মানুষ ভাবি 'আমিই ঠিক', সত্যিই কি তাই? কখনো কখনো হয়তো ঠিক হয়, কিন্তু সব সময় হয় কি? যাইহোক, আজ আমি আমার জীবনের বহমান একটা ঘটনা আপনাদের কাছে শেয়ার করতে চাই—

আমার মা একা, জ্ঞান হওয়া থেকে দেখেছি আমি মামার বাড়িতে মানুষ। দাদু, দিদা, মা,আমি চার জনের সংসার। বাবার সাথে মায়ের যখন ডিভোর্স হয়, তখন মা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। আমি একদিন বাবাকে দেখেছি, তবে ভালো করে নয়, কারণ মুখের দিকে আমি ভালো করে তাকাইনি। মায়ের কাছে বাবার আচরণ সম্বন্ধে যা যা শুনেছি তাতে তাঁর সাথে আমার ভাল ভাবে কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না।

আমার দাদু অনাদি নাথ সেন, প্রফেসর ছিলেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের উপর উনি লেখালেখি করতেন। ফলে এক প্রকাশনা সংস্থায় ওনার যাওয়া আসা ছিল। এবং সেই সূত্রেই বাবার সাথে দাদুর পরিচয়। বাবা ছিলেন সেই প্রকাশনা সংস্থার প্রুফ রিডার। দাদু বাবার শিক্ষা দীক্ষা ভদ্রস্থ চেহারা, সর্বোপরি কুলীন কায়েস্থ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। উদ্যোগী ব্রাইট ফিউচার আছে বুঝে তাঁর একমাত্র কন্যা অর্থাৎ আমার মাকে ব্রজেন ঘোষ অর্থাৎ আমার বাবার হাতে সমর্পণ করেন। দিদার একটু আপত্তি ছিল, আরও সাত পাঁচ না ভেবে দুম করে বিয়ে দেওয়াটা তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি।

শুনেছি বিয়ের পর বছর খানিক মা দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে ছিলেন। কারণ দাদু, বাবা ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে যেটা ভেবেছিলেন সেটা জাস্ট উইন্ডো ড্রেসিং ছিল। মা মাস খানিকের মধ্যে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। মায়ের কাছে দিনের আলোর মতো সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। মায়ের মতো মেয়েকে বিয়ে করতে একটা পুরুষ মানুষের যে রোজগারের প্রয়োজন ছিল, বাবার তা ছিল না। মায়ের সুখ এবং শখ মেটাবার কোনোরকম ইচ্ছা বাবার মধ্যে ছিল না। সংসারে কোনো কাজের লোক ছিল না। মাকেই একা হাতে সংসারের সমস্ত কাজ করতে হতো। মনের দুটো কথাও বলার ফুরসৎ মা পেতেন না। প্রথম দিকে মা এসে দিদাকে বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো

জানাতেন। দিদা, তাঁর তো সন্তান, শুনে ভালো লাগত না, তিনি আবার দাদুর কাছে মায়ের অভিযোগগুলো জানাতেন। দাদু ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। তিনি নাকি মাকে বোঝাতেন এই বলে—বিয়ে হয় দুটি মানুষের মধ্যে, যারা একদম স্বতন্ত্র। দুটি স্বতন্ত্র মনের মধ্যে তাদের আচার আচরণ এবং মানসিকতার বিরাট ব্যবধান থাকে, যেমন এক গ্লাস স্ফটিক জল এবং এক গ্লাস লাল জল, এমদম ভিন্ন গোত্রের দুটি তরল। এখন যদি দুটি তরলকে একটি বড় কাঁচের গ্লাসে ঢালা হয় তো দেখা যাবে একটা সময় পর স্ফটিক জল ও লাল জল মিশে গোলাপি রঙের হয়ে গেছে। একটা ভিন্ন তরলে পরিণত হয়ে গেছে, ওটাই তরলের নতূন অস্তিত্ব। অর্থাৎ সময় দিতে হবে। ধীরে ধীরে দুজনে দুজনকে বুঝবে চিনবে, দোষ গুণগুলো বিশ্লেষণ করবে, তারপর উভয়েই মানিয়ে গুছিয়ে একটা মিলিত মনের জন্ম হবে।

দাদুর উদাহরণ দিয়ে উপদেশমূলক কথাবার্তা মা দিদার একদম পছন্দ হতো না। তাঁরা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটাই বুঝতেন। বাবা ছিলেন নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল। তিনি সসম্মানে বাঁচতে চাইতেন, করুণার পাত্র হয়ে নয়। ফলে মন মানুষীকতায় বাবা মা অবস্থান করতেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুতে। এমনি মান অভিমান, পছন্দ অপছন্দ নিয়েই সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে মায়ের এক বড় চাকুরে মেসো বাবার জন্য মোটা মাইনের সরকারি চাকরির খোঁজ এনে দিলেন। অসচ্ছল সংসারে মা একটু আসার আলো দেখে ছিলেন। কিন্তু বাবা বেঁকে বসেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল পছন্দের যে কাজ তিনি করছেন, কিছু বেশি উপার্জনের জন্য সেটাকে ছাড়তে পারবেন না। ফলে মায়ের সাথে সংঘাত চরম পর্যায়ে পৌঁছাল। মা তখন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। চলে এলেন পিত্রালয়ে। দাদু মাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন, মা বুঝবার চেষ্টাও করেননি। তার আর একটা কারণ ছিল দিদার মায়ের প্রতি সমর্থন। দাদু নাকি নিরাশ হয়ে বলেছিলেন কী ভুল করছ তা একদিন বুঝবে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি সেইদিনটা আমার যেন দেখতে না হয়।

আমার জন্ম হয় মামার বাড়িতেই। শুনেছি ষষ্ঠী পূজা, অন্নপ্রাশন দু-দুটো জন্মদিন বেশ ঘটা করে হয়েছিল। আমার অল্প মনে পড়ে তৃতীয় বছরের জন্মদিনের কথা। একদিন একটা বার্থডে পাটিতে গিয়ে বন্ধুর মা বাবাকে একত্রিত হয়ে আনন্দ করতে দেখে মাকে প্রশ্ন করেছিলাম আমার বাবার বিষয়ে। আমি তখন বছর সাতেকের মেয়ে। মা বলেছিলেন তিনিই আমার মা, আবার তিনিই আমার বাবা। অর্থাৎ সিঙ্গল মাদার। দিদার কাছে শুনেছি মায়ের সাথে

বাবার মিউচুয়াল ডিভোর্স হলেও দাদুর সাথে বাবার যোগাযোগ ছিল। দাদুর সাথে বাবার দেখা হলেই বাবা নাকি দাদুর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতেন। দাদু বাবাকে পুনরায় বিবাহ করার পরামর্শ দিতেন। বাবা শুনে একটু হতাশাগ্রস্ত হয়ে মৃদু হাসতেন, মুখে কিছু বলতেন না। দিদা বলতেন ওটা বাবার করুণা আদায়ের কৌশল। মা আমাকে টিউশন পড়াতে নিয়ে যেতেন বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে, পড়া শেষ করে আমাকে নিয়ে ফাইনালি একটু রাত করে বাড়ি ফিরতেন। মা খুব সেজেগুজে যেতেন, যেন অনুষ্ঠান বাড়িতে যাচ্ছেন। একজন আঙ্কেলের সাথে মা মাঝে মধ্যে দেখা করতেন। আঙ্কেল মিষ্টি হেসে আমার হাতে একটা ক্যাডবেরি চকোলেট দিতেন। একদিন মা কথা প্রসঙ্গে বলেন, তোর বাবাকে যা কিপটিমে করতে দেখেছি তাতে তোকে এত ক্যাডবেরি কিনে দিত বলে আমার মনে হয় না।

একদিন রাত্রে মা রাত করে বাড়িতে ফেরার পর দাদু দিদা আর মা তিনজনে খুব ঝগড়া করে ছিলেন। আমি আমার বয়স অনুযায়ী যে টুকু বুঝেছিলাম– ঝগড়ার কারণ ছিল ওই আঙ্কেল। মা দিদা এক দিকে আর দাদু একদিকে। দাদুর একটা কথা আমার পরিস্কার মনে আছে, তিনি দিদাকে রেগেগিয়ে বলেছিলেন, তুমি মা নও, সর্বনাশী।

এই ঘটনার কিছুদিন পর দাদু হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। দাদুর মৃত্যুতে বড় একটা ক্ষতি হয়েছিল সেটা হলো তাঁর রাষ্ট্র বিজ্ঞানের উপর লেখাগুলো অসমাপ্ত হয়েছিল। কিছুদিন পর প্রকাশক বাড়িতে এসে দিদার কাছ থেকে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়েছিলেন। এতো গেল একদিক, অন্যদিকে দাদুর মৃত্যুর পর দিদা হলেন হেড অফ দা ফ্যামিলি। মা হয়ে গেলেন মুক্ত বিহঙ্গ।

আমার জ্ঞান হওয়া থেকে বাবার সম্পর্কে কোনো ভালো মন্তব্য মা বা দিদার মুখে কখনোই শুনিনি। বরং বিরুদ্ধাচারণ করতে শুনেছি। যখন নামকরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি হলাম মা গর্ব এবং ব্যঙ্গের মিশ্রণে বলেছিলেন— তোমার বাবার কাছে থাকলে সরকারি 'ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে' স্থান হতো। আবার যখন আমি ক্লাসে স্ট্যান্ড করতাম তখন বলতেন, বাবার কাছে থাকলে কখনোই স্ট্যান্ড করতে পারতে না। কারণ টিউশন পড়াত তো পাড়ার সস্তা ছেলে ছোকরা ধরে। এই ধরনের ব্যঙ্গোক্তি শুনতে শুনতে আমি বড় হচ্ছিলাম। বাবার সাথে মেয়ের সম্পর্কটা ঠিক কেমন আমি বুঝতে পারিনি।

দাদু মারা যাওয়ার মাস ছয়েক পরে মা আঙ্কেলকে বিয়ে করেন। আমি তখন বছর বার তেরোর কিশোরী। মায়ের কাছে না দেখা বাবার নিন্দা শুনতে শুনতে

বাবা মানেই একটা খারাপ মানুষ এমনই একটা ধারণা আমার মধ্যে জন্মে গিয়েছিল। ফলে আঙ্কেলকে বাবা ভাবতে আমার কেমন জানি একটু অসুবিধা হতো। মাও দাম্পত্য জীবনে এতটাই নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন যে আমার দিকে আগের মত নজর ছিল না। আমি একটা ব্যাপারে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম, মা আমার জন্মদাতা পিতাকে নিয়ে আর কোনো নেগেটিভ আলোচনা করতেন না। দিদার কাছে শুনেছিলাম আঙ্কেল রেলে চাকরি করেন। বড় অফিসার, মোটা টাকা মাইনা পান। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ওনাকে ওয়ার্কিং ট্যুরে যেতে হয়। মাঝে মধ্যে মাকে নিয়ে যান, আমি দিদার কাছে থাকতাম। আমার ওদের সাথে যাওয়ার ইচ্ছাও হত না, কারণ ওই বয়সেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আঙ্কেল আমাকে বিয়ের আগে যে নজরে দেখতেন এখন তা দেখেন না। ওনার আমার দিকে তাকানো, কথা বলা সবই কেমন যেন আর্টিফিসিয়াল। যাইহোক মা খুব ভালো আছে ভেবে আমারও খুব ভাল লাগত। আমার কোনো অসুবিধা হয়নি কারণ ততদিনে আমি আমার বইগুলোকে বেস্ট ফ্রেন্ড করে নিয়েছি।

মায়ের এই কাঙ্ক্ষিত সুখ মনে হয় ঈশ্বর সুনজরে দেখেননি। তাই অচিরেই বিধাতার অলঙ্ঘ্য নির্দেশ এসে মায়ের জীবনটাকে আবার লণ্ডভণ্ড করে দিল। আসলে মা নিজেই আঙ্কেলের ছদ্মবেশটা ধরতে পারেননি। যখন ধরতে পারলেন, তখন বহু পথ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, ফিরে আসার আর উপায় নেই। কারণ সমাজে বসবাস করে সমাজ বহির্ভূত কাজ করা যুক্তিযুক্ত নয়।

মা যেদিন জানতে পারলেন আঙ্কেল রেলে সার্ভিস করেন না, মাকে মিথ্যা কথা বলেছেন, সেই দিন অনেক রাত অবধি মা আর আঙ্কেলের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি চলেছিল। কেন জানিনা, দিদা সেইদিন সব শুনেও ঝগড়ার মধ্যে ঢোকেন নি। আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে চুপ করে শুয়ে ছিলেন। কারণ, মনে হয় হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট হয়ে স্বভুলগুলো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠছিল। আতঙ্কে আমার ঘুম আসছিল না। অনেক রাতে মা আমার পাশে এসে শুয়ে খুব কাঁদছিলেন, আমার মনে হচ্ছিল মাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে দি, পাশে পেলাম তো বহুদিন পর কিন্তু সাহস হল না। দিদা কিছু একটা বলতে গিয়ে ছিলেন, শেষ করার আগেই মা করাল মূর্তি ধারণ করে দিদার দিকে তাকিয়ে বললেন, একদম কথা বলবে না, আমার জীবনটা তুমিই শেষ করে দিয়েছো।

মান সম্মানের দায় এড়াতে আঙ্কেল আমাদের বাড়িতেই থাকেন, কিন্তু মায়ের সাথে এক ঘরে নয়। মা প্রয়োজন ছাড়া আঙ্কেলের সাথে কথা বলেন

না। কারণ তত দিনে মা জেনে গেছেন আঙ্কেলের নিজস্ব কোনো বাসস্থান নেই, ছোট বেলায় বাবা মা মারা যাওয়ায় মামার বাড়িতে মানুষ। আগে একটা বিয়ে ছিল তার কেস চলছে, মাঝে মধ্যে কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। আগে মাঝে মধ্যে মদ পান করতেন, এখন মদ্যপ হয়েছেন। ডায়াবেটিকস রোগী হয়েও মদ ছাড়তে পারছেন না।

মা এখন আমার হায়ার স্টাডি নিয়েই বেশি উৎসাহ দেখান। এই ভাবেই বেশ কয়েক বছর কাটল। আঙ্কেল ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মা সুস্থ করার জন্য অনেক টাকা পয়সা খরচ করলেন কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। লিভার কিডনি দুটোই যে সম্পূর্ণ ড্যামেজ হয়ে গিয়েছিল।

প্রথমে আঙ্কেল, তারপর বছর খানিক পর দিদাও চলে গেলেন। মা-ও কেমন জানি জবুথুবু হয়ে গেছেন। খুব প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না। এখন ওনার একটাই চিন্তা আমাকে পাত্রস্থ করা। আমি সদ্য এস বি আই তে চাকরি পেয়েছি। আমি বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় মা আমার উপর ক্ষুব্ধ।

আমি জ্ঞান হওয়া থেকে বাবা নামক পুরুষ মানুষটির নিন্দা মন্দ শুনে বড় হয়েছি। বড় হয়ে মায়ের দ্বিতীয় সঙ্গী আঙ্কেলকে দেখেছি, একটা মিথ্যাবাদী, ঠগ, প্রবঞ্চক প্রতারক পুরুষ রূপে। ফলে এই পুরুষ জাতিটার উপর আমার চরম অনীহা জন্মে গেছে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে এসেও আমি পুরুষ মানুষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারিনি। বান্ধবীরা যখন আমার চোখের সামনে তাদের বয়সের ধর্ম পালন করতে ব্যস্ত, আমি তখন ঘর পোড়া গরুর মত রাঙা মেঘ দেখে ডরাতাম।

আমার প্রথম পোস্টিং হলো বিরাটির একটি ব্রাঞ্চে, যেখানে দাদু আমার মা-কে বিয়ে দিয়েছিলেন। আমি এই প্রথম বিরাটিতে পা রাখলাম। সব জেনেও আমার স্থান সম্পর্কিত কোনো আগ্রহ নেই। কোন কলিগের সাথে আমার অতীত নিয়ে কখনো কোনো আলোচনাও করিনি।

একদিন মাসের মাঝামাঝি সময়ে, দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ আমি আমার চেম্বারে বসে কাজ করছি, ব্যাঙ্ক ফাঁকাই ছিল। ঠিক সেই সময় বছর সত্তরের একজন ভদ্রলোক আমার অনুমতি নিয়ে আমার চেম্বারে ঢুকলেন। শ্যামবর্ণ, ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত শীর্ণকায় দীর্ঘ মানুষটার মুখের দিকে তাকাতেই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অজানা শিহরণ খেলে গেল। মৃদু হাসি মাখা করুণ মুখটার দিকে তাকিয়ে বললাম, বলুন ব্যাঙ্কের তরফ থেকে আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

—না মা, আমি ব্যাঙ্কের কোনো কাজে আসিনি, আমি এসেছি তোমার কাছে।

আমার মন যা ভেবে আঁতকে উঠেছিল সেটাই ঘটতে যাচ্ছে না তো! মনটা দৃঢ় করে বললাম, কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না।

— না মা, চেনার কথাও নয়। তুমি তো আমাকে কখনো দেখনি। হয়তো আমার কথা শুনেছ। আমার নাম ব্রজেন ঘোষ, তোমার জন্মদাতা পিতা।

কথাটা বলে ভদ্রলোক আমার দিকে অসহায় ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন, দুচোখের কোনায় চিক চিক করছে অশ্রু বিন্দু। আমি যে কখনো এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবো তা কল্পনাও করতে পারিনি। আমার মনের ভিতর সাইক্লোন বয়ে যেতে থাকলো। আমি কিছুতেই তাকে শান্ত করতে পারছি না। চোখ বন্ধ করে ভাবছি আমি এখন কি করব!!! এই মানুষটার জন্য আমার মায়ের জীবনটা তছনছ হয়ে গেছে। অন্য পাঁচটি সন্তান যেমন তাদের বাবার স্নেহ মমতায় বড় হয়, আমি তার কিছুই পাইনি। শুধু, শুধুমাত্র এই মানুষটার জন্যে। জ্ঞান হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত বাবার শূন্যস্থান পূরণে আমার এবং মায়ের যত রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার দায়ভার শুধুই এই মানুষটির। এক লহমায় এই কথাগুলো মাথায় এসে যাওয়ায় ভদ্রলোককে একদম সহ্য হচ্ছিল না। মুদিত চোখ খুলতেই দেখি তিনি ওই একই করুণ বদনে আমার দিকে চেয়ে আছেন। হয়ত আমার মুখ থেকে কিছু শোনার অপেক্ষায়। চোখ খুলতেই বললেন, তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে মা? আমি ততক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছি, বললাম—

— না, ঠিক আছি। আপনাকে একটা কথা বলি, আমি বাবা বলে কাউকে জানিনা, আর জানতেও চাই না। আমি জানি আমার জন্মের আগেই তিনি মারা গেছেন। দোহাই আপনাকে অধিকারের অজুহাতে আর এখানে আসবেন না। আপনি এখন যেতে পারেন। নিরাশ হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ছল ছল চোখে চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বললেন, ঠিক আছে মা, তুমি কষ্ট পেয়ো না, আমি আর কখনও তোমার সম্মুখে আসব না। কাঁচের ডোর পুশ করতেই আমার কেন জানি মনে হল, উনি অর্থ সাহায্য প্রার্থী হয়ে আসেননি তো! ওনাকে ডাকতেই যেন এক বুক আশা নিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আমি বললাম, আমি কি আপনাকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে পারি?

— না মা, তার প্রয়োজন নেই, আমি সেই জন্য আসিনি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

উনি চলে গেলেন, কিন্তু কেন জানিনা আমার মন থেকে উনি গেলেন না। মনটা আত্মগ্লানিতে ভরে উঠলো, মনে হতে থাকল, আমি কি ঠিক করলাম? ওনার বক্তব্যটা আমার শোনা কি উচিত ছিল না! ওনার অসহায় মুখটার কথা এবং নিজের আচরণের কথা ভেবে মনটা অপরাধ প্রবণতায় খচখচ করতে থাকলো।

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি মা বিছানাতে শুয়ে শুয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়ছেন। সাধারণত এই সময়ে মা টেলিভিশনে বাংলা সিরিয়াল দেখতে ব্যস্ত থাকেন। ওয়াশ রুম থেকে ফ্রেশ হয়ে মায়ের পাশে বসে বললাম, মা আজ বাবা ব্যাঙ্কে এসেছিলেন। বিনা ভূমিকায় আমার মুখ থেকে কথাটা শুনেই মা চমকে উঠলেন। হাত থেকে বইটি বিছানার উপর পড়ে গেল। বয়স হয়েছে তো, এখন আর আগের মতো রাগ, তেজ, জেদ নেই। নিচু স্বরে বললেন, আমি এমনি একটা আশঙ্কা করেছিলাম। আমি যে বাবার সাথে মিসবিহেভ করেছি সেটা কোড টু কোড মাকে বললাম। ভাবলাম বাবার উপর মায়ের যা ক্ষোভ তাতে মেয়ে উপযুক্ত উত্তর দিতে পেরেছে বলে খুব খুশি হবেন। কিন্তু না, আমার ভুল ভাঙিয়ে মা শান্ত নম্র ভাবে বললেন, তুমি অতটা নির্মম না হলেও পারতে, তিনি কিন্তু তোমার জন্মদাতা পিতা।

এই যে বাবা নামক মানুষটার উপর আমার এত অনীহা, তার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে মায়ের বাবা সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবাত্রা। আজ যেই মুহূর্তে মা বাবা সম্পর্কে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করলেন, আমারও কেন জানি নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। যে যে কথা বা ভাবনা থেকে বাবার থেকে দূরত্ব তৈরি করেছিলাম, এখন সেগুলো আর মাথায় আসছে না। মনে হচ্ছে বাবার সাথে দূরত্ব তৈরি হওয়ার দায় কি শুধুই বাবার ছিল!!

এই ঘটনার মাস খানিক পরে একদিন বৃদ্ধ প্রকাশক মহাশয় আমাদের বাড়িতে এলেন। তিনি জানালেন দাদুর অসমাপ্ত লেখাগুলো ব্রজেন ঘোষ অর্থাৎ আমার বাবা জীবনের অনেকটা সময় ব্যয় করে সম্পূর্ণ করেছেন। প্রকাশক মহাশয়ের ইচ্ছা বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে যেন আমরা উপস্থিত থাকি। তাঁর আর একটি প্রস্তাব হলো, যেহেতু বইটি দাদু ও বাবা মিলিত ভাবে সম্পূর্ণ করেছেন, সেই জন্য বইটি আমার হাতে প্রকাশ হোক। মা আমার অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। এবং নিজেও উপস্থিত থাকবেন বলে কথা দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে আমি আর মা বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে

উপস্থিত হলাম। অনেক মানুষের মধ্যে খুঁজতে থাকলাম বাবাকে, কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। পাশ থেকে মা আমার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বললেন তাহলে তোমার বাবা কি আসেননি!! আমি একটু অবাক হলাম বইকি। মা-ও তাহলে ভিড়ের মধ্যে বাবাকে খুঁজছেন। মনে মনে ভীষণ তৃপ্ত হলাম এই ভেবে যে, এ এক তীর্থ ক্ষেত্রের মাহেন্দ্রক্ষণ, যেখানে দুটি মনের পুনর্মিলন ঘটবে। এবং সেই মুহূর্তটা চাক্ষুষ করব আমি স্বয়ং। সময় ধর্মের কাঁটা নাড়িয়ে দেয়, বুঝিয়ে দেয় কে ভুল আর কে ঠিক। আঙ্কেল মার জীবনে না আসলে মা হয়তো বাবাকে চিনতে পারতেন না। অর্থ মানুষকে সুখ দেয়, শান্তি দেয় না। আর হঠকারিতা সুখও দেয় না, শান্তিও দেয় না, দেয় শুধু হতাশা। যেটা মা সারা জীবন পেয়ে এসেছে। মনের মানদণ্ড দিয়ে মনগুলোকে মা মেপে বুঝতে পেরেছেন কোন মনের মান কত। সাত পাঁচ ভাবছি আর ভিড়ের মধ্যে বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। এরই মধ্যে প্রকাশক মহাশয় এলেন আমাদের সুবিধা অসুবিধা খোঁজ খবর নিতে। আমি তাঁকে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। উনি বললেন, বাবার সাথে তাঁর তিনদিন আগেও কথা হয়েছে, আমি, মা যে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে আসছি সেটাও তিনি বাবাকে জানিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাকি আজ সকালে বাবা ওনাকে ফোন করে জানিয়েছেন তাঁর শরীরটা খুব খারাপ, সেই জন্য তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। প্রকাশক মশাই আরো বলেন,বাবা নাকি হার্টের প্রবলেমে দীর্ঘদিন ভুগছেন। মায়ের মুখ দেখে বুঝলাম মা কথাটা শুনে খুব ভেঙে পড়েছেন। কারণ সমাধানের তরীটা তীরে ভিড়ানোর আগেই সলিল সমাধি হলো। এর জন্য দায়ী আমি। ব্যাঙ্কে যখন আমি তাঁকে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, আমি যেন কষ্ট না পাই, তিনি আর কখনোই আমার সম্মুখে আসবেন না। তাই হয়ত আজ তাঁর এই কঠিন সিদ্ধান্ত।

বেশ কিছুদিন পর এক ছুটির দিনে আমি আর মা ঘরে বসে গল্প গুজব করে সময় কাটাচ্ছি। প্রসঙ্গত বলি, বর্তমানে মা বাবার প্রতি এতটাই সদয় যে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে বাবার উপস্থিত না থাকার দায় মা বাবার কাঁধে না চাপিয়ে নিজের কাঁধে নিয়েছেন। এবং তিনি এটাও মেনে নিয়েছেন যে তিনি যদি প্রথম থেকে আরও কিছুটা মেন্টালি এডজাস্টমেন্ট করতেন, তাহলে হয়তো তাঁদের জীবনে এমন সময় আসত না। আবার ব্যাঙ্কে বাবার সাথে দুর্ব্যবহারের কথাটা মনে পড়লেই নিজের প্রতি আমার ঘৃণা হয়। আমি জানি অতীতকে ফিরিয়ে এনে ভুল সংশোধন করা যায় না। কিন্তু ভুল স্বীকার করে তো প্রায়শ্চিত্ত করা

যায়। যেই ভাবা সেই সিদ্ধান্ত। ঠিক করলাম আমি আর মা বাবার কাছে গিয়ে আমাদের সব অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব।

যাব যাব করতে করতে মাস ছয়েক কেটে গেল। মা আমি কিছুতেই সময় করে উঠতে পারছিলাম না। সেদিন অফিস থেকে ফিরে মায়ের পাশে বসে চা খাচ্ছি। মা দুই একটা সাংসারিক কথা বলে বাবার কথা তুললেন, বললেন বাবার সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারে আমরা দেরি করে ফেলছি। আর কাল বিলম্ব না করাই উচিত ভেবে ঠিক করলাম পরের রবিবার অবশ্যই যাব।

ঠিক দুইদিন পর সকালে অফিসে যাব বলে ব্যস্ততার মধ্যে গোছগাছ করছি। বাথরুম থেকে বেরুতেই কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি, বছর বাইশ তেইশের একটি ছেলে একটা ফাইল আর একটা সাদা খাম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। কি ব্যাপার জানতে চাইলে ছেলেটি প্রথমে আমার হাতে সাদা খামটি দেয়। আমি একটু অবাক হয়ে খামটি খুলে দেখি ভাঁজ করা একটা কাগজ। কাগজের ভাঁজ খুলে দেখি একটা হাতে লেখা চিঠি। চিঠি খুলতেই—

কল্যাণীয়াসু—

অনুশ্রেয়া, আমি তোমার হতভাগ্য বাবা। কোনো উপায়ান্তর না হওয়ায় এই পত্রের অবতারণা। তবে, এই পত্রখানি যখন তোমার হাতে পড়বে তখন আমি আর এই পৃথিবীতে থাকব না।

এইটুকু পড়ে আমি চমকে উঠি,অর্থটা ঠিক পরিষ্কার না হওয়ায় ছেলেটির দিকে তাকাই। আমি কিছু বলবার আগেই ছেলেটি বলল, গত কাল জেঠু মারা গেছেন। বাবার কাছে এই ফাইল আর খামে ভরা চিঠিটি রেখে বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর যেন আপনাদের ঠিকানাতে পৌঁছে দেয়া হয়। ছেলেটির দিক থেকে চোখ সরিয়ে চিঠিটি পড়তে শুরু করলাম।

আমাকে ক্ষমা কোরো মা, তোমার মায়ের নিঃসঙ্গ জীবনের দায় শুধুমাত্র আমার। আমার অক্ষমতা তোমার জীবনকেও দুর্বিষহ করে তুলেছে। আমি আত্ম বিশ্লেষণ করে স্বভুলগুলো অনুধাবন করেছি, কিন্তু ভয় এবং লজ্জায় তোমাদের সম্মুখে যেতে পারিনি। তোমার দাদা মশাই যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন আমি তোমার খোঁজ খবর পেয়েছি। তোমাকে দেখার জন্য আমার মনটা ছটফট করতো, অনেক স্বপ্ন দেখতাম, কিন্তু বাস্তবতার কথা ভেবে আর এগুতে পারিনি। যখন আমার কানে এল তুমি বিরাটি ব্রাঞ্চে জয়েন করেছ, তখন আমার কর্তব্য, বিবেক, বুদ্ধির মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল। জয় হলো আমার অপত্যস্নেহের। তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, এটা শাশ্বত, কিন্তু

আমার রক্তের ধারা যে তোমার শরীরেও প্রবাহিত হচ্ছে, সেটা তো আমি অস্বীকার করতে পারব না। কারণ রক্ত যে কথা বলে। মানসিকতা যুদ্ধে আমি তার কাছে পরাজিত হলাম, ছুটলাম ব্যাঙ্কে, শুধুমাত্র তোমাকে দুই চোখ ভরে দেখতে। ওখানে যেটা ঘটেছিল তাতে আমি দুঃখ পাইনি, শুধুমাত্র হতাশ হয়েছিলাম। কারণ ওটা আমার প্রাপ্য ছিল।

তোমাকে উপদেশ দেওয়ার মতো সৎ সাহস আমার নেই, তবুও বলি, তুমি নিজে পছন্দ করে পাত্রস্থ হও। নিঃসঙ্গতা মানব জীবনের ধর্ম নয়। আমার ভুলে আমি ও তোমার মা এই জনঅরণ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ। বাবাকে দিয়ে বিচার করোনা, পৃথিবীর সব পুরুষ খারাপ হয় না। স্বেচ্ছা নির্বাসনে না গিয়ে মায়ের পরামর্শ নিও।

পরিশেষে বলি আমার তো তুমি ছাড়া কেউ নেই তাই আমার ক্ষুদ্র বসত বাড়ির দলিল এবং ব্যাঙ্কের বইটি পাঠিয়ে দিলাম।

তোমাদের মঙ্গল কামনা করি।

তোমার বাবা
ব্রজেন ঘোষ।

চিঠি পড়া শেষ করে অনুশ্রেয়া হাত দুটি বুকের উপর ধরে আকাশের দিকে চেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

সমস্ত ঘটনাটা আমরা অনুশ্রেয়ার মুখে শুনলাম। চিঠি পড়া শেষ করে সে কেঁদে তার বাবাকে কি বললো আমরা জানিনা, তবে কাঁদার ভাষাটা অনুমেয়–

সাশ্রু লোচনে পড়িতে না পারি,
চোখ মুছি বারে বারে
এ কোন পত্র দিলে তুমি মোরে,
বিঁধিল যে অন্তরে। ❑

স্বর্গ দর্শন

দাদু, আমাকে আজকে দুহাজার টাকা ধার দিতে হবে।

— একটা টাকাও হবে না। আমি যখনই ব্যাংক থেকে টাকা তুলি, ওমনি তোর ধার করার প্রয়োজন হয়? আর ধার মানে, তুই কি বোঝাতে চাইছিস? আজ পর্যন্ত যত টাকা নিয়েছিস তার একটি টাকাও ফেরত দিয়েছিস?

নিরঞ্জন বসু, রিটায়ার্ড আর বি আই অফিসার, সত্তরউর্দ্ধ ভদ্র লোক, সস্ত্রীক থাকেন সল্টলেকের সি. কে. ব্লকে নিজের বাংলো বাড়িতে। একমাত্র পুত্র প্রবীর বসু, চাকরি সূত্রে কমপ্লিটলি সেটেল্ড লাসভেগাসে। বাবা মাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু নিরঞ্জন বাবুই যেতে চাননি। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীরা অবশ্য বলা বলি করে যে কি কপাল একমাত্র ছেলে পাশে থাকে না। বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে কোলকাতায় ফেলে রেখে নিজেরা দিব্যি আছে। নিরঞ্জন বাবু এই মন্তব্যকে নস্যাৎ করে বলেন— ছেলেকে উচ্চ শিক্ষাতে শিক্ষিত করেছি কি স্টেট গভর্নমেন্ট-এর স্কুল টিচার হয়ে বাড়িতে থেকে বাবা মাকে দেখভালের জন্য। ওর ও তো একটা ব্রাইট ফিউচার আছে। জীবনে ও অনেক দূর যাবে, স্ট্যান্ড করবে তবেইতো শিক্ষার স্বার্থকতা। শেষ বয়সে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দেশের মাটিতে মরতে চান। রেশমি নামে এক মহিলা তাদের পরিচারিকার কাজ করে। সেও বৃদ্ধ বৃদ্ধার উপর অর্ডারসিটি চালায়। নিরঞ্জন বাবুরা সেটাই সহ্য করে রয়েছেন। কারণ দুই বছর কাজ করছে, সংসারটা ওর কন্ট্রোলে এসে গেছে। তাছাড়া নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রী দয়াময়ী বসুর বয়স হয়েছে তিনি অসুস্থ। রেশমির স্বামী সমর এক মোদো মাতাল রিক্সা ওয়ালা। তার আরো কি সব নেশা টেসা আছে। ওরা থাকে বিধান নগর ফ্লাই ওভারের কাছের বস্তিতে।

নিরঞ্জন বাবু যখন বাড়ীর বাইরে যান তখন সমরের রিক্সাতে যান। কিন্তু প্রতি মাসে পেনশন তুলে এসে ভাড়া মেটানোর সময় অতিরিক্ত এক দুশো টাকা ধার চায় পরে দিয়েদেবে বলে। কিন্তু কখনোই তা ফেরত দেয় না। টাকা নিয়ে সমর কি করে তা নিরঞ্জন বাবু ভালোই বোঝেন। ওটা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথা নেই। কারণ রেশমিই সমরের কুকর্ম গুলোকে প্রশ্রয় দেয়।

দয়াময়ী বসু হাঁটুর ব্যাথাতে দীর্ঘদিন ভুগছেন। ডাক্তার দুটো হাঁটুরই মালাইচাকী চেঞ্জ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। বৃদ্ধ বয়সে, ছেলে বিদেশে, করবো করবো করে আর করা হচ্ছিলনা। এরই মধ্যে দয়াময়ী বসু বাথরুমে পড়ে গিয়ে পায়ের হাড় ভেঙে এক দুর্বিসহ অবস্থার সম্মুখীন হলেন। লাসভেগাস থেকে

ছেলে এপেলো হসপিটালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিলো। এপেলো থেকে এম্বুলেন্স এসে দয়াময়ী বসুকে নিয়ে গেল। ডাক্তার প্রাথমিক ভাবে পায়ে বেল্ট বেঁধে দিয়েছে, তবে এক মাসের মধ্যে অপরেশন করতেই হবে। আপাতত শয্যাশায়ী, বিছানাতেই সব কিছু এবং পরনির্ভরশীল।

মুদি মসলা এদিক ওদিক হয় তা নিরঞ্জন বাবু ভালোই বুঝতে পারেন। তীব্র প্রতিবাদ কখনো করেননি, করলে ঘরে বাইরে অনেক সমস্যা আছে। কিন্তু সমরের ধার করার নামে মাঝে মধ্যে টাকা চাওয়া আর সেটা ফেরত না দেওয়াটা নিরঞ্জন বাবু একদম মেনে নিতে পারছিলেন না। তারপর স্ত্রীর এই অবস্থা, ছেলে পাশে নেই, ফলে এই বয়সে তিনিও একটু ডিপ্রেশনে ভুগছিলেন, তাই মাথা ঠিক রাখতে পারেননি। আজ অপারেশনের জন্য যেই দুই লাখ টাকা তুলতে দেখেছে ওমনি দুই একশর ধার চাওয়াটা দুই হাজারে দাঁড়ালো। দোসর আবার রেশমি, কিছু বলতে গেলে কাজ ছাড়ার হুমকি দেয়। আজও তাই হলো, অপরাধ না করে অপরাধী বানিয়ে রেশমি প্রাইভেট কারে ওঠার ঢঙে সমরের রিক্সায় উঠে চলে গেল।

চিৎপুর রেল কলোনিতে উমেশ সাহানি তার ডেরায় বসে তিন সাগরেদকে নিয়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই-এর বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করছে। বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেট এর অতি সক্রিয়তার ফলে উমেশের গ্যাং-এর অপারেশন সাক্সেসফুল করতে খুব প্রবলেম হচ্ছে। ইনফরমেশন ও ঠিকঠাক আসছে না। এই ভাবে চলতে থাকলে দুই দিন পর থেকে তো না খেয়ে মরতে হবে। হঠাৎ ট্যাপা ডেরায় ঢুকে উমেশকে বললো বস খবর আছে।

— কি খবর জলদি বল!

— খবর কি আমি জানিনা, তবে—

— তবে কি বাওয়ালি করতে এসেছিস?

— না বস, সমর নামে একটি ছেলে বলেছে পাকা খবর।

— ও শালা পুলিশের টিকটিকি নয় তো! তুই চিনিস?

— হ্যাঁ বস, ছল্টলেকে রিস্কা চালায়।

— যা, ভালো করে চেক করে চোখ বেঁধে ডেরায় আনবি, এই পচা তুই ট্যাপার সাথে যা।

ট্যাপা আর পচা মিলে সমরকে ফিজিক্যালি চেকআপ করে, ভালো ভাবে চোখ বেঁধে উমেশের ডেরায় এনে হাজির করলো। পচা সমরের চোখ খুলে উমেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সমর চারদিকে রিক্সা চালিয়ে বেড়ায় ফলে

উমেশকে তার চেনা চেনা লাগলো। সমর সেটা বলতে গেলে, উমেশ তাকে থামিয়ে আসল কথা বলতে বললো। সমর একটু গলা ঝেড়ে নিরঞ্জন বাবুর ব্যাংক থেকে নগদ দুই লাখ টাকা তোলার ব্যাপারটা বললো। তার সাথে এটাও বললো ওই বাড়ীর মেন গেটের ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছে আছে। ফলে ঢুকতে কোনো অসুবিধা হবে না। উমেশ একটু বিরক্ত হয়ে বলল সব তো বললি, ঠিকানাটা তো বলবি! ঠিকানা বলার আগে সমরের একটা শর্ত আছে, ডাকাতি করা টাকার ফিফটি পার্সেন্ট তাকে দিতে হবে। সমরের শর্ত শুনে উমেশ রেগে গিয়ে বলে এখানে বাওয়ালি করতে এসেছিস! টেন পার্সেন্ট পাবি। এই ভাবে কিছুক্ষন দর কষাকষির পর টোয়েন্টি পার্সেন্টে রফা হয়, এবং নিরঞ্জন বাবুর বাড়ীর ডুপ্লিকেট চাবি উমেশের হাতে দিয়ে, বাড়ীর ঠিকানা বলে সমর সেখান থেকে চলে যায়। উমেশ চাবিটার দিকে তাকিয়ে সেটাকে নাড়াচাড়া করতে করতে বলে শালা বেইমানের বাচ্চা রিলেশন ভালো থাকতে থাকতে ডুপ্লিকেট চাবিটা করে রেখেছে।

এদিকে রেশমি সংসারের কাজ মাঝখানে ছেড়ে যাওয়ায় দুপুরের রান্নাবান্না তো অর্ধাবস্থায় থাকলো। দয়াময়ী বসু শয্যাশায়ী, নিরঞ্জন বাবু পুরুষ মানুষ সংসারের কাজ কখনো করেননি। দুপুরে খাওয়া দাওয়া তো করতে হবে, সুতরাং রাগে গজগজ করতে করতে স্ত্রীর ইন্সট্রাকশনে সংসারের হাল ধরলেন। ততক্ষণে নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রী লাসভেগাসে ছেলেকে ফোন করে রেশমি ও সমরের কুকীর্তি গুলো আদ্যোপান্ত বললেন। ছেলে সব কথা শুনে বললো— বাবা ঠিক করেছে, ওদের মধ্যে হিউম্যানিটি বলে কিছুই নেই। যত ওদের ডিমান্ড ফুলফিল করবে ওরা তত নিউ ডিমান্ড ক্রিয়েট করবে। বাবাকে টেনশন করতে বারণ করো। বাবা হাই প্রেশারের পেশেন্ট, মেডিসিনগুলো টাইমলি খেতে বলো। আমি আমার বন্ধু মৃণ্ময়কে বলে দিচ্ছি ইমিডিয়েট একটা নুতন কাজের লোকের ব্যাবস্থা করতে। আর একটা কথা, বাবাকে বলো মেন গেটের লকটাকে চেঞ্জ করতে। এখন রাখছি, কোনো প্রবলেম এরাইজ করলে এস সুন এস পসিবল আমাকে জানিও।

উমেশ পচা, ট্যাপা, পটাইদের নিয়ে রাত বারোটায় ডেরায় একত্রিত হলো। পাঁচজন দুটো মোটর সাইকেলে যাবে, গায়ে ক্যাটারিং এর সাদা পোশাক, বুকে নামজাদা ক্যাটারারের ফল্‌স নেম প্লেট লাগানো। পাঁচটা হেলমেট, একটা এক নলা রিভলবার, গোটা চারেক ভোজালি। পচা উমেশকে বলল— বস খবর নিয়েছি, পুলিশ ভ্যান রাত সাড়ে বারোটা থেকে একটার মধ্যে সি. কে. ব্লকে

ফার্স্ট রাউন্ড দেয়, সেকেন্ড রাউন্ড দেয় রাত তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে। উমেশ বললো— ও কে, আমরা তাহলে রাত দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে অপারেশন সাক্সেস করে ফেলবো।

ঠিক রাত দুটো, নিরঞ্জনবাবুর বাংলো বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হলো উমেশ সহ পাঁচ জন পচা, ট্যাপা কেলো, এবং পটাই। এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে খুব সহজেই ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে কোলাপসিবল গেটটি খুলে ফেললো। পটাই দাঁড়ালো একদম বাইরে নিজেকে একটু আড়াল করে। কেলো মিডল ম্যান হিসাবে থাকলো কোলাপসিবল গেটের মধ্যে। ভারী একটা পাথরের চাঁই দিয়ে এক পাল্লার দরজার মাঝ বরাবর লক স্থানে এমন জোরে আঘাত করা হলো যে দরজাটা একটি ধাক্কাতেই খুলে গেল। উমেশ, পচা, ট্যাপা ঘরের ভিতর ঢুকেই চমকে উঠলো।

ঘরে লাইট জ্বলছে, এলোমেলো বিছানাতে নিরঞ্জন বাবু চিৎহয়ে মুদিত চোখে শুয়ে আছেন। নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে বিছানা ভিজে যাচ্ছে। নিরুপায় স্ত্রী কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো প্লেট লাগানো পা দুটি নিয়ে পাশে বসে আছেন। উমেশদের অসময়ে অপ্রত্যাশিত প্রবেশে বৃদ্ধার বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওরা কারা। তিনি অসহায়ের মতো কাঁদতে কাঁদতে বললেন— বাবা তোমাদের যা খুশি নিয়ে যাও, শুধু আমাদের প্রাণে মেরোনা। তাহলে মৃত্যুর সময় আমরা একটু ছেলেটাকে দেখতে পাবোনা। পাশের ঘরে টেবিলের ওপর মোবাইলটা আছে, শুধু ওইটা একটু এনে দাও বাবা। (স্বামীকে দেখিয়ে) এই মানুষটার ছয় সাত ঘন্টা আগে মনে হচ্ছে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। আমি দেখছি কিন্তু কিছু করতে পারছিনা। কাউকে যে খবর দেব তারও উপায় নেই, ফোন পাশের ঘরে, আর আমি হাঁটা চলা করতে পারিনা। তোমরা আমার সন্তানের মতো, সব নিয়ে যাও, শুধু ফোনটা একটু এনে দাও। ভগবান হয়তো তোমাদের সেই জন্যই পাঠিয়েছেন।

উমেশ এতদিন চুরি ডাকাতি করছে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনো হয়নি, এই অনাকাঙ্খিত দৃশ্য চাক্ষুস করে সে স্তম্ভিত হয়ে যায়, নির্বিকারে ভদ্র মহিলার করুন আর্তি গুলো যতটা না শুনছে ভাবছে তার থেকেও বেশি—

তখন তার পাঁচ ছয় বছর বয়স হবে। মা অসুস্থ, বাড়িওয়ালা তিন মাসের ভাড়া না দিতে পারার জন্য বাবার গলা ধাক্কা দিচ্ছে। বাবা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর মালিকের কাছে সময় ভিক্ষা চেয়েছিল কিন্তু পাইনি। সেখান থেকে লোটা কম্বল গুটিয়ে অসুস্থ্য মাকে আর তাকে নিয়ে তৎকালীন উল্টোডাঙা স্টেশনের

প্লাটফর্মে এসে ওঠে। শীতের দিনে খোলা প্লাটফর্মে থেকে অসুস্থ্য মা ধকল সইতে পারেনি। যেদিন মা তাকে আর বাবাকে ছেড়ে চলে গেল, সেইদিন ছোট্ট উমেশ খুব কেঁদেছিলো। আবার সেই ছোট চোখে আগুনও জ্বলেছিলো, বাড়ীওয়ালার আচরণ দেখে।

পচার কথায় উমেশের সম্বিৎ ফিরল— বস তুমি কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই বুড়ির লাফরাবাজি শুনবে নাকি? আধ ঘন্টার মধ্যে কাজ সারতে হবে। উমেশ একটু ভেবে বললো— পচা যা পাশের ঘর থেকে ফোনটা এনে দে

— খেপেছ বস, মোবাইল হাতে পেলে সব কেলো হয়ে যাবে!

— তোকে যা বলছি তুই তাই কর।

পচা পাশের ঘর থেকে মোবাইলটা এনে বললো— বস আবার বলছি যা বলার তুমি বলো, মোবাইল হাতে পেলে কিন্তু একশোতে ডায়াল করবে। তখন সব সমেত মামার বাড়ী গিয়ে রাত কাটাতে হবে। দয়াময়ী দেবী কেলোর কথা শুনে বললো, ঠিক আছে বাবা, আমার হাতে ফোন দিতে হবে না। কি বলতে হবে বলে দিচ্ছি আর নম্বরটাও বলছি, তুমি ফোন করো। উমেশ বৃদ্ধার কথা শুনলো, কিন্তু পচার কথাও ফেলতে পারলো না। বৃদ্ধার দেওয়া নম্বরে ফোন করলো, কিন্তু রিং হয়ে গেল। দয়াময়ী দেবী একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন এখুনি রিং ব্যাক করবে। তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতে ফোন বেজে উঠলো। উমেশ ফোন রিসিভ করে— হ্যালো বলতেই অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন করলো হু আর ইউ? নিশ্চই নিরঞ্জন বাবুর পুত্র অসময়ে মায়ের ফোনে অচেনা পুরুষ কণ্ঠ শুনে ভয় পেয়ে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন। উমেশ নিজের পরিচয় না দিয়ে বললো, আপনার বাবার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে, তাড়াতাড়ি হসপিটালে যোগাযোগ করুন। ফোনে দুই চারবার হ্যালো হ্যালো আওয়াজ হলো। উমেশ উত্তর না দিয়ে বৃদ্ধার হাতে মোবাইলটা দিয়ে কেলো পচাকে বললো, তোরা ডেরায় ফিরে যা। সাবধানে যাবি, পুলিশের নজরদারি ভ্যান আসার সময় হয়ে গেছে। কেলো রীতিমতো ভয় পেয়ে বললো, বস তুমি কিন্তু আগুন নিয়ে খেলছ! শোনো, ওদের ছেলেকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছো ব্যাস এবার চলো টাকা কড়ি নিয়ে সটকে পড়ি। ছেলে যদি থানায় ফোন করে তো— এরই মধ্যে আবার ফোন বেজে উঠলো। এবার বৃদ্ধা ধরলেন। অন্য প্রান্তের কথা ভালোভাবে না শোনা গেলেও বৃদ্ধার কথা শোনা যাচ্ছে— হ্যালো—হ্যাঁ— সব বলছি, তুমি আগে অ্যাপেলোতে ফোন করো— ও করেছ, আচ্ছা ঠিক আছে, শোনো তোমার বাবা রেশমি আর সমরের ব্যবহারে এবং পরিস্থিতির

চাপে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। হঠাৎ রাত এগারোটা নাগাদ বললেন যে তাঁর বুকে ব্যথা করছে। তারপর বললেন, গা গুলাচ্ছে, তলপেট ব্যাথা করছে। আমি বললাম পটিতে যাও। না গিয়ে খাটে উঠে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষন পর নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়াতে থাকলো, উনিও নিস্তেজ হয়ে গেলেন। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে থাকলাম। তোমাকে যে ফোন করবো সেটিও পাশে ছিল না। অগত্যা এক সময় ঈশ্বরই মুখ তুলে চাইলেন। সন্তানসম তিন চারটি ছেলে এসে আমাকে সাহায্য করছে। তুমি আবার ফোন করে অ্যাপেলোতে কন্টাক্ট কর, তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাও—

এদিকে কেলো পচারা উমেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারবেনা বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে গেল। উমেশ আস্তে আস্তে নিরঞ্জন বাবুর কাছে গেল। পায়ের তলায় হাত দিয়ে দেখলো, পা ঠান্ডা হয়নি। বুকের উপর নিজের কান রেখে দেখলো, শ্বাস প্রশ্বাস চলছে। নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রী সেলফোনটি রেখে বালিশের তলা থেকে আলমারির চাবিটা বার করে উমেশের হাতে দিয়ে বললো, একটু পরেই অ্যাম্বুলেন্স এসে যাবে, তুমি আলমারির লকারটা খুলে দেখো টাকা আছে, ওখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বার করো। চাবিটা হাতে নিয়ে উমেশ বৃদ্ধার অনুরোধগুলো শুনছিলো, কখন যে তার দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল সে বুঝতেও পারলোনা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে চোখে দাবানলের আগুনই জ্বলে আছে, নেভে তো নিই উল্টে মাঝে মাঝে তীব্র আকার ধারণ করেছে। উমেশের মনে পড়লো মা মারা গেলে তার চোখ দিয়ে এ ভাবেই অশ্রুপাত হয়েছিল। নবীন আঁখিতে সেই অশ্রু শুষে নিয়ে সেই যে দাবানল এসেছিল যেটা আজও নেভেনি। আজ এই মুহূর্তে তার শুধু মায়ের মুখটাই মনে পড়ছে। চাবিটা হাতে নিয়ে উমেশ দয়াময়ী দেবীর চোখের দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। দয়াময়ী দেবী উমেশের মনের অবস্থা উপলব্ধি করে বললেন, এখনই হয়তো অ্যাম্বুলেন্স এসে যাবে, যাও বাবা আমাদের একটু রেডি করে দাও।

উমেশ আলমারির লকার খুলতেই ব্যাংক থেকে তোলা সমস্ত টাকা, ও কিছু গয়না দেখতে পেল। ডাকাতির উদ্দেশ্যে এসে এত অর্থ স্বর্ণলংকার হাতে পেলে ডাকাতদের মাথার ঠিক থাকে না। কিন্তু উমেশের কিছুই মনে হলো না। এ সব গুলো তার কাছে অতি সাধারণ বস্তু বলে মনে হলো। কয়েক ঘন্টা আগেও তার শরীর দিয়ে জিঘাংসা মানসিকতার অর্থ পিপাসু তপ্ত রক্ত বইছিল, এখন তা শীতল হয়ে গঙ্গার জলের মতো হয়ে গেল। উমেশ সেখান থেকে একটা পাঁচশ

টাকার বান্ডিল বার করে তালা বন্ধ করে দিলো। তারপর দয়াময়ী দেবীর কাছে গিয়ে টাকা আর চাবিটা দিতে গেল। দয়াময়ী দেবী বাধা দিয়ে বললেন, তোমার কাছে থাক বাবা, অ্যাম্বুলেন্স আসলে ঘরে তালা দিয়ে যে তোমাকেই আমাদের সাথে যেতে হবে, তা না হলে আমাদের কে ভর্তি করবে, আর কেইবা বাড়ির দায়িত্ব নেবে? কথাগুলো শুনে এবং দয়াময়ী দেবীর আচরণ দেখে উমেশ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। বড়লোকদের সম্পর্কে তার এত দিনের ধ্যান ধারণা নিমেষে বদলে যেতে থাকলো। তার চোখে প্রথম প্রতিহিংসার আগুন জ্বলেছিলো সেদিন, যেদিন তাদের বাড়ি ওয়ালা অসুস্থ্য মাকে সহ্য শীতের রাতে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বার করে দিয়েছিল। আর আগুন নিভেছিলো সেইদিন, যেদিন বাড়িওয়ালাকে নিজের হাতে খুন করতে পেরেছিল। আবার সেইদিন তার চোখে আগুন জ্বলেছিল, যেদিন খিদের জ্বালায় মুদির দোকান থেকে একটা শুকনো রুটি চুরি করার জন্য মুদি ওয়ালার কাছে অমানুষিক মার খেয়েছিল। সেই আগুন নিভেছিলো সেইদিন, যেদিন ওই দোকান ভেঙে চুরি করে দোকানদারকে সর্বসান্ত করেছিল। ঠিক এই মুহূর্তে তার কাছে তার পূর্ব কর্মকে পাপ বলে মনে হলো। যা এতদিন সঠিক বলে মনে হতো। ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করা উমেশ অশ্রুসিক্ত নয়নে দয়াময়ী দেবীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ঈশ্বরকে বললো, হে ঈশ্বর কেন তুমি জীবনের শুরুতে এমন মানুষের সান্নিধ্যে আননি তাহলে জীবনটা যে অন্য রকম হতো! এরই মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের হুটারের শব্দ গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙেচুরে খানখান করতে করতে নিরঞ্জনবাবুর বাংলোর দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো।

কেলো পচারা পুলিশের নজর এড়িয়ে অনেকটা পথই চলে আসে। বিধান নগর মোড়ের কাছে এসে ওরা পুলিশের জালে ধরা পড়ে যায়। বিধান নগর থানাতে ধরে নিয়ে গিয়ে জেরা চলে। জেরাতে জেরবার হয়ে ওরা আদ্যোপান্ত সবিস্তারে জানিয়ে দিতে বাধ্য হয়। বড়ো বাবুর নির্দেশে ভ্যান ছোটে বিধান নগর উড়াল পুল লাগোয়া বস্তিতে, সমর ও রেশমিকে ধরতে। কেলো পচাদের চারজনকে লকাপে ভরে থানা থেকে চটজলদি প্রস্তুতি নেয়া হয় নিরঞ্জন বাবুর বাংলো হয়ে এপেলো হসপিটাল যাওয়ার।

অ্যাপেলোতে ভর্তির পর্ব সব মিটে যায়। নিরঞ্জন বাবু ডেঞ্জার পজিশনে থাকায় ওনাকে আই সি সি ইউ তে রাখা হয়েছে। নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রী নরমাল বেডে আছেন, তবে ওনারও হাঁটুর অপরেশন ইমিডিয়েট করতেই হবে। ভর্তির কাগজপত্রে উমেশই অপরিণত হাতের লেখায় সই করলো। হসপিটালের

প্রাথমিক কাজকর্ম মিটতে মিটতে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। উমেশ ব্যালেন্স টাকা পয়সা বাংলোর চাবি নিয়ে নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রীর কাছে দিয়ে বললো, মাইজি আপনার ছেলে তো আসছে, আর এদিকে এখন কোনো কাজ নেই, এবার আমি যাই। বৃদ্ধার চোখ অশ্রু পূর্ণ হয়ে গেল। অশ্রুসজল চোখে তিনি চাবি ও টাকাটা ফেরত দিয়ে বললেন, তুমি আমার সন্তান নও? যাকে জন্ম দেওয়া হয় সেই কি শুধু সন্তান হয়? যে মানুষটা সারা রাত জেগে খাওয়া নয় দাওয়া নয় শুধু পিতা মাতার প্রতি তার কর্তব্য পালন করে সে সন্তান নয়? উমেশ আর নিজেকে সামলাতে পারলোনা, বৃদ্ধার পা দুটি ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললো। বৃদ্ধা উমেশের মাথায় হাত রেখে বললেন, ওঠো বাবা, এ অশ্রু শুধু জল নয়, এটা যে মা গঙ্গার জল, যাতে তুমি ধুয়ে মুছে শুদ্ধ হয়ে গেলে। তুমি যে আমার বাহু বন্ধনে বন্দী হয়ে গেছ বাবা। আমার ছেলে এলেও তোমার মুক্তি নেই। কাল রাত থেকে তোমার খাওয়া হয়নি, যাও নীচে ক্যান্টিন আছে, হাত মুখ ধুয়ে টিফিন করে নাও।

অ্যাপেলোর সামনে এসে পুলিশ ভ্যান দাঁড়ালো। বেশকিছু পুলিশ ভ্যান থেকে নেমে হসপিটালের মেন গেটে পোস্টিং হয়ে গেল। ইনভেস্টিগেশন অফিসার ভ্যান থেকে নেমে হসপিটালের ভিতরে ঢুকে সোজা অনুসন্ধান ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দাঁড়ালো। হসপিটালের একজন কর্মী তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করেন, গতকাল শেষ রাতের দিকে সল্ট লেকের সি কে ব্লক থেকে ভর্তি হওয়ার কোনো ইনফরমেশন দিতে পারেন? —নিশ্চই স্যার, এক মিনিট, (ভর্তির খাতা দেখে) আজ ভোর চারটার পর নিরঞ্জন বসু ও তাঁর স্ত্রী দয়াময়ী বসু ভর্তি হয়েছেন। — ভর্তির রেজিস্টারে গার্জিয়ান হিসাবে কার নাম আছে? — স্যার, উমেশ সাহানির নাম দেখছি। — পেশেন্ট দুইজন এখন কি অবস্থায় আছে? — নিরঞ্জন বসুর অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল, আর আধ ঘন্টা দেরি হলে ওনাকে শেষ চেষ্টাও করা যেত না। এখন উনি আই.সি.সি.ইউ.-তে অ্যাডমিটেড। দয়াময়ী বসু নরমাল পজিশনে আছেন, এস সুন এস পসিবল ওনার নি অপারেশন করতে হবে। — দয়াময়ী বসুর বেড নম্বর বলুন? — থার্ড ফ্লোর, এফ.এ. বাই এইটটিফোর। — ওকে, থ্যাংকস।

অফিসার এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দয়াময়ী দেবীর কেবিনে চলে এলেন। দয়াময়ী দেবী তাঁর সামনে সাদা পোশাকে পুলিশ দেখতে পেয়ে তাঁর আর বুঝতে অসুবিধা হলোনা কেন তারা এসেছে। অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যাম

আপনাকে যে ভর্তি করিয়েছে সে কোথায়? — একটু বেরিয়েছে, কেন কি হয়েছে স্যার? — ওর পরিচয় আপনি জানেন? — আমাদের পরিত্রাতা, ঈশ্বর ওকে পাঠিয়েছেন। — হয়তো আপনাদের ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে পাশে থেকেছে, তার মানে সে ভালো মানুষ হয়ে যায় না। উমেশ খুনি, ডাকাত। — ও রত্নাকর ছিল স্যার।

দয়াময়ী বসুর সাথে যখন পুলিশ অফিসারের কথোপকথন চলছে, এদিকে উমেশ তখন ক্যান্টিন থেকে ব্রেকফাস্ট করে বেরুলো। ওর একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হলো। ধূমপানের উদ্দেশ্যে উমেশ এপেলোর গেটের কাছে এসে ভ্যান সহ পুলিশ দেখে চমকে উঠলো। উমেশ স্বভাবসিদ্ধ ভাবে পালানোর চেষ্টা করলো। পকেটে চাবির গোছা আর বেশ কিছু টাকা তাকে মনে করিয়ে দিল, সে যে এক গুরু দায়িত্ব নিয়েছে। উপায় থাকলেও অন্তরাত্মার সাড়া মিলল না। মনটাকে শক্ত করে সে দয়াময়ীর কেবিনের দিকে গেল। কেবিনে ঢুকতে গিয়ে সে দেখতে পেল, পুলিশের সাথে দয়াময়ী বসুর বাক্য বিনিময় চলছে। সে বুঝতে পারলো জেরা চলছে,উমেশ আবার পালানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু দয়াময়ী বসুকে ছেড়ে যেতে পারল না।

সোজা পুলিশ অফিসারের সামনে গিয়ে বলল স্যার, আমিই উমেশ সাহানি, মাঈজী অসুস্থ, ওনাকে আর জেরা করার দরকার নেই। আমাকে প্রয়োজন তো চলুন। পকেট থেকে চাবির গোছা টাকা পয়সা যা ছিল দয়াময়ী বসুর পায়ের কাছে রেখে দিল।

পুলিশ উমেশের হাতে হাতকড়া পরাল। দয়াময়ী বসুর কোনো অনুরোধই কাজে আসল না। আইন তার পথ ধরেই চলবে। এক রাতের স্বর্গ দর্শন করে উমেশ আবার চললো নরকের পথে। ❑

আব্বাস একটি মনের নাম

১

আব্বাস, ছ'টা কোয়ার্টার রুটি আর ছ'টা লাড্ডু নিয়ে আয়, আনোয়ার করাত চালাতে চালাতে বলল। আব্বাস কাঠের তক্তাগুলো রেখে যাচ্ছি বলে পয়সা নিয়ে কারখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোট কাঠের কারখানা ছয়–সাত জন ছেলে কাজ করে, আব্বাসকে নিয়ে মুসলিম চার জন বাকিরা হিন্দু। তাতে অবশ্য কাজে কোনো সমস্যা হয় না, মিলেমিশে কাজ হয়। ফাইফরমাশ আব্বাসই খেটে দেয়।

একটু তোতলা, সরল, সাধাসিধে, বছর পনেরোর ছেলে পাঁচ–ছয় বছর হল এখানে কাজ করছে, মালিককে কাকা বলে ডাকে তার কাছেই খায়, রাতে কারখানাতেই ঘুমায়, বেতন পায় তবে নেয় না, মালিকের কাছেই জমা থাকে। নিয়েই বা কি করবে! বাড়ি ঘর তো নেই, কোন ছোটবেলায় চলে এসেছে, কর্মচারীদের মধ্যে ঐ সবার ছোট কিন্তু মালিক ওকে সব থেকে বেশি বিশ্বাস করে। টাকা পয়সার লেনদেন মালিকের অনুপস্থিতিতে ঐ করে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর স্নান করে তাড়াতাড়ি রাতের খাবার খেয়ে নেয়, তারপর ঘুম আসার আগে পর্যন্ত দিদির দেওয়া কিছু প্রাইমারি বই নাড়াচাড়া করে। না বুঝলে রবিবার বিকালে কারখানা যেদিন বন্ধ থাকে তখন দিদির কাছে গিয়ে বুঝে আসে।

২

কারখানা লাগোয়া একটি বাড়ির এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের একটি ঘরে বিধবা মা আর পিতৃহীন মেয়েতে সামান্য ভাড়ায় থাকে। বছর বাইশের মেয়ে এবং মা অন্যের বাড়িতে কাজ করে কোনরকমে দিন গুজরান করে। ওরাই আব্বাসের পরিবার। সময় পেলেই ওদের বাড়িতে গিয়ে আব্বাস নিজের মনের চাহিদা মেটায়। দিদির ঘরে ভালো মন্দ কিছু রান্না হলে তারা আব্বাসকে না দিয়ে খায় না। আব্বাস অনেক সময় শুকনো পাউরুটিটা খেয়ে দিদির জন্য লাড্ডুটা নিয়ে আসে। দিদির হাতে লাড্ডু দিয়ে কাকিমাকে না দিতে পারার জন্য লজ্জা পেয়ে বলল এবাল একদিন তুমাকে এনে খাওয়াবো। দিদি স্নেহের শাসনের সুরে চোখ বড়বড় করে বলল এই তুই শুধু রুটি খাস আনোয়ার ভাইরা কিছু বলে না? আব্বাস দিদিকে বোঝানোর চেষ্টা করল না না ওরা আমাকে খুব

ভালোবাসে। ভাবে বোধহয় লাড্ডুটা আমি পরে খাবো কাকিমা হাসতে হাসতে বলে ভালবাসবে না! অতো ফাইফরমাশ খাটলে সবাই ওরকম ভালবাসে।

৩

এবার পুজোর দুইমাস আগে ঈদ পড়েছে। রসুল ভাই করিম ভাই ও আনোয়ার ভাই তিনজন মিলে আব্বাসকে একটা নতুন জামা প্যান্ট কিনে দিয়েছে। সেদিন ছিলো রবিবার। আব্বাস খুব খুশি। দুইতলায় মালিকের ঘরে গিয়ে নতুন জামা-প্যান্ট দেখিয়ে আসে পাশের মুদি, সেলুন, কাঁচের দোকান সবাইকেই একে একে দেখায়। মালিক একটু হালকা শাসনের সুরে বলেন কাজে মন দে— বিকালে ছুটি, তখন পাড়াসুদ্ধ লোককে দেখাস। আবার কাজ শুরু করে কিন্তু মনটা ছটফট করতে থাকে কখন নতুন জামাটা দিদি ও কাকিমাকে দেখাবে।

বিকালে দিদির বাড়িতে ঢোকার সময়েই আব্বাস শুনতে পেল দিদি ও কাকিমা বলাবলি করছে।

দিদি বলল— তোমাকে আমার এই উপকার করতে হবে না। কোথায় পাবে তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা? শুধু কি তাই! পঞ্চাশ হাজার টাকা তো নগদ নেবে, আর অন্য খরচ? এ তো গেল একদিক। তারপর তোমার কী হবে? অসুখ বিসুখ হলে কে দেখবে? কাকিমা দিদির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না। তোর বাবা ভাবলো না আর তুই কি ভাববি! তিনি তো কারখানা লক আউট হতেই আমরা কি খাবো, কিভাবে বাঁচব! তাই ভাবতে ভাবতেই স্বর্গে চলে গেলেন। তাই বলে আমাদের কি চলছেনা? ঠাকুর ঠিক দেখবেন। আর শোন, আমি মরলে শিয়াল কুকুরে তোকে ছিঁড়ে খাবে। উচ্চস্বরে নিজেদের বাক বিতণ্ডার মধ্যে কাকিমা হঠাৎ যেন নরম করে বললেন— দেখ মা, ভালো সম্পর্ক। ওরা আমাদের সব কথা শুনেছেন। শুনে রাজিও হয়েছেন। শুধু পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছেন বাড়িতে একটা মুদির দোকান করার জন্য। অন্যের দোকানে কাজ করে কি সংসার চলে! পরে সংসার তো আরো বড় হবে, এছাড়া ওদের তো আর কোন চাহিদা নেই। মেয়েও একটু নরম হয়ে বলল, বুঝলাম, কিন্তু দু-চার জন লোক খাওয়ানো, অল্প সোনাদানা, কাপড় চোপড় এগুলো? মা আরও নরম হয়ে বললেন, হয়ে যাবে মা, হয়ে যাবে। ভগবান তোকে তো এত শাস্তি দেবেন না। একটা না একটা উপায় ঠিক হয়ে যাবে দেখিস, তুই শুধু অমত করিস না মা, পছন্দ যখন হয়েছে—আব্বাস হতভম্ব হয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল, এটুকু বুঝলো দিদির

বিয়ের ঠিক করেছেন কাকিমা কিন্তু নগদ টাকার জন্য বিয়েটা ভেঙে যেতে পারে। তখন ওর জামা প্যান্ট দেখানোর উৎসাহটাই মাটি হয়ে গেল। মা মেয়ের বাকবিতণ্ডার মধ্যে এতক্ষণ ওরা কেউ আব্বাসকে খেয়াল করেনি। একসময় দিদি আব্বাসকে দরজার পাশে দাড়িয়ে থাকতে দেখে, ততক্ষণে আব্বাসও ধাতস্থ হয়। দিদি আব্বাসকে বলে, কিরে ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আয়, তোর হাতে ওটা কি রে?

আব্বাস দিদির কথার উত্তর না দিয়ে কাকিমাকে প্রশ্ন করে— তাতিমা, দিদিল বিয়ে? ছোছুল বালি চলে যাবে? কাকিমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন— আর বিয়ে! আমরা যে গরিব, বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কই? তার উপর পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ? ওসব বাদ দে, তোর হাতে ওটা কী বললি না তো!

আব্বাস উদ্দীপনা ভঙ্গ মানসিকতায় আস্তে আস্তে বলল রসুল ভাইরা ঈদে এই জামা প্যান্ট—প্যাকেটটা এগিয়ে দেয়। দিদি একগাল হেসে প্যাকেটটা ধরে বলে, ও! তাই বল! কই দেখি দেখি! খুলে দেখে বড় বড় চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে দেখো মা, কি সুন্দর হয়েছে! আব্বাসকে খুব সুন্দর লাগবে।

ঘোলাটে পরিবেশটা যেন এক লহমায় পাল্টে গেল। আব্বাসও আগের উৎসাহে ফিরে এসে বলল, তাতিমা কুতায় বিয়ের ঠিক হয়েছে?

— দুর্গানগর।

— তাই তাছেই তো! আমিতো ওতানে মালিকের কাজ নিয়ে যাই।

তিনজন মিলে মুড়ি চানাচুর খেতে খেতে ছেলের নাম, বাড়ি, বাবার নাম, সবই আব্বাস গল্পের ছলে জেনে নিল।

বেশ কিছুদিন ধরে কারখানার সবাই লক্ষ্য করছে আব্বাস কারোর সাথে দরকার ছাড়া কথা বলছে না, কি যেন ভেবে চলেছে। এমনকি ঈদের দিন রসুল, করিম, আনোয়ারদের বাড়ি প্রতি বছরের মতো গেল না। কারখানা খুললে সবাই মিলে আব্বাসকে ধরে। ওর এই আচরণের কারণ জানতে চায়। আব্বাস কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে। সবাই যখন খুব চাপ দেয় তখন হঠাৎ আব্বাস ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করে— আচ্ছা করিম ভাই, আমি যদি মালিকের কাছে আমার জমানো বেতন চাই তাহলে কত টাকা পাব?

কেল্টু রতন অবাক হয়ে বলে ওঠে কিরে ব্যাটা! তুইতো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চেলা, টাকা মাটি-মাটি টাকা করেই গেলি এতদিন! এখন হঠাৎ কি হল?

আব্বাস গম্ভীরভাবে আবারও জিজ্ঞাসা করে— বলোনা কত পাব?

করিম ভাই বলল— সে তো অনেক পাবি। কিন্তু টাকা নিয়ে তুই কি করবি?

আব্বাস সে কথার উত্তর না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করে আচ্ছা, পঞ্চাশ হাজার টাকা হবে? সবাই অসম্ভব বিস্ময়ে একসাথে বলে উঠল তাতো পাবি, কিন্তু হল কি তোর বলতো? আব্বাস কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের কাজে মন দিল।

রাতে মালিকের বাড়িতে খাওয়ার সময় আব্বাস মনে বল এনে কথাটা একদমে বলে দেয় কাকা, তোমার কাছে আমার যে টাকা আছে, ওখান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমাকে দিতে হবে। মালিকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। অবাকও হয় রীতিমতো। বড় বড় চোখ করে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেন তুই কি করবি অত টাকা? আব্বাস কোনো উত্তর দেয় না। মাথা নীচু করে মুখে আস্তে আস্তে গ্রাস তোলে, মালিক বলেন ঠিক আছে, এখন তো খেয়ে গিয়ে শো, পরে দেখা যাবে। মালিক কারখানার অন্য ছেলেদের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন। সবাই রীতিমতো অবাক। কেউই বুঝতে পারছেনা আব্বাস হঠাৎ টাকা চাইলো কেন! টাকা নিয়েই বা কি করবে! কোনো চিটিংবাজের পাল্লায় পড়ল না তো? মালিক সবাইকে আব্বাসের গতিবিধির উপর নজর রাখতে বললেন।

এইভাবে মাসখানেক গড়িয়ে যায়। তারই মধ্যে রাতে মাঝে মাঝে খেতে বসে আব্বাস মালিককে টাকাটার কথা মনে করিয়ে দেয়। আগের মতো উদ্যম নিয়ে কাজকর্মও করে না। সবসময় মনমরা হয়ে থাকে। কথা কম বলে, হাসে না। একদিন টাকার জন্য মালিকের কাছে একটু জোরাজরি করতেই মালিক রেগে গিয়ে বললেন তুই যদি অতো টাকা টাকা করিস, তো তোর কাজ করতে হবে না। আব্বাস মাথানীচু করে মালিকের উদ্দেশ্যে বলে, ঠিক আছে আমাল পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দাও আমি চলে যাবো। মালিক তো আরও বিপদে পড়ল। এমন বিশ্বস্ত কর্মী আজকের দিনে পাওয়া মুশকিল। কারণ ওর পরিশ্রম ও সততায় মালিকের অনেক লাভ হয়।

সেদিন ছিল রবিবার দিদিদের ঘরে কারা যেন এসেছে। তাই আব্বাস আর ওদের ঘরে যাইনি। সন্ধ্যা নাগাদ দিদি ডাকল আব্বাসকে, ও তো যাওয়ার জন্যেই পা বাড়িয়ে ছিল, তাই ডাকতেই ছুটে চলে গেল। ঘরে ঢুকতেই একটা প্লেটে অল্প ঠান্ডা চাউমিন দিয়ে দিদি বলল, নে এটা খেয়ে নে। চাউমিন তৃপ্তি সহকারে খেতে খেতে আব্বাস কাকিমাকে জিজ্ঞাসা করল, কারা এসেছিল গো? দিদি মুখ ব্যঙ্গোক্তি করে বলে কারা আবার! যাদের গায়ে রক্ত নেই, আমার

মায়ের দুর্বল রক্ত নিয়ে বাঁচবে ভেবেছিল। আব্বাস বলল, তুমাল পেচানো কথা আমি কিছু বুঝিনা। ও তাতিমা কি হয়েছে গো? কাকিমা হতাশার সুরে কিছুটা ভেঙে পড়ে বললেন— ছেলের বাবা এসেছিলেন। বলে গেলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা না দিতে পারলে এখানে আর কথা এগিয়ে লাভ নেই। আব্বাস খাওয়া ছেড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে দিদির বিয়ে এখানে হবে না? দিদি অশ্রুসিক্ত চোখে আব্বাসের দিকে তাকিয়ে বলে, না। তুই যা তো! ঠাকুর যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই করেন।

সেদিন রাতে আব্বাস মালিকের কাছে গিয়ে বলল, কাল আমার টাকা চাই-ই চাই। এমন হঠাৎ করে টাকা চাওয়ায় মালিক রেগে গিয়ে বলল আর না দিলে কি করবি? আব্বাস মালিকের চোখে চোখ রেখে উত্তর দেয় আমার হিসাব বুঝে নিয়ে আমি কাজ ছেড়ে দেব। চোখে চোখ রেখে কথা বলায় মালিক আরো রেগে গিয়ে বললেন— বেইমান! রাস্তা থেকে তুলে এনে মানুষ করেছিতো। আব্বাস আর তর্ক না করে বিড়বিড় করে বলতে থাকে আমাল টাকা চাই-ই চাই।

মালিক একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। যদি সত্যিই চলে যায়, পরের দিন কারখানার ছেলেদের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেন। অনেক চিন্তাভাবনা করে ঠিক হয় আব্বাসকে মালিক পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবে কিন্তু কারখানার ছেলেরা ওর উপর গোপনে নজর রাখবে। কারণ অতোগুলো টাকা নিয়ে যদি আব্বাস কোনো বাটপারের হাতে পড়ে। পরের দিন আব্বাস রাতের খাওয়া সেরে শুতে যাওয়ার আগে মালিক পঁচিশখানা দুহাজার টাকার নোট আব্বাসের হাতে দিয়ে বলেন গুনে নে। আব্বাস টাকাটা দেখে মুখের ভাব এমন করল যেন ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখে ফেলেছে। টাকাটা হাতে নিয়ে না গুনে পকেটে রাখতে রাখতে বলল ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি কাজ ছালবো না। আরো বেশি বেশি করে কাজ করে দেবো।

মালিক রাতে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাপ করতে লাগলো। দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছে না। একটাই চিন্তা, আব্বাস না অতোগুলো টাকা নষ্ট করে ফেলে। কারখানার ছেলেগুলোকেও পুরোপুরি ভরসা করতে পারছেন না। ঠিক করলেন, নিজেই কাল থেকে নজরে রাখবেন। ভোরের দিকে ঘুমটা একটু গভীর হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই মালিক ধড়ফড় করে উঠে কারখানার দিকে ছুটলেন আব্বাসের গতিবিধি লক্ষ্য করতে। কিন্তু কারখানার সামনে গিয়েই উনি চমকে ওঠেন। দরজার বাইরে থেকে তালা দেওয়া, আব্বাস নেই। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি। লোকজন জড়ো হওয়া, যা হয় আর কি! কারখানার ছেলেদের ফোন

করে ডেকে পাঠালেন। সবাই এক জায়গায় জড়ো হলো কিন্তু আব্বাসের কোনো খোঁজ পাওয়া গেলো না। রসুল বলল— চলোতো, ঐ বিধবা মা-মেয়ের কাছে ও খুব যায়। ওদের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখি। সেখানে গিয়েও তার কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। দিদি, কাকিমা সব শুনে কেঁদে ফেললেন। কারণ কাকিমা যে সত্যিই তাকে নিজের সন্তানের মতো ভালবাসেন। নানা জনে নানা মত প্রকাশ করতে লাগল। কেউ বলল— এমনিতে হাবা গোবা, পেটে পেটে এত বুদ্ধি। কারখানার ছেলেরা সমস্বরে বলে ওঠে ও যে এত চালাক তা আমরা কখনো বুঝতেই পারিনি। দিদি কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমরা সব উল্টো পাল্টা ভাবছ। এটা ভাবছ না যে যদি ও খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে, আর সে ওকে মেরে ফেলে! অতো টাকার লোভ কেউ সামলাতে পারে!

করিম মালিককে বলল, কাকা তোমার কাছে তো ডুপ্লিকেট চাবি আছে কারখানা খুলে দেখোতো সব ঠিকঠাক আছে কিনা?

এর পর কারখানা ঘর খোলা হল। আব্বাসের জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে। শুধু আব্বাস নেই। জল্পনা আরও ঘনীভূত হল।

ভিড়-ভাট্টা, কোলাহলের মধ্যে ঐ স্থানে একটা রিক্সা এসে দাঁড়ালো। সকলে রিক্সার দিকে তাকিয়ে চরম বিস্ময়ে বলে উঠল, ঐ তো আব্বাস! রিক্সা থেকে নেমে আসেন দিদির হবু শ্বশুর ও আব্বাস। কাকিমার কাছে এসে ভদ্রলোক হাত জড়ো করে বলেন, আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। এই পরিস্থিতির জন্য মনে হয় অজান্তে আমিই দায়ি। এই ছোট্ট ছেলেটি আমাকে আজ যা শিক্ষা দিল তা আমি আমৃত্যু মনে রাখব। এইটুকু ছেলে ওর সারাজীবনের কষ্টার্জিত পরিশ্রমের সর্বস্ব আমার হাতে তুলে দিতে গিয়েছিল যাতে বিয়েটা না ভেঙে যায়। টাকার বান্ডিলটা কাকিমার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, এই যে দিদি ওর দেওয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এখানেই বিয়ে হবে তবে শুধু শাখা সিঁদুরে। নিমেষের মধ্যে চেঁচামেচি নানা গুঞ্জন সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা পিন পড়লেও যেন আওয়াজ পাওয়া যাবে। আব্বাস এক পাশে মাথা নিচু করে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো। যেন এই পরিস্থিতির জন্য ও নিজে সবথেকে বেশি দায়ী। ❑

বাস্তু

আজ বাড়ি ফেরার সময় কিছু নিয়ে আসবে, খালি হাতে ফিরবে না। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আটপৌরে শাড়ি পরে কপালে সিঁদুর দিয়ে অর্ধ সাজে স্বামীর হাতে পান্তা, পিঁয়াজের পাত্রটা দিয়ে একগাল হেসে কথাটা বলল টগর। গোপাল শুধু 'হুম' বলে গামছায় বাঁধা পোটলাটা স্ত্রীর হাত থেকে নিয়ে মাঠের দিকে রওনা হল।

দাসপুর গ্রাম। তারকেশ্বর থেকে মাইল আটেকের পথ দু-চারটে পরিবার ছাড়া বেশির ভাগই চাষি পরিবার। গোপালের জন্মও চাষি পরিবারে। বাবা অল্প বয়সে মারা যান। মা অতিকষ্টে পরের বাড়িতে কাজ করে ছেলেকে মানুষ করেন। গোপাল লেখাপড়া বিশেষ করতে পারেনি ঠিকই কিন্তু ওর মা ওর বাবার এক কাঠা পৈতৃক জমিও নষ্ট করেননি। বছর ছাব্বিশের গোপালের চেহারা বেশ মজবুত। যেমন লম্বা তেমনই ঠিক মানানসই বুকের ছাতি। আর গায়ের শক্তি? ডাকাত পড়লে চার-পাঁচজনকে গোপাল একাই রুখতে পারবে। বন্ধু-বান্ধব পুলিশ, মিলিটারিতে নাম লেখাতে বলে কারণ তাতে নাকি চাকরি ওর বাধা। কিন্তু গোপাল অতি সাদাসিধে ছেলে। মাকে একা ছেড়ে সে গ্রামের বাইরে যাবেইনা। একবার তো পঞ্চায়েত প্রধান পরেশবাবু নিজে এসেই গোপালকে প্রস্তাব দেন যাতে তার রাজনৈতিক দলে গোপাল যোগ দেয়। সেখানে পয়সাকড়ি ভালই আমদানি আছে। পঞ্চায়েত দখলে থাকলে একটা চাকরিরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। গোপাল তাতে সম্মতি না দিয়ে বলে না কাকা, ও আমার দ্বারা হবে না।' পরেশবাবু না করার কারণ জানতে চাইলে গোপাল নির্ভয়ে নির্দ্বিধায় বলে কাকা, রাজনীতি করলে সাদা-কে সাদা, কালোকে কালো বলা যায় না। ওর থেকে আমার চাষাবাদই ভাল।

বছর পাঁচেক আগে মা নিজে পাশের গ্রাম থেকে টগরকে পছন্দ করে ঘরের বউ করে এনেছেন। নিজে তো জীবনে দাম্পত্য সুখ পাননি। তাই ছেলে-বৌ কে দেখে যদি একটু শান্তি পান। কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ এক অজানা রোগে এক সপ্তাহের মধ্যে সব শেষ। টগরও ওই সময় খাওয়া ঘুম ত্যাগ করে শাশুড়ির সেবা করেছে কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। গোপাল খুব ভেঙে পড়ে। মা ই-তো তার জগৎ ছিল। পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবরা ওকে অনেক বোঝায় যাতে ও ভেঙে না পড়ে। মা বাবা তো কারো চিরকাল থাকে না। বরং ঘরে একটা বাচ্চা-

কাচ্চা এলে আস্তে আস্তে সব ভুলে যাবে। কিন্তু সেখানেও ভগবান মুখ তুলে চাইলেন না। আজ বছর পাঁচেক হতে চলল টগরের কোল আলো করে কোনো সন্তান এলো না। টগরের মা অনেক ডাক্তার কবিরাজ করেছেন কিন্তু কোনো ফল হয়নি। তবে ওদের দাম্পত্য জীবনে সুখ নেই ঠিক কথা, কিন্তু শান্তি আছে।

পাশেই মৌমিতাদের বাড়ি। ওরা বড়লোক। গ্রামের 'শ্রী ভারতী বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে' টগর ও মৌমিতা একসাথে পড়াশোনা করেছে। পুরনো পরিচয় ছিল বলে এখন সম্পর্ক আরো গভীর হয়েছে। টগর দিনে অনেকটা সময় মৌমিতাদের বাড়িতে কাটায়। মৌমিতা আবার বাস্তুবিদ্যা চর্চা করে। তাতে নাকি মানুষের জীবনের অনেক নেগেটিভিটি কাটিয়ে পজেটিভিটির উত্তরণ হয়। টগর যা দেখে যা শোনে বাড়িতে এসে নিজের উপর তা প্রয়োগ করে।

আজ মাঠে কাজ করতে করতে বনমালি এসে খবর দিল গোপাল সহ চার জনের কৃষিঋণ স্যাংশান হয়েছে। গোপাল খুবই চিন্তায় ছিল। এবছর চাষটা ভালোই হবে। বৃষ্টি পরিমাণ মতই হচ্ছে। গোপাল মনে মনে ছটফট করে, কখন বাড়িতে গিয়ে টগরকে ঋণের কথাটা বলবে। ভিটে মাড়াতেই গোপাল উচ্চস্বরে বলে উঠলো, টগর একটা ভালো খবর আছে। টগর রান্নার জোলো হাত শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে গোপালকে থামিয়ে দিয়ে বলল থাক থাক এখন বলো না। আগে হাত পা ধোও। ঘরে এসে বসো তারপরে। যথা আজ্ঞা বলে গোপাল হাত পা ধুতে চলে গেল। হাত পা ধুয়ে খাটের উপরে বসতেই টগর চেঁচিয়ে ওঠে না না ওমন করে নয় উত্তর দিকে মুখ করে বসো। আর এই এলাচটা গালের বাম দিকে রেখে বলো কী সুখবর। গোপালের এত বাড়াবাড়ি ভালো লাগে না। কিন্তু ক্ষতি তো আর হয় না। তাই বউকে আর ঘাটায় না। এলাচটা মুখে দিয়ে উত্তর মুখ করে ঋণ পাওয়ার খবরটা টগরকে দেয়। টগর খুশি হয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে জয় মা জয় মা দেখেছো উত্তর দিক আর এলাচের কি গুণ। গোপাল বোঝানোর চেষ্টা করে যে খবরটা ও আগেই এনেছে। এলাচ আর উত্তরদিক পরে। শুধু মনে মনে বলে পাগলি। বলবে নাই বা কেন! ঘুমিয়ে পড়লে ঠেলে তুলবে শুতে গেলে নাকি দক্ষিণ বা পূর্বে মাথা দিতে হবে। ঘরের জিনিস এদিক থেকে ওদিকে সরাবে। রান্না করবে পূর্বে মুখ করে তো আলমারি রাখবে উত্তরে মুখ করে। ঠাকুরের জায়গা ঈশান কোণে তো বাথরুম পশ্চিমে আরো কত কি! গোপাল মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে বলে, বেঁচে গেলে শ্বশুরের এতবড় ঘরের চালা বাড়িটা আছে তাই। হোত, কলকাতার একটুখানি জায়গা, যেখানে ভালো করে থাকাই যায় না তার উপর দিক মেনে রান্না ঘর, পায়খানা,

যত্তসব! গোপালের বন্ধু-বান্ধব ব্যাপারটা জেনে গেছে। ওরাও গোপালকে একটু আধটু টগরকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে সুযোগ পেলেই।

বিকেলে পাড়ায় বাচ্চাদের সাথে টগর শিং ভেঙে বাছুর হয়ে খেলবে। ঘরে গোপাল প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এতে নাকি বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমন হবে। বাচ্চা গোপাল, মূর্তি গোপালদের যত্নের ত্রুটি নেই। আর আমি যে জ্যান্ত গোপালটা অযত্নে লুটোপুটি খাচ্ছি তার খেয়াল নেই। বড়লোক বান্ধবী মৌমিতাই ওর মাথায় এসব ঢোকাচ্ছে। এমনকি ডাক্তার কবিরাজও সেই উদ্যোগ নিয়ে দেখাচ্ছে।

ইদানিং টগরকে এক নতুন রোগে ধরছে। গোপাল বাড়ি থেকে বার হলেই টগর বলে, বাড়ি ফেরার সময় কিছু নিয়ে বাড়ি ফিরবে। গোপাল ক্ষেপে গিয়ে বলে তোমার জন্য চাল, ডাল, তেল, নুন বাচ্চাদের জন্য লজেন্স, গোপালের জন্য বাতাসা, নকুলদানা এসব তো এনেই দিই! তাছাড়া মাঠে কাজ করতে যাই ফেরার সময় কি আনবো? টগর একটু ভেবে বলে একটা শুকনো কাঠ কুটো এনো, দেখো দশদিনের কাঠ এক জায়গায় করলে একদিনের জ্বালানিতো হবে। না হয় কিছুটা করে ঘাস আনলে গরুটা তো খেতে পারবে। এতে ঘরে লক্ষ্মীর আগমন হয়। গোপাল কাঁদবে না হাসবে কিছুই বুঝতে পারে না। একটু চাপা স্বরে বলে শুধু পাগলি? এ হলো বাস্তু পাগলি।

সেদিন চারবন্ধু মিলে জমির কাজ সেরে পরেশবাবুর বাগানের উপর দিয়ে শর্টকার্টে বাড়ি ফিরছিল। তখনও গোপাল টগরের জন্য কিছু নেয়নি। কারণ বন্ধুরা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করতে পারে। এরমধ্যে এক বন্ধু দেখে রাস্তার ধারে জঙ্গলের পাশে একটা গোসাপের অখণ্ড কঙ্কাল। সে মজা করে গোসাপের কঙ্কালটা দেখিয়ে বলে ও গোপাল তোর বউয়ের জন্য এটা নিবি নাকি? গোপাল খুব ক্ষেপে যায়। কারণ ঘরে বউয়ের বাস্তুনীতি আর বাইরে বন্ধু বান্ধাবদের ব্যঙ্গোক্তি আর সহ্য হয় না। গোপাল বলে ঠিক বলেছিস আজ এটাই টগরের জন্য নিয়ে যাব। বন্ধুরা একটু অপ্রস্তুতে পড়ে যায়। কারণ ওরা মজা করেছিল। গোপাল শুনবার পাত্র নয়। ওদের বারণ না শুনে গোসাপের কঙ্কালটা নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। চুপচাপ রাস্তায় চলছে আর মনে মনে টগরকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবছে। আজ সে এক প্রস্ত ঝগড়া করবেই করবে। যাতে টগরের এই ক্ষ্যাপামি বন্ধ হয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলের পথে সূর্যদেব। গোপাল বাড়ি ঢুকে নিজেই চেঁচিয়ে বলল এই নাও তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস। মনে মনে ভাবে টগর এসে দেখেই

ক্ষেপে যাবে।

তখন গোপাল নিজে ততোধিক ক্ষেপে ঝগড়া করবে। যাতে আর পরেরদিন থেকে কিছু এনো কথাটা না বলে। কিন্তু একি! টগর এসে গোসাপের কঙ্কালটা দেখে প্রথমে থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর একটু মুচকি হেসে বলে, কাঠঘরে গিয়ে টাঙিয়ে রেখে এসো আর তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও। অনেক বেলা হয়েছে। গোপাল স্তম্ভিত সে যা ভেবেছিল ঠিক তার উল্টোটাই হল। ওর হাসিটা যেন মনে করিয়ে দিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতাটি–

'যেখানে দেখিবে ছাই কুড়াইয়া দেখ তাই
পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।'

কিন্তু টগর কেন চেঁচামেচি না করে শুধু মুচকি হাসল তা গোপাল বুঝে উঠতে পারলনা। গোপাল রীতিমত অবাক হয়ে টগরকে প্রশ্ন করল তুমি আমার উপর রাগ তো করলেই না, উল্টে হাসছো! আমি তোমাকে পাঁচ বছরেও চিনতে পারলাম না। টগর সেই একই হাসি মুখে রেখে তার হাসার কারণ ব্যাখ্যা করল। দেখ, তোমাকে আমি কাঠ, ঘাস এসব কিছু আনতে বলেছি। এগুলো তুমি অনায়াসেই মাঠে ঘাটে পেতে পার। হঠাৎ কেনই বা তুমি গোসাপের কঙ্কালটা দেখতে পেলে? আর কেনই বা ওটা তুমি বাড়িতে নিয়ে আসবে? নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা কোনো ইঙ্গিত করেছেন। সেই জন্যই কঙ্কালটা কাঠের ঘরে ঝুলিয়ে রাখলাম। থাক না, ভালো না হোক খারাপ তো হচ্ছে না। ব্যাখ্যা শুনে গোপাল একটু হেসে বলল খনার পুনর্জন্ম হয়ে তুমি ধরাধামে এসেছো।

পঞ্চায়েত প্রধান পরেশবাবুর মেয়ের এক কঠিন ব্যামো হয়েছে। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজ সব ফেল কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধ ভাত রুটির মতো খাচ্ছে। কিন্তু রোগ সারছে না। খিদে হয় না, পেটের যন্ত্রণা, দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, শরীরের লাবণ্য টুকুও নেই। বিয়ে দিতে হবে একটা মাত্র সন্তান। চিন্তায় চিন্তায় পরেশবাবুর সুগার ধরে গেছে। পরেশবাবু স্ত্রীরও একই দশা। চেহারা আধখানা হয়ে গেছে। বাড়ির কাজের বউ বগলা গিন্নি মাকে বলল মা ছামদারা গ্রামে একটা ভাঙা কালীমন্দির আছে। ওখানে এক তান্ত্রিক থাকেন। তিনি অনেক কঠিন কঠিন রোগ নিমেষে সারিয়ে দেন। কর্তাবাবুকে বলে ওনাকে একবার ডাকুন না। গিন্নিমা কথাটা শুনে একটু আশার আলো দেখলেন। কিন্তু পরেশবাবুর কানে তোলেন কি করে, উনিতো তন্ত্র মন্ত্র জড়িবুটি এসব বিশ্বাসই করেন না। তবুও মেয়ের ভালো হবে এই ভেবে বুকে সাহস নিয়ে গিন্নিমা পরেশবাবুর কাছে কথাটি পাড়লেন। শুনে প্রথমটা পরেশবাবু বুজরুকি বলে

উড়িয়ে দিলেন। অনেক কাকুতি মিনতি করায় উনি রাজি হলেন তবে একটা শর্তে ডাক্তারি ওষুধ যেমন চলছে চলবে।

তান্ত্রিক এলেন। পরেশবাবুর মেয়েকে ভালো করে আপাদমস্তক নিরিক্ষণ করলেন। তার মধ্যে আড়চোখে দেখে বুঝে ফেলেছেন, পরেশবাবু কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকে দেখছেন। তান্ত্রিক গিন্নিমায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন মা, তোর স্বামী তো এসব বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তুই মা ভৈরবীর উপর বিশ্বাস রাখ, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কথা দিচ্ছি। এই পর্যন্ত শুনে বাড়ির সকলে যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। পরেশবাবু ভাবলেন আমি যে বিশ্বাস করছিনা এ তান্ত্রিক তা বুঝলো কি ভাবে? পরেশবাবুর অবিশ্বাসের মরুভূমিতে যেন একটু বিশ্বাসের মেঘ জমল। গিন্নিমা বললেন, বলুন বাবা এখন আমরা কী করব? তান্ত্রিক মাথা নীচু করে জটা চুলকিয়ে দাড়িতে বার কয়েক হাত বুলিয়ে চোখ বন্ধ করে বললেন একটা দুর্লভ জিনিস যদি আমাকে জোগাড় করে এনে দিতে পারিস তো সাতদিনেই বুঝতে পারবি যে তোর মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে। নাস্তিক পরেশবাবুর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কি বাবা বলুন, চেষ্টা করতে তো দোষ নেই। তান্ত্রিক আধবোজা চোখে পরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন মায়ের উপর বিশ্বাস রাখ চেষ্টা সফল হবে। গিন্নিমা বললেন বলুন বাবা কি জোগাড় করতে হবে? তান্ত্রিক বললেন, একটা অখণ্ড গোসাপের কঙ্কাল। তার ঘাড় থেকে লেজ পর্যন্ত শিরদাঁড়ার বিজোড় সংখ্যা গুনে মধ্য খণ্ডটি আমার প্রয়োজন।

পরেশবাবুর পার্টির গোটা পঞ্চাশেক ছেলে উপস্থিত ছিল। তারা পরেশবাবুকে ভরসা দিয়ে বলল, কিছু ভাববেন না দাদা আমারা ঠিক জোগাড় করে এনে দেব। দু-একটা গ্রামের বনবাদাড় তন্ন তন্ন করে খুজে একটা মরা সাপ পাওয়া গেল বটে তবে গোসাপ কোথাও! অনেক চেষ্টায় যদিও একটা পেল কিন্তু অখণ্ড নয়। পরেশবাবু পুরস্কার ঘোষণা করলেন। তাতেও কাজ হল না। খবরটা একান ওকান হতে হতে গ্রাম ময় রটে যায়। এবং একসময় টগরের কানেও খবরটা পৌঁছায়। আমাবস্যায় টগর কঙ্কাল ছোঁবে না বলে গোপালকে দিয়ে জোর করে কঙ্কাল হাতে পরেশবাবুর বাড়ি পাঠায়।

সপ্তাহ দুই পরে গোপাল মাঠ থেকে বাড়ি এসে দেখে টগর ঘরে নেই। গোপাল বার দুই ডেকে কোনো সাড়া না পেয়ে স্নান সেরে নেয়। এর মধ্যে টগর আনন্দে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে একটা মিষ্টির হাঁড়ি হাতে ঘরে ঢোকে। গোপাল হাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে বড় হাঁড়ির নীচে গোটা চারেক রসোগোল্লা।

গোপাল ভাবে পাগলি কি আবার ক্ষেপলো? রেগে গিয়ে বলে তোমার কি মাথায় দোষ আছে? খিদেয় পেঠ জ্বলছে আর তুমি... টগর গোপালের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ওর গালে একটা রসোগোল্লা ঢুকিয়ে দিয়ে বলে মাথার দোষ তো ছিল না। হলো আনন্দে, ঝেড়ে কাশ তো! তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝছিনা। টগর হাসতে হাসতে বলল ডাক্তার আমার ইউরিন পরীক্ষা করে পজিটিভ বলেছে। শুনে যেন গোপালেরও আনন্দে পাগল হয়ে যাবার জোগাড়। কপালে হাত ঠেকিয়ে মাবাবার উদ্দেশ্যে বলল মা তুমি বা বাবা কেউ একজন আমার ঘরে এসো। সেদিন আর আনন্দে সারাদিন খেতে পর্যন্ত পারল না ভালভাবে। রাতে বিছানায় শুয়ে গোপাল বলল আমার কাছেও একটা ভালো খবর আছে। প্রধানের মেয়ে এখন অনেক সুস্থ। টগর বলল তাহলে কাল সকালে গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে এসো। বাচ্চা মেয়ে, আস্তকাল পড়ে আছে। মা ভৈরবী ওদের ইচ্ছা পূরণ করলেন।

গল্পগুজব করতে করতে অনেক রাতে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল। পরের দিন আর ভোরে ওঠা হয়নি একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখে টগর উঠোনে গোবর জল ছেটাচ্ছে। এমন সময় পরেশবাবু এসে হাজির বউমা গোপাল কই? টগর গোপালকে ডাকার আগেই গোপাল বারান্দায় এসে আরে কাকা! কি ব্যাপার? আসুন আসুন ঘরে আসুন বলে ডাকল। পরেশবাবু উৎফুল্ল হয়ে বললেন, না না এখন বসবো না, একটা কথা বলতে এলাম। আমার মেয়ে এখন অনেক ভালো আছে। টগর কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, সবই মা ভৈরবীর ইচ্ছা। পরেশবাবু আরও খুশি হয়ে বললেন আমি শুধু এই খবরটি দিতে আসিনি। গোপাল তোকে বলছি তোর জমিটা ভাগচাষে দিয়ে দিবি। সামনের মাস থেকে আমাদের পঞ্চায়েত অফিসে যোগ দিবি। তোকে একশ দিনের কাজের সুপার ভাইজার করব। গোপাল পরেশবাবুকে থামিয়ে, কিন্তু... বলল। পরেশবাবু বলল, না না তোকে রাজনীতি করতে হবে না। তোর চাকরি এমনিই পাকা। টগর কপালে হাত দিয়ে বলে সবই বাস্তুদেবের কৃপা। কিন্তু এই ঘটনা শুনে নিন্দুকেরা বলে, ঝড়ে তাল পড়ে। কাক বলে আমার বাতাসে। ❑

কেপমারি

সাবধানে যাস,—

বাসে ডিস্ট্যান্স রেখে বসিস, ব্যাগ কোলে নিয়ে বসিস, বালার কৌটোটা ব্যাগের নিচে দিলাম, গিয়েই আগে দিদির হাতে দিয়ে দিবি। — কথাগুলি একদমে মা রিয়াকে বলে যান। রিয়া প্রস্তুত হতে হতে বলে আরে তুমি শুধু শুধু চিন্তা করছ মা, তুমিতো রাস্তায় বার হও না, আমরা বার হই অত চিন্তার কিছু নেই। মা আবার বলে চলেন জলের বোতল ব্যাগের উপরের দিকে রাখলাম, সরকারি বাসে উঠবি, ভিড় এড়িয়ে চলবি। ঠিক আছে মা, সেই জন্যই তো দুপুরে যাচ্ছি, — চললাম। — বলে তরতর করে রিয়া বেরিয়ে গেল।

ফাঁকা বাস স্ট্যান্ড, রিয়া দাঁড়িয়ে বাসের অপেক্ষায়, ঠিক সেই সময় একজন বছর তিরিশের হ্যান্ডসাম যুবক রিয়ার কাছাকাছি এসে বলল ম্যাডাম এখানে কি ধুলাগড় যাবার বাস দাঁড়াবে? রিয়া অনিচ্ছাকৃত ভাবে বলল হ্যাঁ। যুবকটি এক একটা বাস আসে আর বাসের নেমপ্লেটের দিকে তাকিয়ে উঁকিঝুঁকি মারে। এইভাবে হঠাৎ যুবকটি রিয়ার খুব কাছে এসে যায়। রিয়া বিরক্ত হয়ে একটু সরে যেতেই যুবকটি বলে ওঠে সরি। একটু সরে দাঁড়িয়ে বলে আসলে নতুন অভ্যাস তো! ভুলে যাই, কি এক করোনা রোগ হল বলুন তো! এত নিয়ম মেনে কি চলা যায়? রিয়া কোনো প্রত্যুত্তর দেয় না, যুবকটি চুপচাপ আবার বাসের দিকে নজর দেয়।

তখনও বাস স্ট্যান্ডে দুটি প্রাণী। যুবকটি একটি দ্রতগামী বাসের সামনে গিয়ে উঁকি মারল। বাসটি না দাঁড়িয়ে দ্রত গতিতে ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

বাসটি বেরিয়ে যেতেই সেকেন্ডের মধ্যে যুবকটি একটি চোখ চেপে উফ্! বলে বসে পড়ল। তারপর একটু অসহায় মত হয়ে আস্তে আস্তে উঠে রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ম্যাডাম, দেখুন না আমার চোখে কি যেন একটা পড়ল, অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে। ঘটনাটি রিয়ার একদম পছন্দ হচ্ছিল না কিন্তু যা ঘটল সেটাওতো সত্যি। ওর মনে একটু দয়ার উদয় হল, আস্তে আস্তে যুবকটির দিকে তাকিয়ে দেখল সত্যিই ওর চোখে কালো মত, ঠিক পোকা নয় কিন্তু কিছু একটা পড়েছে। যুবকটি পকেট থেকে রুমালটা বের করে বলল বিশ্বাস করুন, কাচা রুমাল। একটু চোখ থেকে পোকাটা বের করে দিন না। আমার কাছে স্যানিটাইজার আছে পরে হাত স্যানিটাইজ করে নেবেন। রিয়া কোনো উত্তর

না দিয়ে যুবকটির চোখ থেকে কালো বস্তুটা বের করার চেষ্টা করতে লাগল। যুবকটি অসহায়ের মত হাতটা ঝুলিয়ে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে থাকল।

কালো বস্তুটি বের করে যুবকটির হাতে তার রুমাল দিতেই যুবকটি পকেট থেকে স্যানিটাইজার বের করল। রিয়া বলল নো, থ্যাংকস, আমার কাছে আছে, আমার কাছে জল আছে একটু দিই চোখ-টা ধুয়ে নিন। যুবকটি মৃদু বাধা দিয়ে বলল না, থাক, আপনি যা করলেন আমি কখনও তা ভুলব না। রিয়া কোনো কথার উত্তর না দিয়ে বোতলটা বের করে এক আচলা জল দিল, যুবকটি চোখে জলের ঝপটা দেওয়া শেষ হওয়ার আগেই রিয়ার বাস এসে যায়। রিয়া কোনো কথা না বলে তাড়াতাড়ি বাসে উঠে পড়ে।

ফাঁকা বাস। তিন সিটের জানালার ধারে বসে মায়ের কথা মতো ব্যাগটা কোলে নিয়ে রিয়া ভাবতে থাকল-আমরা একটা মানুষ সম্বন্ধে কত নেগেটিভ কথা ভাবি, কিন্তু যুবকটিকে তো খারাপ কিছু মনে হল না। হয়তো এই রুটে নতুন। যাক বাবা! এখন ভালোয় ভালোয় পৌঁছাতে পারলে বাঁচি। গিয়েই দিদির বালাটা হ্যান্ডওভার করে মাকে নিশ্চিন্ত করে,তবে আমার ছুটি।

বাস থেকে নেমে ওয়াকিং ডিসট্যান্সে দিদির বাড়ি। রিয়া বাড়িতে ঢুকতেই দিদি বলল, কিরে, অসুবিধা হয়নিতো? একটা ফোন তো করতে পারতিস, রিয়া বলল— দাঁড়া দাঁড়া, রাস্তায় কত কি যে ঘটে। কথাগুলো বলতে বলতে রিয়া ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে ঘাটতে থাকে কিন্তু বালার কৌটোটা পায় না। রিয়া তখন চিৎকার করে ওঠে বালা?

দিদি ছুটে এসে ব্যাগ উপুর করে দেখে ব্যাগের ঠিক নিচের দিকে বালার কৌটো বার করার মত সুদক্ষ হাতে ব্লেড মারা। রিয়া ততক্ষণে স্তম্ভিত, বিড় বিড় করে স্বগোক্তি তাহলে, আমি যখন চোখের কালো মতো বস্তুটি বের করছিলাম তখনই—! ❑

ইচ্ছাময়ী তারা তুমি

আর চিন্তা নেই, ট্রেনে যখন উঠেই পড়েছি, এইবার সিট খুঁজে বসতে কোনো অসুবিধা হবে না— কথাগুলো বলতে বলতে দুই হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে নিজের মাকে মালপত্রের মতো সতর্ক হয়ে সামনে রেখে ভিড়ের মধ্যে এগুতে থাকেন অনুপ চক্রবর্তী।

মায়া চক্রবর্তী, বয়স পঁচাত্তর ছুঁই ছুঁই, বৈধব্য জীবন। পাঁচ সন্তানের জননী। পাঁচ সন্তান-কে মানুষ করা আর ঈশ্বর চিন্তা ছাড়া তৃতীয় চিন্তা কখনো করেননি। মুসলমান সম্প্রদায় বছরে একমাস রোজা করেন, তাই আমরা বলি সত্যি ওরা কত ধার্মিক, সারাদিন থুথু পর্যন্ত না গিলে সেই সন্ধ্যা বেলা খায়। আর মায়া চক্রবর্তী সারা জীবন সকাল থেকে না খেয়ে থুথু পর্যন্ত না গিলে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম করে নিয়ে-স্নান করে ঘন্টা খানিক ঠাকুরের সেবা করে, তারপর ভাত খান। সেই সময়টা হয়তো বিকাল পাঁচটা বেজে যায়। এখন বৃদ্ধার সংসারের হাল ধরতে হয় না। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলেরা স্বযোগ্যতায় সংসারী হয়ে গেছে। এখন মায়া দেবীর একটাই চিন্তা ঈশ্বর আর ঈশ্বর। বড় একটি ঘর, তাতে তেত্রিশ কোটি দেবদেবী অধিষ্ঠান করছেন। ভারতবর্ষে যত তীর্থস্থান আছে সবই ওনার ঘরে আছে, এটা ওনার চরম বিশ্বাস। তাই কখনো কোনো তীর্থস্থান-এ ছেলেরা নিয়ে যেতে চাইলেও উনি যেতে চাননি। এমনকি বাড়ির পাশের শিবমন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢালতেও যাননি। উনি একটি কথাই বলেন মন যদি জাগ্রত হয় তবে ঈশ্বর ঘরে এসে অধিষ্ঠান করেন। কোনো তীর্থক্ষেত্রে যেতে হয় না। মা সারদা ওনার আদর্শ নারী। মায়া দেবীর মুখে কখনো কারোর সমালোচনা শোনা যায়নি সমস্যায় পড়লে বলেন মনে হয় আমারই ভুল। ছোট ছেলে মাকে অনেক বুঝিয়ে একরকম জোর করে এই অদূর ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন। শিয়ালদহ থেকে রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার, মাত্র ঘন্টা ছয়েক-এর ভ্রমণ। অনুপবাবু তার মাকে নিয়ে সংরক্ষিত সিটে বসলেন। ট্রেনের মধ্যে প্যাসেঞ্জারদের হুড়োহুড়ি আস্তে আস্তে স্তিমিত হল এবং এক সময় ট্রেন ছাড়লো।

ট্রেন ছাড়তেই রঘুরাজ ভাদুড়ী নামে এক মাঝ বয়সী ভদ্রলোক উচ্চস্বরে জয়... তারা... বলে উঠলেন। জানা গেল উনি সখের তান্ত্রিক। সেন্ট্রাল গভর্নমেণ্টে চাকরি করেন। বছরে কয়েকবার তন্ত্র সাধনার জন্য তারাপীঠ যান। পাশের সিটে বসেছেন অনুপবাবু। মায়াদেবী কপালে হাত ঠেকিয়ে একগাল

হেসে রঘুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি তারা মায়ের বড় ভক্ত— না? রঘুবাবু উচ্চস্বরে কথা বলেন। মুচকি হেসে রঘুবাবু বলেন না দিদি, আমি একা নই। আমরা সবাই, যারা এই ট্রেনে করে মায়ের কাছে যাচ্ছি। তবে এটা ঠিক, মা তারা কিন্তু অন্তরযামি— আমরা মুখে যাই বলিনা কেন, কার মনে কি আছে তা উনি বোঝেন। যার যা ফল প্রাপ্য তাকে তাই দেন। রঘুবাবুর কথা সকলের শুনতে বেশ ভালই লাগছিল।

বাইরে হঠাৎ মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হল। তার মধ্যেই ট্রেন চলছে রামপুরহাটের উদ্দেশ্যে। রঘুবাবু মানুষ আর ঈশ্বরের যোগসূত্র নিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। আর সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন। আস্তে আস্তে শ্রোতাও বাড়ছে। রঘু তান্ত্রিক বললেন একটা সত্যি ঘটনা বলি শুনুন। সমস্যায় পড়লে আমার কাছে এক প্রোমোটার আসতেন, কথাবাত্রা ভীষণ ভাল, অসম্ভব দূরদর্শী সম্পন্ন মানুষ। মানুষকে মেপে বিশ্বাস করেন। উনি জানতেন আমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনোই কোনো কাজ করিনা বা কথা বলিনা। এই আসা-যাওয়ার মাধ্যমে ওনার সাথে আমার সম্পর্কটা গভীর হয়ে উঠল। জন্মছক এবং ওনার কথাবার্তায় আমি বুঝেছিলাম উনি খুব প্রতিহিংসা পরায়ণ। নিজের সমস্যা মেটাতে খুবই উদ্গ্রীব, কিন্তু অপরকে সমস্যায় ফেলে রাখেন। নেতিবাচক কথাবার্তা তো সবসময় বলা যায় না, তাই ঠারেঠোরে বুঝিয়ে বলেছি, তাতেও কাজ হয়নি। একবার একটা মামলায় উনি গ্রেফতার হলেন এবং মাসখানিক জেল খাটলেন। তখন আমি ওনার মতিগতি ফেরানোর জন্য তারামায়ের কাছে গিয়ে মায়ের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করতে বললাম। গেলেনও তাই। একবার দুইবার যেতে যেতে ওনার তারাপীঠ যাওয়ার একটা মন তৈরি হয়ে গেল। সময় সুযোগ পেলেই উনি তারাপীঠ চলে যান। তারপর একসময় একটা দামি গাড়ি কিনলেন। নতুন গাড়ি পূজা দেবেন বলে স্ত্রী, সন্তান এবং ড্রাইভার নিয়ে উনি তারাপীঠ গেলেন। মায়ের পায়ে সবাই মিলে পূজা দিলেন। দুইদিন থাকলেন। তারাপীঠ সঙলগ্ন অনেক ছোট ছোট মন্দির আছে সেগুলোও দর্শন করলেন। তারপর ফেরার সময় ঘটল এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা। দৈবক্রমে ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে একটা খালি অ্যাম্বুলেন্স ফিরছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন ওনাদের চারজনকে হাসপাতালে পাঠালেন। মায়ের অসীম কৃপা, চারজনই প্রাণে বাঁচলেন। তবে প্রোমোটার ভদ্রলোক বেঁচেও মরে আছেন। উনি গাড়ির সামনে বসেছিলেন, সিটবেল্ট বাঁধেননি। এখন উনি চার দেয়ালের মধ্যে বিছানায় বন্দি, ক্রাচ নিয়েও হাঁটতে পারেন না। বাকি তিনজন ভালোই আঘাত পেয়েছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে তারা একদম সুস্থ।

এখানেই আমার প্রশ্ন। উনিতো মাকে পূজা দিয়েই ফিরছিলেন, তাহলে এমন হলো কেন? আসলে মা ওনার পূজা গ্রহণ করেননি। পূজার পুণ্যের থেকে পাপের বোঝাটা অনেক ভারি ছিল। রঘু তান্ত্রিক দুই হাতে নিজের দুই হাঁটুতে দুটো থাপ্পড় মেরে বললেন তাহলে মোরাল অফ দা স্টোরি কি হলো? আমাদের কাজ কর্মের মধ্যে স্বচ্ছতা, সততা, সংযম, ধৈর্যশীল মনোভাব হতে হবে। কাজে, কথায় প্রতিবন্ধকতা থাকলে চলবে না। আমরা আত্মবিশ্লেষণ করিনা। ভালো কাজের আনন্দ মন উপলব্ধি করে। কিন্তু খারাপ কাজের সুখ শরীর ভোগ করে, মন নয়।

ট্রেন চলছে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। ট্রেন অনেকটা পথ চলে এসেছে। সবাই মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে রঘু তান্ত্রিকের গল্প শুনছেন। ট্রেনের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। হকার এসে হেঁকে ভাব বুঝে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। চা-ওয়ালা আসতেই সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন একটু চা খাওয়া যেতে পারে। তাপস মণ্ডল সখের মুভি ক্যামেরাটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন চা-খান সবাই কিন্তু চায়ের দাম আমি মেটাবো। সবাই একটু আপত্তি করায় তাপসবাবু বললেন এখন আমরা আর আলাদা নই, এমন সুন্দর পরিবেশে সবাইকে এক কাপ করে চা খাওয়াতে পারলে আমি ধন্য হয়ে যাব। রঘু তান্ত্রিক— তাই হোক বলে সমর্থন জানিয়ে, জোরে হেসে উঠলেন। তাপসবাবুর পাশের সিটে বসেছেন দুই জন মধ্য বয়স পার করা দম্পতি। কার্তিক বসু ও স্মৃতি বসু। তাঁরা এতক্ষণ চুপচাপ বসে রঘু তান্ত্রিকের কথা শুনছিলেন। এবার কার্তিকবাবু ধূমায়িত চায়ের কাপে ঠোঁট স্পর্শ করে সকলের কাছে অনুমতি নেয়ার সুরে বললেন আমি সবার সাথে আমার জীবনের একটা ঘটনা শেয়ার করতে চাই। রঘু তান্ত্রিক বললেন, নিশ্চয়ই... বলুন। বাইরে মুসলধারে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। কার্তিকবাবু শুরু করলেন বছর কুড়ি আগের ঘটনা। আমি তখন এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ক্লাস থ্রী স্টাফ ছিলাম। আমি তারামায়ের ভক্ত কিন্তু ওটা আমার মনে ছিল। সামান্য মাহিনা পাই, পাঁচ সন্তান, বৃদ্ধ বাবা-মা-কে নিয়ে আমার সংসার। ওভার টাইম নিয়ে যা পেতাম তাতে কোনো রকমে চলে যেত। ইচ্ছা থাকলেও মায়ের জন্য কিছু করে উঠতে পারিনি। একদিন আমার এক সহকর্মী অফিসে এক ভদ্রলোককে আমার কাছে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোকের নাম সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ভদ্র লোককে দেখে মনটা যেন ভক্তি ভাবে ভরে উঠলো। উনি বললেন, তারাপিঠের তারা মায়ের একটা পালার ভার যেন আমি নেই। পালা মানে একদিনের পূজার সমস্ত খরচ। আমি আমতা আমতা করে জানতে চাইলাম টাকার পরিমাণ কত! যখন জানলাম দশ হাজার টাকা, আমি তো আকাশ থেকে

পড়লাম। কারণ ওই টাকা আমি মাহিনাই পাই না। আমি অপারগ জানাতে, সৌম্য দর্শন শান্তশিষ্ট মৃদুভাষী সত্যবাবু বললেন, আমি সেই তারাপীঠ থেকে কলকাতায় এসেছি, এটা মায়ের ইচ্ছে ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়।

আমি বাড়িতে এসে স্ত্রীর সাথে আলোচনা করে দশ হাজার টাকা অনেক কষ্টে জোগাড় করলাম এবং নির্দিষ্ট দিনে তারাপীঠ–এর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেই আমার প্রথম স্বপরিবারে তারাপীঠ যাওয়া। মায়ের পাশে থেকে নিজের হাতে মায়ের আসল মূর্তিতে ঘি মাখিয়ে স্নান করানো, শাড়ি গহনা পরানো, পূজা করা— ওঃ সে যে কি তৃপ্তি বলে বোঝাতে পারব না। তারপর যখন পূজার শেষে গরিব দুঃখীদের বসিয়ে খাওনো হচ্ছিলো (যাকে ভান্ডারা বলে), সেই গরিবদের মধ্যে মুসলমান ছিল বেশি, ওরা হয়তো আল্লার কাছে পেটপুরে খাওয়ার প্রার্থনা করে ছিলো। ঈশ্বর তো সবই এক, তাই ওদের এখানে টেনে এনেছেন। সেই পরিস্থিতিতে আমার মনে হচ্ছিলো মা যেন আমাকে দিয়েই কাজটা করিয়ে নিলেন। তারপর জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে গেলাম। এই দশহাজার টাকার ধারটা আমি কি ভাবে যে শোধ করলাম সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না। তার পরেই ঘটলো আমার জীবনের কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা। যার ব্যাখ্যা আজও আমি খুঁজে পাইনি। ভাবলে মনে হয় স্বপ্নের মতন সময়টা কেটেছে। মা তারার ইচ্ছে ছাড়া কখনোই এটা সম্ভব নয়। সেই জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ শরীরে বছরে এক বার হলেও মাকে দর্শন করে আসি। হয়তো মা'ই আমাদের টেনে নিয়ে যান।

এবার ঘটনাগুলো বলি। আমার দুই মেয়ের হঠাৎ এক সাথেই বিয়ে ঠিক হলো। এক মেয়ের বিয়ের টাকা নেই তো দুই মেয়ে! মহা চিন্তায় পড়লাম স্ত্রী তো সরাসরি বলেই দিলেন যে ভাবেই হোক টাকা জোগাড় করতে হবে, এই পাত্র উনি হাত ছাড়া করতে পারবেন না। এতো দু এক হাজার টাকার গল্প নয়, দুটো মেয়ের বিয়ে একসাথে সোনার গহনা কিছুটা তৈরি করাছিলো সেটা বাদেও লাখ দুয়েক টাকা তো লাগবেই। আত্মীয় স্বজনকে না বলে পরিচিত মহলে কথাটা পাড়বো ভাবছি, এমন সময় অফিসে গিয়ে শুনলাম আমাদের ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। আমি অফিসার পদে উন্নীত হয়েছি। আমার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা, আমি কি ভাবে অফিসার হলাম বুঝতেই পারলাম না। মাইনে হয়ে গেলো চারগুণ, এরিয়ার নিয়ে ব্যাংকে লাখ দেড়েক টাকা ঢুকলো। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। দুই মেয়ের বিয়ে সুন্দর ভাবেই মিটল, বিয়ে মিটতেই মেয়ে জামাইদের নিয়ে তারা মায়ের কাছে পুজো দিয়ে আসলাম। তারপর ঘটলো তৃতীয় ঘটনা, আমি তখন থাকতাম একটা ভাড়া বাড়িতে। বৃদ্ধা মালকিন তার

নিজের কেউ নেই। উনি বেশ কিছুদিন হলো আমাদের উঠে যেতে বলছিলেন। কারণ তার ভাইপো ভাইজিরা বাড়ি বিক্রয় করে ওনাকে তাদের কাছে নিয়ে যাবে। দরদাম করে বাড়িটা আমি নিয়ে নিলাম। চুরি ডাকাতি করিনি, হঠাৎ কিছু শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা পেলাম। ধারদেনা অনেকটাই হয়েছে, কিন্তু তারা মায়ের ইচ্ছায় কয়েক বছরের মধ্যে সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

রঘুবাবু এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে কার্তিকবাবুর বলা ঘটনাগুলো শুনছিলেন। এবার চোখ খুলে বললেন, একদম তাই, এই যে আত্মবিশ্লেষণ করেছেন, তাই তো এত সহজে চাওয়া পাওয়ার হিসাবটা বুঝে নিতে পেরেছেন। এতক্ষণ কার্তিক বোসের স্ত্রী স্মৃতি বোস স্বামীকে সমর্থন করে শুনছিলেন কথাগুলো এবার উনি বললেন জানেন তো আমি কিন্তু একদম সুস্থ নই, হাঁটুর মালাইচাকির জেলি শুকিয়ে গেছে, ভালো ভাবে হাঁটতে পারি না, দশ মিনিটও দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, সুগারে ধরেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য বছরে একবার তারা মায়ের চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করতে যাই, আমার কিন্তু কোনো কষ্ট হয় না। একবার তো শীতকালে তারাপীঠে গিয়ে পাথরের মেঝেতে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে পুজো দিয়েছি। তবুও কিছুই হয়নি, সবই তাঁর ইচ্ছা। রঘুবাবু বললেন আমরা কিছুই করি না সবই তিনি করান, এই যে অসুস্থতা নিয়ে যাচ্ছেন এটা আপনি যাচ্ছেন না, আপনাকে মা নিয়ে যাচ্ছেন তাই আপনি যেতে পারছেন, মা না ডাকলে কেউ কখনো মায়ের দর্শন পায় না।

তাপসবাবু এতক্ষণ মুভি ক্যামেরাটা নিয়ে ভিডিও রেকডিং করছিলেন। উনি বললেন, এই রকম পরিবেশ তাঁর একটি ঘটনার দায় স্বীকার করতে ইচ্ছা করছে। সবাই অনুমতি দিলে উনি বলতে পারেন। সবাই শুনতে চাওয়ায় তাপস বাবু শুরু করলেন, বছর দশেক আগের ঘটনা, আমার এক বন্ধু, সংসারী, ছোট খাটো একটা কাজ করে। মা, স্ত্রী, সন্তান নিয়ে পাঁচ জনের সংসার। নিজের একটা দোতলা বাড়ি আছে, ফলে ঘর ভাড়া গুনতে হয় না এই যা। দ্রব্যমূল্য আগুন হওয়ায় সংসার খরচে পেরে উঠছিল না। এমন সময় এক টাওয়ার কোম্পানি বাড়িতে এসে উপস্থিত, তারা ছাদ ভাড়া নেবে, কোম্পানির প্রতিনিধিরা একটা তারিখ ঠিক করে কিছু ডকুমেন্টস জেরক্স করে রাখতে বললেন। বন্ধু যেন হাতে চাঁদ পেলো, মনে উৎফুল্লতা নিয়ে জানতে সে চায় ছাদ ভাড়া কত পাবে? সাত হাজার টাকা ভাড়া হবে জানিয়ে কোম্পানির লোকেরা বিদায় নেয়। সেদিন বাড়িতে লক্ষ্মী পূজা ছিল, বন্ধুর মা খুশি মনে বললেন, মা লক্ষ্মী এবার তোর কিছুটা অভাব দূর করে দেবেন। নির্দিষ্ট দিনের কয়েক দিন আগে কোম্পানির প্রতিনিধিদের তরফ থেকে ফোন করে একটা

মোটা টাকার ঘুষের প্রস্তাব এলো। বন্ধুর তো অত টাকা নেই, সে জানিয়ে দিল কোম্পানি যে অ্যাডভান্স-এর টাকা দেবে সেটা দিয়ে দিতে রাজি আছে। যাইহোক নির্দিষ্ট দিনে আমার বন্ধু স্ব-কাজে না গিয়ে, কোম্পানির বলে দেয়া ডকুমেন্টস হাতে অপেক্ষা করতে থাকলো। সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু টাওয়ার কোম্পানির প্রতিনিধিরা এলো না। বহুবার ফোন করলো, কিন্তু ফোন ধরলো না। একসময় তারা ফোনের সুইচ অফ করে দিলো। হাতের লক্ষ্মী সরে যাচ্ছে এই ভেবে বন্ধু খুব হতাশ হয়ে পড়লো। সপ্তাহ দুই পর দেখা গেল সেই টাওয়ার পাশের দুটো বাড়ির পরের বাড়িতে বসছে। আমার বন্ধু একদম ভেঙে পড়ল। বড় আশা করেছিল যে। তারপর একটু হতাশা কাটিয়ে নিয়ে ও আদা-জল খেয়ে বিভিন্ন কোম্পানির টাওয়ার-এর খোঁজ করতে লাগলো। ঠিক করলো, ধার করে হলেও ঘুষ দেবে। পরে বিশ-তিরিশ বছর তো নিশ্চিন্ত। এত খোঁজ খবরে নিমগ্ন ছিল যে আমরা পেছনে ওকে টাওয়ার পাগলা বলে ব্যঙ্গ করতাম। এক দিন বন্ধুরা সবাই মিলে খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে বললাম— যা তারাপীঠে গিয়ে মাকে পুজো দিয়ে তোর মনের ইচ্ছাটা নিবেদন করে আয়।

ওর তখন মানসিক অবস্থা এমন যে আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ না বুঝে সত্যি ভেবে চলে গেল তারাপীঠ। সেখান থেকে ফিরে এসে মায়ের প্রসাদ নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে তারাপীঠের পুজোর বর্ণনা করতে থাকে। মেইনলি আমার পরিবারের সাথেই কথা বলতে এসেছিল। বলেছিল, জানো তো আমি আগে দুবার তারাপীঠে গিয়েছি। তবে ওই গর্ভগৃহের মুখ থেকে প্রণাম করেই চলে এসেছি, আর যে ভেতরে যাওয়া যায় এটা আমি জানতামই না। এবার কলকাতা থেকে এক পাণ্ডার খোঁজ নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি সত্যিই খুব ভালো মানুষ। আমাদের সকলকে নিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢুকে গেলেন। তারপর মায়ের চারধারে স্টিল ব্যারিকেটটা খুলে বললেন, আমরা মায়ের পায়ে হাত দিয়ে যেন আমাদের চাওয়া পাওয়াটা নিবেদন করি। মা আমাদের সমস্ত আশা পূরণ করবেন। আমি ভেতরে ঢুকে মায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলি মাগো আমি সব পেয়েছি তোমাকে যে এমন ভাবে ছুঁতে পারবো জীবনে কল্পনাও করতে পারিনি। তাপসবাবু বললেন, বন্ধুর এই অত্যুক্তি আমার একদম পছন্দ হয়নি। আমি তীর্যক ভাবে মন্তব্য করি— তারা মায়ের চরণ ধরার সুযোগ পেয়েও তুমি মনসকামনাটি বললে না, এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? আমার রিয়াক্টের ধরনে ও খুব অপমানিত হয়েছিল। যেটা আমি অনেক পরে বুঝে ছিলাম। বন্ধু শুধু বলেছিল— যা ঘটেছে তাই বললাম, বিশ্বাস তো যে শুনবে তার উপর নির্ভর করে। এই ঘটনার পর থেকে বন্ধু আর টাওয়ার নিয়ে মাতামাতি করতো

না এবং আমাদের সাথে আলোচনা পর্যন্ত করতো না। এই পর্যন্ত বলে তাপসবাবু একটু থামলেন।

সবাই গল্পে এতটাই মশগুল যে কতটা পথ আসলো তাও জানার ইচ্ছা নেই। শুধু এটুকু বুঝলো বাইরে বৃষ্টি কমলেও বন্ধ হয়নি। শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন তখন বলে উঠলো, নিশ্চয়ই চিটিং বাজের খপ্পরে পড়ে অনেক টাকা গুণগারী দিতে হয়েছে। তাপসবাবু বললেন, না না, তাহলে আমি খুবই কষ্ট পেতাম। কারণ ও আমার খুব ভালো বন্ধু। আমিতো চাইবো না ওর কোনো ক্ষতি হোক। যাইহোক তারপর যে ঘটনাটা ঘটল, তাতে আমি তো খুব খুশি হয়েছিলামই তারসাথে আমার একটা ভুল ভেঙে গেল। সবাই ব্যাপারটা জানতে উদগ্রীব হলে উনি বলতে শুরু করলেন। তারাপীঠ থেকে পূজা দিয়ে আসার পাঁচ বছরের মধ্যে বন্ধুর জীবনে বড় পরিবর্তন এলো। তার জন্য বন্ধুকে দৌড়দৌড়ি করতে হয়নি, কোনো মুরুব্বি ধরতে হয়নি। বাবার তৈরি পুরোনো দোতলা বাড়িটা ভেঙে ফ্ল্যাট হয়ে গেল। ওরই পরিচিত এক প্রোমোটার ফ্ল্যাটটা করলেন। দোকান, ফ্ল্যাট নিয়ে অনেকটা পজিশন পেলো। ওর জীবন যাপনের মান অনেক উন্নত হলো। এরই মধ্যে হঠাৎ ওর কলেজ লাইফের বন্ধু এসে নিজের পুরোনো পরিচয় দিয়ে নুতন করে সম্পর্ক গড়লো। তিনি আবার এক বড় মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার ডিপার্টমেন্টের মস্ত অফিসার। তাঁর দৌলতে সাতের জায়গায় সতেরো হাজার টাকা ভাড়াতে ফ্ল্যাটের ছাদে টাওয়ার বসলো। সবটাই যেনো ভোজ বাজি। রঘুবাবু বললেন মা অন্তর্যামী, আপনার বন্ধু তাঁর ইচ্ছা মায়ের কাছে ব্যক্ত না করলে কি হবে, উনি তো জানেন তিনি কি আশা নিয়ে গিয়েছিলেন। তার থেকে বড় কথা, ওই সম্পদ ওনার ভাগ্যে ছিল। মা একটু গুছিয়ে দিয়েছেন। টাওয়ারটা প্রথমে বসলে তো ফ্ল্যাটটাই হত না। দেখুন আমরা যদি প্রতিটা মানুষ নিজেদের জীবনের প্রতি আলোকপাত করি, তো দেখবো এই রকম অবিশ্বাস্য ঘটনা সবার জীবনে একটা না একটা আছে, যেটা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

বর্ধমান স্টেশন অনেকটাই পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার। চা-ওয়ালা চা নিয়ে ঢুকতেই অনুপবাবু সকলের জন্য চায়ের অর্ডার করলেন। রঘুবাবু চা খেতে খেতে মজা করে বললেন, আগে জানলে টাকা-পয়সা না নিয়েই আসতাম, বেশ সব কিছু ফ্রী ফ্রী হয়ে যাচ্ছে। অনুপ বাবুও মজা করে বললেন— না না, আপনাকে ফ্রী চা খাওয়াচ্ছি না, আমরা জ্ঞান অর্জন করে তা পুষিয়ে নিচ্ছি। রঘুবাবু হাসতে হাসতে বললেন জ্ঞান শুধু অর্জন করলেই হবে না, উপযুক্ত জায়গায় তা প্রয়োগ করতে হবে। জ্ঞান হচ্ছে লোহার

অস্ত্রের মতো। যত শান দিয়ে ঘসা-মাজা করবেন ততই ধার বাড়বে এবং ঝক ঝক করবে। কোনো প্রতিবন্ধকতা আসলে তা যুক্তি এবং জ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে খান খান করে ফেলা যায়।

মায়া চক্রবর্তী এতক্ষণ চুপচাপ মন দিয়ে আলোচনা শুনছিলেন। তারপর রঘুবাবু-কে উদ্দেশ্য করে বললেন—এই যে আপনি বললেন, মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা যুক্তি ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝান যায় না। আমার মায়ের জীবনে এমনই একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঘটনাটা আমি আপনাদের সাথে বলতে চাই। রঘুবাবু উৎসাহের সাথে বললেন— অবশ্যই, রামপুরহাট পৌঁছতে আর অল্প সময় বাকি আছে, সময়টাও কেটে যাবে।

মায়াদেবী শুরু করলেন— আমার মায়ের যখন বয়স বছর পঁচিশ, তখন আমার বাবা মারা যান। কঠোর বৈধব্য জীবন মেনে চলেছেন। বৃদ্ধ বয়সে উনি সংসারে না থেকে তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতেন। বয়সের ভারে মা খুব মোটা হয়ে গিয়েছিলেন, কানেও শুনতে পেতেন না। যাইহোক, আমি যে ঘটনাটা বলতে যাচ্ছি সেটা হরিদ্বারে ঘটেছিল। পঞ্চাশ বছর আগের হরিদ্বার আজকের হরিদ্বারের মতো ছিল না। এত বড় বড় হোটেল ছিল না। যারা বেড়াতে যেতেন, ওই এলাকার ছোট ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিতেন। ঠিক তেমনি আমার মা হরিদ্বার ঘাট থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। একদিন বাসার পার্শ্ববর্তী শিব মন্দিরে শিবের মাথায় জল ঢেলে বাসায় ফিরছিলেন। বড় রাস্তার ধার দিয়ে উনি আস্তে আস্তে হেঁটে আসছেন, একটা সময় রাস্তা পার হওয়ার জন্যে উনি রাস্তার মাঝখানে প্রায় চলে এসেছেন এমন সময় কোথা থেকে এক লোমশ সাদা ভল্লুকের মতো পাহাড়ী কুকুর মায়ের সামনে এসে হাজির হলো। ভয়ে মায়ের হাত পা ঠান্ডা। রাস্তা পার হবেন কি, উনি একপা দুইপা করে সামনে না গিয়ে পিছনে হাঁটতে থাকেন। কুকুরটিও মায়ের হাঁটার গতির সাথে তাল মিলিয়ে মায়ের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। পাঁচ-সাত পা পিছতেই মায়ের পিছনে বড় পাহাড় পড়লো, মা ভয়ে পাহাড়ে পিঠ ঠেকিয়ে আটকে গেলেন, আর কুকুরটি সোজা মায়ের কাছে এসে পিছনের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে, সামনের দুই-পা দিয়ে মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরলো। তারপর গোলাপি রঙের লম্বা জিভটা বার করে সশব্দে মাকে পাহাড়ের সাথে আটকে রাখলো। ভয়ে মায়ের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছে না। দুপুর বেলা একটা মানুষ দেখা গেল না যে মাকে উদ্ধার করবে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মা এবং কুকুরের গা ঘেঁষে সাত আটটা মিলিটারী ভ্যান হুশ হুশ করে বেরিয়ে গেল। মিলিটারী ভ্যান চলে যেতেই কুকুরটিও মাকে ছেড়ে নিমেষের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

এরই মধ্যে ট্রেন জোরে জোরে হর্ন বাজাতে বাজাতে রামপুরহাট স্টেশনে ঢুকলো। এখন বৃষ্টি হচ্ছে না ঠিকই, তবে আর যে হবে না এমন কোনো কথা

নেই। সন্ধ্যা সাতটা বাজে, আলো–আঁধারিতে যা বোঝা গেল, বৃষ্টি বন্যার রূপ নিয়েছে। স্টেশনের বাইরে জল থইথই করছে। মনে হচ্ছে স্টেশনটা যেন জলের মধ্যে। পৌরসভার দুটো নৌকো স্টেশনের লাইট পোস্টে বাঁধা আছে। রঘুবাবু উচ্চস্বরে বললেন— দিদি, আপনার মাকে তো স্বয়ং ভোলানাথ কুকুরের রূপ ধরে এসে রক্ষা করেছিলেন। এখন যা অবস্থা দেখছি, মা তারা আমাদের নিয়ে কি করবেন সেটাই দেখার।

এরই মধ্যে মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, আপৎকালীন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার এক ঘন্টা পর শিয়ালদহে ফিরে যাবে। এরপর আর ট্রেন চলবে না। অনেক জায়গায় রেল লাইন জলমগ্ন তাই কবে ট্রেন চলবে তা নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। কম্পার্টমেন্টের সমস্ত প্যাসেঞ্জার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। এরই মধ্যে একজন টি টি এসে জানায়, বাইরের পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ। মন্দির পর্যন্ত যেতে পারলেও হোটেল পাওয়া মুশকিল। খাদ্য সংকট দেখা দেবে। কারণ দ্বারকা নদীর জল প্লাবিত হয়ে মন্দির সহ সমস্ত এলাকা ভাসিয়ে দিয়েছে। টি টি জানালেন আমরা মন্দিরের দিকে না গিয়ে গৃহাভিমুখে গমন করলেই সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ট্রেনের সবাই স্টেশন থেকে জল রাতে খাওয়ার জন্য হালকা খাবার কিনে নিলেন। রঘুবাবু একটু হতাশার সুরে বললেন দেখলেন তো, মা আমাদের কাছে টানেননি, তাই তো এত কাছে এসেও মন্দিরে যেতে পারলাম না। মায়াদেবী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার একটা পাপের শাস্তি আজ সবাইকে পেতে হল। রঘুবাবু মায়াদেবীকে ওভাবে ভাবতে বারণ করলেন। মায়াদেবী বারণ না শুনে বললেন— ঠিকই বলছি, এটা আমারই পাপ। আমি সারা জীবন কোনো তীর্থক্ষেত্রে যায়নি। বলতে পারেন যেতে চাইনি। আমার ধারণা ছিল, মনই হচ্ছে বড় তীর্থক্ষেত্র, এই জায়গাটা পবিত্র রাখা উচিত। আজ সারা জীবনের মেনে নেওয়া বিশ্বাস ভেঙে নিজেই এসেছি মায়ের কাছে। এটা কি উনি মেনে নিতে পারেন! তাই আজ তাঁর মন্দিরের দোরগোড়া থেকে আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে। এই বলে মায়াদেবী মন্দিরের উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম করে বললেন, মা আমাকে ক্ষমা করো, সকলের মঙ্গল করো, এই দুর্যোগের রাতে তোমার চরণে যখন ঠাঁই দিলে না তখন এই ক্লান্ত, শ্রান্ত মানুষগুলোকে তুমি নির্বিঘ্নে তাদের গৃহে পৌঁছে দিও।

কম্পার্টমেন্টটি কয়েকে মুহূর্তের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মা তারা যেন ট্রেনের ইঞ্জিন হয়ে ঝম ঝম শব্দে হুইশেল বাজাতে বাজাতে ট্রেনের বগিগুলোকে নিয়ে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। ❑

নিয়তি

প্রয়োজনে এক নিশি যাপনের মূল্য আমি দশ লক্ষ টাকা দিতে পারি, সুতরাং কমলাবাঈকে আজ আমার চাই-ই চাই। উদিতপ্রতাপ সিংহ সুরাতে নিমজ্জিত হইয়া চাকর রামবিলাসকে হুকুম করিল ।

উত্তর প্রদেশের প্রভাবশালী মন্ত্রী জনার্দনপ্রতাপ সিংহ। ঠাকুরদা মশায়ের ছিল জমিদারী, রক্তে সেই ভাবধারা আজও বিদ্যমান। মন্ত্রিত্ব চালনা করিতে জমিদারী প্রভাব প্রকট হইয়া উঠে। প্রবাদ আছে বংশ হইতে শাখা দীর্ঘ, ঠিক তেমনি পুত্র উদিতপ্রতাপ সিংহ পিতা হইতে যোজন মাইল আগাইয়া আছে। নারী ও সুরায় আসক্ত উদিতপ্রতাপের উৎপীড়নে এলাকাবাসীরা তটস্থ। থানা পুলিশে অভিযোগ করিলে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। পুলিশের ঘাড়ে কয়টি মাথা আছে যে উদিতপ্রতাপের কেশাগ্র স্পর্শ করিবে? ফলস্বরূপ উদিতের উচ্ছৃঙ্খলতার বোঝা দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। পিতা জনার্দনপ্রতাপের কোনো হেলদোল নাই দেখিয়া মাতা মীরাদেবী অনেক ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও সুফল কিছুই মিলিল না। উপরন্তু তাহার নষ্টামি ভ্রষ্টাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবারাত্র মদ্যপানে নিমজ্জিত হইয়া অপকর্ম করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় জনার্দনপ্রতাপ যখন বুঝিলেন, পুত্র তাহার হস্তের মধ্যে নাই, তখন স্বাভাবিক পথে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। কুলগুরুকে গৃহে আনিয়া পুত্র সম্বন্ধে সবিস্তারে জ্ঞাত করিলেন। সমস্ত বিষয়ে অবগত হইয়া কুলগুরু উদিতপ্রতাপকে বিবাহ দিবার উপদেশ দিলেন। তাহাতে যদি চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণ হয়।

চতুর্দিক অন্বেষণ করিয়া এক সুলক্ষণা রমণীর সহিত উদিতপ্রতাপের বিবাহ হইলো। বিবাহের পর মাস দুই তিন নির্বিঘ্নে কাটিল বটে, তাহার পর সে আগের মতই আচরণ করিতে শুরু করিল। উদিতপ্রতাপ ভুলিয়া গেলো যে সে বিবাহিত। নিশি যাপন চলে পিতার বাগান বাড়িতে।

এই ভাবেই বছর পাঁচেক অতিক্রান্ত হইলো। উদিতপ্রতাপের উৎপীরন চরম সীমায় উপনীত হইলো। এরই মধ্যে কুলগুরু গৃহে আসিয়া উপস্থিত। কেদারনাথ যাইবার প্রাক্কালে তিনি শিষ্য বাড়িতে ঘুরিয়া যাইতে চান। মীরাদেবী তো হস্তে চন্দ্র পাইলেন। ঈশ্বরসম সেবা করিয়া, তার চরণে মিনতি করিলেন যে তিনি যেন তাহার পুত্রের মতিগতি পরিবর্তন করাইয়া সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে আনিয়া

দেন। এরই মধ্যে উদিতপ্রতাপ বাড়িতে প্রবেশ করিল এবং কুলগুরুর সম্মুখে পড়িয়া গেল। উদিতপ্রতাপ গুরুর প্রতি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ ছিল কারণ বিবাহ নামক ঝঞ্ঝাটটি উনিই তাহার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। সুতরাং মুখোমণ্ডলে বক্রোক্তি প্রকাশ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। উদিতপ্রতাপের তাচ্ছিল্য প্রকাশের ধরন গুরুর নজর এড়াইল না। ততক্ষণে তিনি উদিতপ্রতাপের কুষ্ঠি বিচার করিয়া ফেলিয়াছেন। উদিতপ্রতাপের স্ত্রীকে কাছে ডাকিয়া কুলগুরু তার ললাট নিরীক্ষণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন উদিতপ্রতাপের স্ত্রীর সিঁন্দুর পরিহিত ললাটটি সাদা হইয়া আছে। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া উদিতপ্রতাপকে তাহার সম্মুখে আসিতে কহিলেন এবং নিজে কিছু হিসাব নিকাশে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে মীরাদেবী অনেক বুঝাইয়া উদিত প্রতাপকে গুরুজীর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। গুরুজী উদিতপ্রতাপকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় চমকিয়া উঠিলেন। এতক্ষণ ধরিয়া তিনি যে গণনা করিলেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভুল। এদিকে গুরুজীও তাহার সহিত মা এবং স্ত্রীর আচরণ উদিতপ্রতাপের নিকট নিছক যাত্রাপালা ছাড়া আর কিছুই মনে হইলো না। পিতা গৃহে উপস্থিত থাকায় সে নীরবে সবকিছু সহিতে ছিল। এবার গুরুজী ঘর হইতে উদিতপ্রতাপ এবং তাহার পিতামাতা ছাড়া সবাইকে বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। গুরুজীর নির্দেশ মোতাবেক সকলে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলে গুরুজী উদিতপ্রতাপকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, দেখ উদিতপ্রতাপ, আমি এই মুহূর্তে যে কথাগুলি বলিব তাহা আমার গণনার ফল। তোমাকে ভয় দেখাইবার জন্য নহে। জনার্দনপ্রতাপ এবং মিরা দেবীর উদ্দেশ্যে বলিলেন, তোমরাও চিত্ত দৃঢ় করো কারণ পরিবারে এক জনের পাপের ফল অন্যদেরও ভোগ করিতে হয়। উদিত প্রতাপ বিরক্ত বোধ করিতে লাগিল ভাবিল গুরুজী ঝাড়িয়া কাশিলে সে প্রস্থান করিতে পারে। জনার্দনপ্রতাপ উদ্বিগ্ন হইয়া অশুভ সংকেত কিনা জানিতে চাহিলেন। গুরুজী চোখ বন্ধ করিয়া গণনাকৃত ফলাফল বর্ণনা করিতে লাগিলেন, মানুষের জীবনে কিছু সুকর্ম, কিছু দুষ্কর্ম থাকে। উদিত প্রতাপ এই বয়স পর্যন্ত কোনো সুকর্ম করে নাই, পাহাড় প্রমাণ দুষ্কর্মই করিয়াছে। ফলস্বরূপ এই ধরাধামে উহার জীবনদ্বীপ নিভিবার সময় হইয়া গেছে। গুরুজী আপনি কি বলিতেছেন, বলিয়া মীরাদেবী উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। উদিতপ্রতাপ ফুৎকারে গুরুজীর ভবিষ্যদ্বাণী উড়াইয়া দিলেন, মনে মনে বলিল, যতো সব বুজরুকি। জনার্দনপ্রতাপ কিছু একটা বলিতে উদ্যত হইতে ছিলেন। গুরুজী তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, আমি এইখানে কোনো প্রকার ধৃষ্টতা করিতে আসিনাই।

বলার মধ্যে তার গণনা শক্তিই যথেষ্ট প্রকট হইলো। তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমাদের শুনিতে ভালো লাগিবে না জানিয়াই বলিতেছি। আগামী একশো ঊনসত্তর দিন পূর্ণ হইলে যে অমাবস্যা তিথি পড়িবে, সেই দিন দ্বিপ্রহরে দুইটা একুশ মিনিট গত হইয়া দুইটা বত্রিশ মিনিটের মধ্যে উদিতপ্রতাপের মৃত্যু হইবে এবং সেই মৃত্যুর কারণ হইবে একটি সর্প। মীরাদেবী উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। উদিত এক ঝটকায় উঠিয়া দাঁড়াইল তাহার পর, যত সব পাগলের প্রলাপ বলিয়া স্থান ত্যাগ করিল। জনার্দনপ্রতাপ গুরুজীর সম্মুখে নত মস্তকে বলিলেন পুত্রকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর একটা কথা বলুন গুরুজী এইরূপ ঘোর সংকট হইতে কি কোনো ভাবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়? গুরুজী জনার্দনপ্রতাপকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, সবে মাত্র বিবাহ হওয়া তোমার পুত্রবধূর দিকটি কি আমি চিন্তা করিনাই। কিন্তু বিধাতার লিখন কে খণ্ডাইবে বলো। এই একশো ঊনসত্তর দিন প্রতাপের দ্বারা সুকর্ম করাইয়া দেখিতে পারো।

এক হইতে একশো উনপঞ্চাশ এর দূরত্ব দিনে দিনে কমিতে থাকিল। উদিত প্রতাপের স্ত্রী যেন সহ মরণের পথে আগাইয়া যাইতে লাগিলেন। নাওয়া খাওয়া প্রায় বন্ধের মুখে। বুঝাইয়া কিছু তরল খাদ্য খাওয়ানো হইতেছে। দিনের বেশির ভাগ সময় তিনি ঠাকুর ঘরে কাটান। ঈশ্বর যদি তাহার ললাট লিখন খণ্ডিতে পারেন। উদিতপ্রতাপের মাতা পুত্র শোকে বিহ্বল। তিনি মনে প্রাণে গুরুজীর ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করেন। সেই মোতাবেক তিনি দুই হস্ত ভরিয়া দান করিতে লাগিলেন। গুরুজীর কথা অনুযায়ী তাহাতে যদি কিছু পাপ খণ্ডায়।

জনার্দনপ্রতাপ সিংহ রাশ ভারী মানুষ। তাহাকে দেখিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, অন্তর দহনে তিনি শেষ হইয়া যাইতেছেন। স্ত্রীকে দান ধ্যান করিতে বাধা তো দিচ্ছেনই না, বরং তাঁহার এলাকার জনহিতকর কাজ যত শীঘ্র সম্ভব করিয়া দিতেছেন। পাশাপাশি অন্য পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করিতেছেন কিরূপে এইরূপ চরম সংকট হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

গুরুজীর সতর্ক বাণী প্রথম দিকে উদিতপ্রতাপ কর্ণ গোচর করেনি। মৃত্যু ভয় বড়ো চরম অনুভূতি, যাহা উদিতপ্রতাপ তিলে তিলে অনুধাবন করিতে লাগিল। প্রথমদিকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেও মৃত্যুর দিনক্ষণ যত আগাইয়া আসিতে লাগিল। উদিত প্রতাপের মৃত্যুভয় ততই বাড়িতে লাগিল। এমতাবস্থায় মৃত্যুভয় মস্তক হইতে নিবারণের নিমিত্তে সুরাই সর্ব সময়ের সঙ্গী হইল।

জনার্দনপ্রতাপ সিংহ এই সকল সমস্যা লইয়া অন্য কয়েকজন পণ্ডিতের দ্বারস্থ হইলেন এবং অনেক বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা এইরূপ একটি

সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে— মৃত্যুর চরম মুহূর্ত নির্ধারিত একাদশ মিনিট যদি উদিতপ্রতাপ রুদ্ধ দ্বারে থাকিতে পারে, তাহা হইলে উক্ত সময় অতিক্রান্ত হইয়া গেলে মৃত্যুযোগ কাটিয়া যাইতে পারে। গৃহে ফিরিয়া স্ত্রীর সহিত সবিস্তারে আলোচনা করিলেন। সকলেই পণ্ডিতদের সুপরামর্শ শুনিয়া আশার আলো দেখিতে পাইলেন। ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট দিন দ্বারে আসিয়া কড়াঘাত করিল।

পশ্চিমবঙ্গের লোক গাথায় বেহুলা আখ্যানের লখিন্দরের বাসর গৃহের ন্যায় একটি গৃহ নির্বাচন করা হইল। যেখানে একটি কেঁচো আকৃতির সরীসৃপও প্রবেশ করিতে পারিবে না, বিষধর সর্প তো অনেক দূরের প্রাণি।

প্রভাত হইলো কিন্তু ভানুর দেখা মিলিল না, মনে হইতে লাগিল গোধূলি বেলা। জনার্দন প্রতাপ সিংহের আলয় আজ যেন শ্মশান ক্ষেত্র। অপরাধীকে যেন আজ বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হইয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন একটা হাহাকার অনুভূত হইতে লাগিল। উদিতপ্রতাপের স্ত্রী রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়েই অধিষ্ঠান করিতেছেন। মীরাদেবীও পুত্রবধূর ন্যায় একই ভাবে দেবালয়ে মস্তক ঠুকিয়া ঈশ্বরের চরণে পড়িয়া রইলেন। নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উদিতপ্রতাপ আর্শির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং চমকাইয়া উঠিলেন। মৃত্যু ভয় তাহাকে এমন আবদ্ধ করিয়াছে যে মুখমণ্ডলে তাহা পরিস্ফুটিত হইয়াছে। দুই হস্ত মুষ্টি করিয়া চক্ষু রগড়াইয়া ভাবিলেন, গতরাতে দুশ্চিন্তায় ভালো করিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন নাই। ফলস্বরূপ হয়তো এইরূপ মনে হইতেছে। শূন্য জঠরে ঢক ঢক করিয়া কয়েক পেয়ালা সুরা ঢালিয়া দিলে জনার্দন প্রতাপ অকস্মাৎ উদিতপ্রতাপের কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তাকে মত্ত অবস্থায় দেখিয়া রাগান্বিত না হইয়া বলিলেন, তোমার জন্য একটি সুরক্ষিত কক্ষ নির্বাচন করা হইয়াছে। তুমি সেখানে চলিয়া যাও, মধ্যাহ্ন গড়াইয়া অপরাহ্নে পদার্পণ করা অবধি তুমি সেখানে অবস্থান করিবে।

পূর্ণ মধ্যাহ্ন অতিক্রম করিল। সিংহ পরিবারে কালো মেঘের ঘনঘটা। নাওয়া খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া চাতক পাখি যেমন বর্ষার আগমনের অপেক্ষা করে, সেইরূপ সিংহ পরিবার দুইটা বাজিয়া তেত্রিশ মিনিটের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সম্পূর্ণ বাড়ি লেঠেল দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইলো। রুদ্ধ কক্ষে উদিতপ্রতাপ একাকী অকাল মৃত্যুর অলংঘ নির্দেশের কাল গুনিতে লাগিল। চার দেয়ালের প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যতই কাল ঘনিয়ে আসিতে লাগিল, উদিত প্রতাপ–এর মৃত্যু ভয় ততই বাড়িতে লাগিল। মস্তিষ্কের সাধারণ জ্ঞান ধীরে ধীরে লোপ পাইতে লাগিল। উদিতপ্রতাপের মনে হইতে লাগিল এই বুঝি সর্পের

প্রবেশ ঘটিল। সে মৃত্যু ভয়ে উদভ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং ঢক ঢক করিয়া কণ্ঠে পেয়ালা দুয়েক সুরা ঢালিয়া লইল। চরম সময় আসিতে আর কিঞ্চিৎ বাকি। নেশার ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে সে ঘরের ছয়টি তল নিখুঁত ভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার চোখে পড়িল দেয়ালে একটি চিড় ধরা হালকা ফাটল। যেটি একটি সর্পের ন্যায় বক্র রেখায় লম্বা হইয়াছে যে রেখার একটি প্রান্ত ফণা বিশিষ্ট সর্পের মাথার ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। যেইমাত্র উদিতপ্রতাপের ফাটলটিকে সর্প বলিয়া মনে হইলো, তৎক্ষণাৎ সে ফাটলটিকে বিষধর সর্পই দেখিতে লাগিল। শুধুমাত্র দেখিতে লাগিল এমন নয়, তাহার মনে হইতে লাগিল–সর্পটি যেন তাহার পানে হিল হিল করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। উদিত প্রতাপ ভয়ে উন্মত্ত হইয়া গৃহমধ্যে এদিক ওদিক করিতে লাগিল। সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলো সর্পের ফণাটি যেন তাহারই মুখমণ্ডল। লক লকে জিভ বাহির করিয়া তাহার পানে ধাইয়া আসিতেছে এবং নিজ ভয়কে মনে হইতে লাগিল অসহায় নারী যেন তাহার নিকট সম্মান এবং প্রাণ ভিক্ষা করিতেছে।

এমতবস্থায় জনার্দনপ্রতাপের পরিবার রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে উত্তেজনায়, আতঙ্কে দুইটা তেত্রিশ মিনিটের অপেক্ষায় ছটফট করিতে লাগিলেন। কক্ষ মধ্যে উদিতের প্রলাপ হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। ততক্ষণে দুইটা বাজিয়া বত্রিশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সকলে চিৎকার করিয়া কহিলেন, উদিত দ্বার খোল! কক্ষ মধ্য হইতে কোনো সাড়া মিলিল না। সবাই উচ্চ স্বরে ডাকিয়া উদিতপ্রতাপকে দ্বার খুলিতে বলিল, তাহাতেও সাড়া মিলিল না। জনার্দনপ্রতাপ সিংহ দ্বার ভাঙ্গিতে হুকুম করিলেন। দ্বার ভাঙ্গিবার পর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া গেলো, উদিতপ্রতাপ মেঝেতে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। চোখ দুইটি উন্মিলিত যেন ভীষণ ভয় পাইয়াছে এবং দুই ঠোঁটের মিলিত স্থান হইতে রক্ত মিশ্রিত লালা বাহির হইয়া আসিতেছে।

গৃহ মধ্যে উচ্চ স্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন উদিতের মা, স্ত্রী ও অন্য সকলে। পাহারারত পালোয়ানরা কক্ষ এবং তাহার চারিপাশ সর্পের অস্তিত্ব খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। জনার্দনপ্রতাপ অনেক আগেই গৃহ চিকিৎসককে গৃহে আসার জন্য খবর পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া উদিতপ্রতাপের নাড়ি নিরীক্ষণ করিয়া, উন্মিলিত নয়ন যুগল বাম হস্ত দিয়া বন্ধ করিয়া কহিলেন, সম্ভবত প্রচণ্ড ভয় পাইয়া উহার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, ময়না তদন্তের পর তাহা পরিষ্কার হইবে। ❑

শৈশব (পর্ব – ১)

শিউলি

'ও রসূল ভাই ভালো গুড় হবে'?
হবে, সাড়ে ছয় টাকা কেজি পড়বে বলো।

রসুল মোল্লা মূলত ইটভাটার শ্রমিক, কিন্তু পরিচিতি শিউলি বলে। নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে যায় খেজুর গাছ ঝুড়ে গাছের মাথা পরিষ্কার করা। হাতে দুই আড়াইশো গাছ তো আছেই। রসুল ও তার ভাই কামাল ইটভাটার কাজ ছেড়ে খেজুর গাছ পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়ে যায়। চলে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। কাজটি দেখতে অনেক সোজা, আদতে এটি অনেক কষ্টের কাজ। যেমন আমরা যখন ডাব কিনি তখন ডাবওয়ালা দা দিয়ে খুব সহজে ক্যাচ ক্যাচ করে ডাবের মুখ ছাড়িয়ে দেয়, এই সহজে ডাবের মুখ ছাড়াবার জন্য দাটাকে দুই ঘন্টা ধরে শান দিতে হয়, আমরা সেই খবর রাখি না। ঠিক তেমনি শীতকালে আমরা রস ও পাটালি পয়সার বিনিময়ে তৃপ্তি করে খাই। এই গুড় রস কত কঠিন পরিশ্রমের পর আমাদের কাছে আসে আমরা তার খোঁজ রাখি না। এই কাজ জন্মলগ্ন থেকেই ম্যানুয়ালি হয়, কোনো মেশিনে তৈরি হয় না। এই কাজকে নিয়ে শিউলি সমাজে একটা প্রবাদ আছে— নানা গাছ কাটে, নানী পানি পানা দেখে। নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই চার মাস ধরে চলে হাড় ভাঙা খাটুনি, তবে গরিব মানুষ অতিরিক্ত দুটো পয়সার মুখ দেখে। বছর পনেরো আগে খেজুর গাছ ঝুড়তে গিয়ে রসুলের বাম চোখে খেজুর পাতার কাঁটার খোঁচা লাগে। গ্রামের মানুষ তো ভালোভাবে চিকিৎসা করাতে পারেনি। ফলে চোখটি কানা হয়ে যায়। বর্তমানে রসুলকে সামনে রসুল ভাই বললেও পিছনে কানা শিউলি বলেই ডাকে। এই ডাক নিয়ে একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল— রসুল গাছে উঠেছে রস পাড়তে, সেদিন রসের পরিমাণ কম হওয়ায় রসুলের মেজাজটা বিগড়ে ছিল। এরই মধ্যে গাছ তলায় এক কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক এসে রসুলকে চেঁচিয়ে বললো, কানা শিউলি এক ভাঁড় রস দিবি? এই কথা শুনে রসুলের মেজাজ গেল আরো বিগড়ে, সে গাছ থেকে চিৎকার করে বললো, যে কথা কয়েছো তাতে রস কেন গুড় দেবানি। লোকটি নিজের ভুল বুঝে কাল বিলম্ব না করে স্থান ত্যাগ করলো।

বসিরহাটের সন্নিকটে ধলচিতের মোল্লা পাড়া গ্রাম। চার পাঁচশো পরিবারের

বাস। আশি শতাংশ পরিবারই মুসলিম। বাকি হিন্দু, এক ঘর কেবল ব্রাহ্মণ। ফলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ পরিবারকে ঠাকুর বাড়ি বলেই সম্বোধন করে। ওই পরিবারে ছোট দুই ভাই ফটিক আর দেবু। যদিও ওই নামে তাদের কেউ ডাকে না। গ্রামের লোক বড়ো ঠাকুর আর ছোট ঠাকুর বলেই ডাকে। গ্রামের মানুষজন ভালো কিন্তু শিক্ষা কালচারের খুব অভাব। অল্প বয়েস থেকে সব রুজি রোজগারে বেরিয়ে পড়ে, কেউ ইট ভাটায়, কেউ চাষের কাজে, কেউবা গরুর গাড়ি, ভ্যান চালাতে। নব্বই শতাংশ পরিবারই গরিব। ফটিক ওরফে বড় ঠাকুরদের পরিবার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবার। সবই ঠিক আছে, তবে ফটিককে নিয়ে ঠাকুর পরিবার খুব সমস্যায় আছে। বছর আটেক-এর ওইটুকু ছেলে, স্কুলে যাবে না, পড়াশোনা করবে না, সারাদিন লোকের আগানে বাগানে টো টো করে ঘুরে বেড়াবে। এর গাছের আম ওর গাছের জাম, কারো গাছের খেজুর পেড়ে খাবে। ছাড়া গরুর মতো সারাদিন চরে বেড়াবে সন্ধে হলে গোয়ালে ফেরার মতো ঘরে ফিরবে। বকে, মেরেধরে কোনো কিছুতেই কোনো ফল হয় না। সম্ভবত জন্মস্থানের প্রভাব ওর ভিতর প্রকট হয়ে উঠেছে।

রসুল মোল্লা কাঠের পাটাতন ফেলে তাতে সাদা বালি দিয়ে গাছ ঝোড়া বড়ো বড়ো দাগুলো ধার দিচ্ছে। ফটিক একপা দুইপা করে আস্তে আস্তে তার পাশে এসে দাঁড়ালো। রসুল মোল্লা মেজাজি মানুষ, কথা কম বলে। তা বললে তো আর ফটিকের চলবে না, ভাব জমাতে হবেই, নইলে খেজুরের কচি মুচি খাবে কি করে। সুতরাং ফটিক খেজুরে আলাপ শুরু করল। কাকা তোমার দা-গুলো না যাত্রা পালার তরোয়ালের মতো, শত্রুর গলায় বসবে আর কচ করে গলাটা মাটিতে পড়ে যাবে। রসুল কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের কাজ করে চলেছে। ফটিক ভাব ভালো না দেখেও আবার বললো, কাকা, বড়ো পুকুরের বাগানে যে খেজুর গাছগুলো আছে, যেমন তার ঝাঁকড়া পাতা আবার বেশির ভাগ পাতার গোড়ায় মুচি থাকে, তাই না? রসুল মোল্লা ফটিকের উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেলে। তাছাড়া সে ফটিকের চরিত্র জানে। সে রেগে গিয়ে বলে, দার কোপ শত্তুরের গলায় বসাতি হবে না, তোর পায়ে বসাবানে। তুই না ভদ্দর লোকের ছেলে! ইসকুলে যাবি নেখাপড়া করবি তা না আমাদের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস মুচি খাবি বলে। বড়ো লোকের ছেলে এত খাস তাতেও হয় না। তোর বাপ সামনের শনিবার কলকাতা থেকে ফিরুক সব বলে দেব। ফটিক দেখলো কাকার মেজাজ বিরাট গরম, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পাশে কলতলায়

খোদে কাকী একটা তলা কালো হাঁড়ি মাজছিলো। খোদে কাকী ফটিককে ডেকে বললো ¯বড় ঠাকুর কাকার মেজাজ ভালো নেই, তুই এখন বাড়ি যা। ঘন্টা খানিক পরে আসিস, তখন আমি খেজুর পাতা আনতে যাবো বড়ো পুকুরের বাগানে। আমার সাথে গিয়ে মুচি খাস। ফটিকের কথাটা খুব মনে ধরলো, তারপর এক দৌড়ে অন্যত্র চলে গেল।

রসুল মোল্লা দায়ে শান দিয়ে উঠে লুঙ্গিটাকে ভালো করে কাছা দিয়ে পরে তার উপর আরো ভালো করে গামছা জড়াল যাতে লুঙ্গি না খুলে যায়। আলগা শরীরে পিঠে বাঁশের তৈরি টুঙ্গিটা ঝোলাল, তার মধ্যে ভরলো ব্লেডের মতো ধারী আর বর্শার ফলার মতো মাথা ছুঁচল দা তিন খানি। বেরোনোর সময় খোদে বিবিকে বললো, ঘন্টা খানেক পরে বড়ো পুকুরের বাগানে আসিস পাতা সরাতে হবে। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে রসুল মোল্লা বাগান মুখো রওনা হলো। বাগানে ঢুকে প্রথমে একটা ফুট কুড়ির খেজুর গাছের নিচে এসে দাঁড়ালো, তারপর আল্লাতালাকে স্মরণ করে এই মরসুমের প্রথম গাছটিতে উঠলো।

ফটিক ওরফে বড়ো ঠাকুরের আর তর সয়না। ঘড়ি তো নেই, এক মিনিটকে এক ঘন্টা হয়ে গেছে বলে মনে হতে লাগলো। মন পড়ে আছে বড়ো পুকুরের খেজুর বাগানে। কাহাতক আর এদিকে ওদিক ঘুরতে ভালো লাগে। ওদিকে যদি অন্য কেউ এসে মুচি নিয়ে চলে যায়। যেই মাত্র অন্যের মুচি নেয়ার কথা মাথায় এলো, অমনি খোদে কাকীর সাবধান বাণী মন থেকে উড়ে গেল। ফটিক ছুটলো বড়ো পুকুরের বাগানে। দূর থেকে আধা চুল কাটার মতো আধ ঝোড়া খেজুর গাছ দেখে তার তলায় গিয়ে হাজির হলো। গাছ তলায় গিয়ে ফটিক চমকে উঠলো। রসুল কাকা গাছ তলায় পড়ে থাকা কাঁটাওয়ালা তাজা খেজুর পাতা গুলোর উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বর্শার ফলার মতো একটা দা তার পাঁজরের নীচে এক পাশে পিঠের দিক থেকে ঢুকে বুকের দিকে থেকে বেরিয়ে গেছে। চাপা পড়া খেজুর পাতার ফাঁক দিয়ে রক্ত টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ছে। চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। ফটিক পাথরের মত দাঁড়িয়ে কয়েক সেকেন্ড দেখলো। সে কি করবে কিছুই বুঝতে পারলো না। ওইটুকু বাচ্চার পক্ষে একা কিছুই করা সম্ভব নয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে দৌড় লাগালো রসুল কাকার বাড়ির দিকে।

খোদে বিবি বাগানে যাবে বলে সবে মাত্র দরজায় শিকল লাগাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে ফটিক ছুটতে ছুটতে এসে খোদে বিবির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকলো। খোদে বিবি ফটিককে অমন করে হাঁপাতে দেখে অবাক হয়ে বলল— তুই ওরাম করতিছিস কেনো বড়ঠাকুর? ফটিক ততক্ষণে একটু দম

নিয়ে বললো, কাকা। কি কাকা, তোরে বকেছে?

মাথা নাড়িয়ে ফটিক বললোনা।

—তবে হাঁপাচ্ছিস কেন?

ফটিক আরো কয়েক বার দম নিয়ে বলে–রক্ত।

খোদে বিবি বাকিটা অনুমান করে, চিৎকার করে কেঁদে বলে উঠে, কেডা কোথায় আছ, শিঘগিরি এস গোলামের বাপ গাছ থেকে পড়ে গেছে। বলতে বলতে বড়ো পুকুরের বাগানের দিকে দৌড়ায়। খোদে বিবির চিৎকারে আশপাশের পুরুষ মানুষ যারা তখন বাড়িতে ছিল, সবাই ছুটলো খেজুর তলার দিকে।

খেজুর পাতার কাঁটার উপর থেকে যতটা সম্ভব সন্তর্পণে রসুল মোল্লাকে তুলে আনা হলো। জাকিরের তিন চাকার ভ্যান এনে তার উপর গোটা চারেক চটের বস্তা পেতে, রসুলকে আস্তে করে শুইয়ে দেয়া হলো। করিম ভাই সাবধানে পেটে ঢোকা দা টাকে বার করলো। এবার রসুল মোল্লাকে নিয়ে কয়েক জনে মিলে চললো বদরতলা হাসপাতালে। কিন্তু এত ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনের পেসেন্টের জন্য বদরতলা হসপিটাল উপযুক্ত নয়। ওখানে একটু প্রাথমিক চিকিৎসা করে সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ট্রান্সফার করে দিলো। তার আগে বসিরহাট থানায় হসপিটালের তরফ থেকে এফ আই আর করা হলো। পুলিশ এলো কেস হিস্ট্রি নিলো তারপর অ্যাম্বুলেন্স ছুটলো কলকাতা মেডিকেল কলেজের উদ্দেশ্যে। সপ্তা খানিক ধরে চললো পুলিশ ইনভেস্টিগেশন। এদিকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে চলেছে যমে মানুষে জীবন নিয়ে টানাটানি। অবশেষে মাস দুই মৃত্যুর সাথে লড়াই করে অপরাজেয় রসুল মোল্লা বাড়ি ফিরলো।

এদিকে গ্রামে তখন একজনই হিরো, ফটিক ওরফে বড়ো ঠাকুর। সেদিন যদি ফটিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে অতি তৎপরতার সাথে একসিডেন্টের খবরটা না দিত, তাহলে হয়তো রসুল মোল্লা আজ এই দিনটা দেখতে পেত না। রসুলও তা বিলক্ষণ বুঝেছে। ফটিকের বাবা একটা হরলিক্স নিয়ে রসুলকে দেখতে গেলে, রসুল বলে, দাদা, বড়ো ঠাকুরকে একটু পাঠিয়ে দেবেনখন, যার জন্নী আজ বেঁচে আছি, তারে দেখার জন্নী মনটা বড্ড আকুপাকু করতেছে। এদিকে ফটিকের মনটাও ব্যাকুল হয়ে আছে রসুল কাকাকে দেখার জন্য। যতই তাকে বকাবকি করুক না কেন, গাছ ঝোড়ার সময় খেজুরের মুচি পেলে বলে, ‘ও ঠাকুর এইনে একটা মুচি।

খোদে বিবি জীবনে এই প্রথম হরলিক্স গুলছে, ভাবখানা যেন সে রসুল মোল্লার দিদিমণি। হরলিক্স গুলতে গুলতে রসুলকে শাসনের সুরে বললো, দেখো গোলামের বাপ, বড় ঠাকুরের বাপ বলে গেছে হললিক্সটা নিয়ম করে খেতি হবে, তালি গায় জোর পাবা। রসুল মোল্লা বউয়ের কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিল, এরই মধ্যে দরজার সামনে ফটিক এসে দাঁড়ালো। রসুল মোল্লা ফটিককে দেখেই মনে একটা প্রশস্তি এনে বললো, আয় বাপ আয় তোরে একটু ছুঁয়ে ধন্যি হই, তুই আমার সাত জন্মের বাপ। কথাগুলো বলতে বলতে রসুল মোল্লা ফটিককে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো। আবেগপ্রবণ হয়ে যে এই ভাবে কাঁদতে পারে ওই বদরাগি মানুষটা তা তার স্ত্রী খোদে বিবি কোনো দিন ভাবতেই পারেনি।

শিশু মনে, অপোক্ত চিন্তাশক্তি দিয়ে একটা কথাই ফটিকের মনে উথাল পাথাল করতে থাকলো— কি কারণে রাগি রসুল কাকা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। ❑

শৈশব (পর্ব – ২)

পাতাল পুরী

ফটিক জল কুমির খেলবি নে—আজ তিন চার দিন হল ফটিক বাড়ি থেকে বার হয় না। বন্ধু বান্ধব সব চিন্তায় পড়ে গেছে। পেঁচো, স্বপন দীপক, সেকেনালি, খোকা রোজ বড়ো পুকুরে আসে জল কুমির খেলতে। ফটিকের দেখা নেই, সবাই মিলে ঠিক করলো সোমবার সকালে ফটিকের বাবা কলকাতায় চলে গেলে ফটিকদের বাড়ি যাবে।

ফটিকের দিদিমা এসেছেন, উনি যখনই আসেন মাস তিনেক থেকে যান। তাতে এমনিতে কারোর কোনো সমস্যা নেই। অসুবিধা হয় শুধু ফটিকের। উনি যখনই আসেন অনেক নতুনত্ব শহুরে খাবার দাবার নিয়ে আসেন, ফলে প্রথমটা ভালোই কাটে, তারপর শুরু হয় শাসন পর্ব। সকালে ঘুম ভাঙা থেকে শুরু করে রাতে শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সমস্ত কাজ কর্ম নির্ধারিত সময় মেনে করতে হয়। সব থেকে অসুবিধাজনক নির্দেশ হলো চব্বিশ ঘন্টায় মাত্র দুই ঘন্টা খেলতে দেওয়া হয়। কিন্তু এবার দিদিমা আসায় ফটিকের রুটিনটা কেমন যেন উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করলো। দিদিমাকে শাসন সংক্রান্ত কোনো বিধি নিষেধ জারি করতে হয়নি। কারণ স্রেফ একটা ঠাকুরমার ঝুলির স্বচিত্র বই। যখন থেকে ফটিক বইটি হাতে পেয়েছে, তখন থেকে ফটিকের ধ্যান জ্ঞান ওই ঠাকুরমার ঝুলি। বিকালে খেলতে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। স্বচিত্র বইটি খুলে রঙিন রূপকথার চরিত্রগুলো দেখে ফটিক পড়ার থেকে বেশি কল্পনার জগতে চলে যায়। রাজপুত্র, কোটাল পুত্র, ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাজ কন্যা, জিওন কাঠি, মরণ কাঠি, এই সব চরিত্রগুলো পড়ে ফটিক যেন তাদের মধ্যে একজন হয়ে পড়ে।

সোমবার স্কুলে গিয়ে ফটিকের সাথে সবার দেখা হলো। সবাই জানতে চাইলো সে কেন কদিন খেলতে আসছে না? ফটিক পরিস্কার করে কিছু বললো না, একটা সব জান্তা মধুসূদনের মতো ভাব দেখিয়ে পাশ কাটালো। বন্ধুরা একটু অবাক হলো। ভূগোল মাস্টার ক্লাসে এসে যানবাহন চ্যাপ্টার পড়াতে গিয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে প্রশ্ন করলেন, বলতো উড়োজাহাজ আবিস্কার হয়েছিল রূপকথার কোন বাহনের কথা ভেবে? সবাই চুপ, প্রত্যেকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। এরই মধ্যে ফটিক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, পক্ষীরাজ ঘোড়া মাস্টার মশাই। ভূগোল

মাস্টার চোখটি বড়ো বড়ো করে আধা খুশি হয়ে ফটিককে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কেন তোমার এমন মনে হলো? ফটিক বিজ্ঞের মতো ব্যাখ্যা করলো— মাস্টার মশাই, পক্ষীরাজের দুটো ডানা, উড়োজাহাজেরও দুটো ডানা, পক্ষীরাজের পা উড়োজাহাজের চাকা, পক্ষীরাজ ওড়ার সময় একটু ছুটে তারপর ডানা ঝাপটে উপরে উঠে, আবার নামার সময় মাটিতে পা ফেলে একটু ছুটে তারপর দাঁড়ায়, উড়োজাহাজও প্রথমে কিছুটা ছুটে তারপর সামনের চাকা তুলে উড়ে যায়, আবার নামার সময় পেছনের চাকা আগে ফেলে কিছুটা ছুটে তারপর দাঁড়ায়। ফটিক যখন তার কল্পনা শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করছে, তখন ভূগোল মাস্টার পায়ে পায়ে ফটিকের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। অন্য ছাত্ররা ভয় পেয়ে গেল, ফিস ফিস করে পরস্পরকে বললো, পাকামো বেরিয়ে যাবে, এবার উত্তম মধ্যম খাবে। ভূগোল মাস্টার ফটিকের কাছে গিয়ে দুই চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এ ব্যাখ্যা তুমি কার কাছে শুনেছ? কারুর কাছে না, আমার মনে হলো মাস্টার মশাই। ভূগোল মাস্টার ফটিককে জড়িয়ে ধরে বললেন, মন দিয়ে পড়াশোনা করো বাবা, ইচ্ছে থাকলে জীবনে অনেক বড়ো হতে পারবে। অন্য ছাত্ররা তো অবাক, বিচ্ছু ফটিকের পেটে এত বিদ্যে! ছুটির পর বন্ধুরা ফটিককে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে থাকলো, বাড়ি আসার সময় সবাই চাইছিল ওর পাশে দাঁড়িয়ে হাঁটতে।

নাম বড়ো পুকুর, অনেকটা সেই নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না অবস্থা। ফ্লাট কড়াই-এর মত আকৃতি, বিরাট পুকুর, মাঝখানে জল বড়জোর এক মানুষ। শীতের পর থেকে জল শুকাতে থাকে। বৈশাখ মাসের দিকে জল একদম কমে যায় এবং প্রচণ্ড রৌদ্র তাপে জল গরম হয়ে যায়। সমস্যা হয় মাছের, সেই জন্য জেলেরা পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা লম্বা বাঁশ পুঁতে তাকে কেন্দ্র করে একটা বিরাট বৃত্তাকারে ফুট খানিক লম্বা কচুরিপানার দাম বেঁধে রেখেছে। যাতে মাছগুলো কচুরিপানার তলায় গিয়ে তুলনামূলক ঠান্ডা জল পায়। যদিও সেখানে মাছ ছাড়া অন্য প্রাণিও থাকে। পুকুরে একটা বিরাট শান বাঁধানো ঘাট আছে, যার সিঁড়ি পুকুরের প্রায় মাঝখান অবধি বিস্তৃত। এই পুকুরে চলে ফটিকদের জল কুমির খেলা।

আজ সব বন্ধুরা বড়ো পুকুরে হাজির। ফটিক, স্বপন, দীপক, সেকেনালি, পচা, আক্তার, পেঁচো সবাই। জল কুমির খেলা আজ জমবে ভালই। এই খেলায় ফটিকের একটু সমস্যা হয়, কারণ ফটিকের গাঁট্টা গোট্টা চেহারা হওয়ায় ও অল্প সাঁতারে হাঁপিয়ে উঠে ধরা পড়ে এবং ওকেই কুমির সাজতে হয়। যাইহোক টস

করে দীপক কুমির হলো। শানের ঘাটে টপাটপ সবাই প্যান্ট খুলেই জলে ঝাঁপ দিলো। শেষে দীপক যখন ঝাঁপ দিলো, একেবারে ফটিকের কাছাকাছি গিয়ে পড়লো। ফটিক ধরা পড়ার ভয়ে ডুব সাঁতার দিয়ে অনেকটা দূরে সরে যেতে চাইলো। কিছুটা সাঁতার কাটতেই ওর মাথায় ঠক করে কোনো শক্ত বস্তুতে ধাক্কা লাগলো। দমও শেষ, মাথা তুলতেই সে বুঝতে পারলো, পুকুরের মাঝখানে পোতা বাঁশে ধাক্কা খেয়েছে, এবং কচুরিপানার দামের ঠিক মাঝ তলায় এসে পড়েছে। কচ্ছপ যেমন তার শক্ত কাঠামো থেকে মাথা বের করে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেয়, ঠিক তেমনি ফটিক বাঁশটি ধরে এক দেড় ফুট লম্বা কচুরিপানার ভিতর দিয়ে মাথাটা এমন ভাবে বার করলো যাতে ওর নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কোনো অসুবিধা না হয়, আর বাইরে কি ঘটছে সব কিছু বুঝতে পারে। এদিকে স্বপন, দীপক, পচা, ওরা সবাই জল কুমির খেলায় ব্যস্ত, ফটিক যে নেই প্রথম দিকে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। ফটিকও ঘাপটি মেরে কুচরিপানার ভিতর লুকিয়ে আছে। উলঙ্গ শরীরের একটা স্থলজীব দামের তলায় আসতেই, দামের তলার জলজীবেরা একটু ঘাবড়ে গেল। তারা সব ভয়ে স্থান ত্যাগ করার জন্য হুটোপাটি শুরু করে দিলো, যেটা ফটিক বুঝতে পারছিল। ওর গা ঘেঁষে কত মাছ পালালো। আবার একটা নরম লম্বা দড়ির মতো প্রাণি ওর বুক, কোমর, পা জড়িয়ে হাঁটু হয়ে নেমে গেল। ফটিক বুঝতে পারলো বস্তুটি কি, কিন্তু ভয় পেলো না, কারণ প্রাণীগুলোই তখন নিজেদের প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে। সব থেকে বড় কথা ও জানে জলে বাস করা প্রাণীগুলো নির্বিষ হয়। এদিকে ফটিকের বন্ধুরা সব ফটিকের অনুপস্থিতি ততক্ষণে টের পেয়ে গেল। এবার খোঁজ শুরু হলো। প্রথমে চিৎকার করে ডাকাডাকি, তারপর এদিক ওদিক খোঁজ। ফটিক ব্যাপারটাতে বেশ মজা পেলো, ভাবখানা দেখি না কি হয়। ওরা তাড়াতাড়ি প্যান্ট পরে নিল। প্যান্ট পরতে গিয়ে দেখল ফটিকের প্যান্ট পড়ে আছে। বন্ধুরা নিশ্চিত হলো যে ফটিক জলেই আছে। কিন্তু জলে তো এতক্ষণ ডুবে থাকতে পারবে না। সবাই মিলে পুকুরের চার দিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। শিশু মনের অপোক্ত বুদ্ধিতে নানা রকম মন্তব্য করতে থাকলো। কেউ বললো জলে ডুবে গেছে, আর একজন বললো নিশ্চই জলপরী হয়ে গেছে। ফটিক কচুরি পানার দামের ভিতর থেকে সব শুনতে পাচ্ছে। জলপরী হয়ে গেছে, এই কথাটি শুনে ফটিকের মাথায় একটা দুষ্টু ভাবনা এসে গেল। জল থেকে উঠে সে কি বলবে, জলে দাঁড়িয়ে তা ঠিক করে নিলো। এদিকে ফটিককে যখন কোনোভাবেই বন্ধুরা খুঁজে পেলো না, তখন তারা ঠিক করলো বড়দের

জানাবে, যদি পুকুরে জাল ফেলে খোঁজ পাওয়া যায়। ফটিক বুঝলো আত্মগোপন করে থাকা আর সমীচীন হবে না। এবার আত্মপ্রকাশ করতেই হবে। সেকেনালি বললো বাপরে বলি, আমাদের বড়ো জাল আছে, জাল ফেললিই ফটিক তাতে ধরা পড়বে। স্বপন, দীপক, অন্য সকলে তাতে সম্মতি জানালো। এরই মধ্যে পচা চিৎকার করে বলে উঠলো ওই তো ফটিক! সকলে বিস্ময়ে হতভাক, ফটিক জলের নীচে থেকে মাথা তুলে আস্তে আস্তে ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে, ও এতক্ষণ জলের তলায় ছিল কি করে? বন্ধুরা চরম উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফটিকের পুকুর থেকে ওঠার অপেক্ষায় থাকলো।

ফটিক পুকুর থেকে উঠে এমন ভাব দেখিয়ে বাংলা প্যান্টের দড়ি বাঁধতে লাগলো যেন আলেকজান্ডার বিশ্ব জয় করে এলো। পচা একটু তোতলা আছে, তুতলে বললো তুই এতক্ষণ জলের তলায় কি করছিলি? ফটিক কচুরিপানার দামের ভিতর দাঁড়িয়ে যে মহাকাব্যটি রচনা করেছিল, সেটি এবার পাঠ করতে লাগলো। ওকে ঘিরে রইলো কচিকাঁচা বন্ধুরা।

দীপক যেই আমার সামনে ঝাঁপ দিলো, আমি ধরা পড়ার ভয়ে ডুব সাঁতারে দূরে চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার মাথায় শক্ত মতো কি যেন ঠেকল, তাকিয়ে দেখি একটা দরজা। বাইরে থেকে শিকল তোলা। আমি একটু অবাক হলাম। ভাবলাম দেখি তো শিকলটা খুলে, শিকল খুলে আমি তো আরো অবাক! দেখলাম দরজা থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালে। ঠিক সেই সময় পড়ন্ত বেলার একটা হালকা বাতাস বইছিল। ফটিকের ভিজে শরীরে সেই বাতাস লেগে রোমকূপ থেকে ছোট ছোট লোমগুলো খাঁড়া হয়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। ফটিক এই শারীরিক অনুভূতিটা কাজে লাগিয়ে দিল। এখন গল্পটা করতেই দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। ঘটনা প্রবাহ দেখে বন্ধুদের মনে অল্প অল্প বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করলো। ওরা অবাক বিস্ময়ে বললো তারপর? ফটিক দেখলো বন্ধুরা বিশ্বাস করে ফেলেছে ও অতি উৎসাহে বলা শুরু করলো— আমারও জেদ চেপে গেল, ঠিক করলাম দেখবো এই সিঁড়ি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে। তারপর এক ধাপ দুই ধাপ করে শেষ ধাপে এসে দেখি আমি বিরাট এক পাতালপুরীতে চলে এসেছি। ওখানে সাজানো গোছানো বড়ো বড়ো সব ঘর। একটা ঘরে শুধু দামি পোশাকে ভর্তি। আর একটা ঘরে ঢুকলাম অস্ত্র শস্ত্র বাসন কোষণ ইত্যাদি। আর একটা দরজা খুলতেই হিস হিস শব্দ পেলাম, ভালো করে তাকিয়ে দেখি ঘর ভর্তি পাথরের বড়ো বড়ো ঝুড়ি, তাতে হীরে, মানিক, সোনার অলংকার আরো কতকিছু ভরা রয়েছে। আর মেঝেতে অনেক

গোখরো, কেউটে হিস হিস করে পাহারা দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সব দেখছি, কিন্তু কোনো লোকজন দেখতে পাচ্ছি না। একটু অবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছি, এমন সময় চোখে পড়লো একটা ছোট্ট কুঠুরি। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে আমি ভয়ে চমকে উঠলাম। দেখলাম কুঠুরির মধ্যে একটা সুসজ্জিত পালঙ্ক আছে, তার উপর ঘুমিয়ে আছে এক রাজকন্যা। গুটি গুটি পায়ে পালংকের পাশে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ যা ধরেছি তাই, রাজকন্যাই বটে, মাথার পাশে সোনা, রুপোর জিওন কাঠি মরণ কাঠি আছে। সোনার কাঠিটা নিয়ে যেই রাজকন্যার চোখে ঠেকালাম দেখি রাজকন্যা নড়ছে। ঠিক সেই সময় আমার মনে পড়লো প্যান্ট তো আমি শানের ঘাটে খুলে এসেছি। এখন উপায় রাজকন্যা তো জেগে উঠবে। রাজকন্যার মাথার কাছে একটা আলনা ছিল, এবং তাতে একটা গামছা ঝুলছে, ব্যাস সেটাই পরে নিলাম'। সেকেনালি বললো, তুই তো পুকুর থেকে ল্যাংটো হয়ে উঠলি। সবাই যুক্তির জলাঞ্জলি দিয়ে মন্ত্র মুগ্ধের মতো ফটিকের পাতাল পাঠ শুনছিল। সেকেনালি দিল তাল কেটে। সহায় হলো ফটিকের উপস্থিত বুদ্ধি। সে না ঘাবড়িয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বললো, রাজকন্যাকে রুপোর মরণ কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পড়িয়ে আলনাতে গামছা খুলে রেখে এসেছি। স্বপন সেকনালিকে এক তাড়া দিলো। ফটিকের পাতালপুরীর বর্ণনা শুনতে শুনতে সবারই মনে হচ্ছিল, তারা প্রত্যেকে যেন পাতালপুরীতে অবস্থান করছে। ফটিক আবার অঙ্গ ভঙ্গি করে পাতালপুরীর কাহিনী শুরু করলো। রাজকন্যা চোখ খুলে আস্তে আস্তে উঠে বসলো, তারপর আমাকে দেখে চমকে উঠল। অবাক হয়ে বলল, তুমি কে? রাজপুত্তুর তো নও। আমি বললাম, আমি ফটিক, পৃথিবী থেকে এসেছি। রাজকন্যা আরো অবাক হয়ে গেল। সেকেনালি ফটিকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, কেন তুই রাজকন্যার গামছা পরে দাঁড়িয়ে ছিলি তাই? ফটিক একটু ক্ষেপে যায় অনেক কষ্টে একটা গল্প খাঁড়া করছে ব্যাটা সেকেনালি মধ্যে পড়ে বাগড়া দিচ্ছে। স্বপন আবার সেকনালিকে তাড়া দিয়ে চুপ করতে বললো। ফটিক আবার শুরু করলো। আ হা হা হা একেই বলে রাজকন্যা, কি তার রূপ!! আবার সেকেনালি তাল কেটে বলে উঠলো কিরকম সুন্দর? আমাদের খেঁদি, পেঁচি, টেপি ওদের মতো? ফটিক এবার সেকনালিকে মুখ ভেংচি কেটে বললো, খেঁদি, পেঁচি টেপি এরা কি রাজকন্যা? দুগ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী যেমন দেখতে ওই রকম। বিশ্বাসের আকাশে ফটিক সিঁদুরে মেঘ দেখতে পেলো। ভাবলো আর বাড়ালে ধরা পড়ার ভয় আছে। দীপক সেকেনালিকে তাড়া দিয়ে চুপ করে শুনতে

বললো। ফটিক এবার সতর্ক হয়ে কল্পগল্পের যবনিকা টানতে বলা শুরু করলো– রাজকন্যা আমার কাহিনী শুনে খুব আফসোসের সুরে বললো আমি যদি আরো আগে যেতাম তো আরো কিছুক্ষণ গল্প গুজব করা যেত। কিন্তু তার আর উপায় নেই, কারণ রাক্ষুসী ডাইনি এসে পড়বে এবং তাকে জাগা অবস্থায় দেখলে বুঝতে পারবে পৃথিবীর উপর থেকে কেউ পাতালে এসেছে। আমি আর সময় নষ্ট না করে মরণ কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। অবশ্য ঘুম পাড়াবার আগে তাকে জানিয়ে দিয়েছি যে আমি আবার যাবো, এবং তাকে ডাইনি রাক্ষুসীর হাত থেকে উদ্ধার করে পাতাল থেকে পৃথিবীর উপর নিয়ে আসবো।

সন্ধে হয়ে যাওয়ায় সেদিনের মতো সবাই বাড়ি ফিরে গেল।ফটিক ভাবলো যাক বাবা একটা গল্প তো চালিয়ে দেওয়া গেল। ভাগ্যিস দিদিমার আনা ঠাকুরমার ঝুলি থেকে পাতালপুরীর রাজকন্যা গল্পটা পড়ে নিয়েছিলাম। এদিকে স্বপন, দীপক, পচা, আক্তাররা গল্পটাকে একেবারে সত্যিই ভেবে নিলো এবং এরা আলাদা ভাবে মনে মনে ঠিক করলো কাল সকালেই পুকুরে নেমে পাতাল পুরীতে যাবে, এবং ফটিকের আগেই রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে। সন্ধ্যা থেকেই ফটিকের হাঁচি শুরু হয়ে গেল। দিদিমা বললেন গাটা গরম গরম লাগছে খেয়ে শুয়ে পড়, জ্বর বেশি এসে গেলে খেতে পারবি না।

পরদিন সকালে দীপক, স্বপন, পচা, আক্তার পুকুরে গেল এবং জলে নামলো রাজকন্যার খোঁজে। পাতালপুরীরই খোঁজে নেই তার রাজকন্যা! শুধু শুধু মাথায় শানের ঘাটের ঠোকর খেয়ে রণে ভঙ্গ দিলো। মনে মনে ভাবল ফটিককে মিথ্যে বলার মজা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু পরদিন ফটিকের দেখা নেই। শোনা গেল সর্দি হওয়ার জন্য দিদিমা বাড়ি থেকে সারাদিন বার হতে দেয়নি। দীপকরাও ছাড়বার পাত্র নয়। পরদিনই চড়াও হয় ফটিকদের বাড়িতে। ফটিক ওদের সমস্ত কথা শুনে বিজ্ঞের মতো মুচকি হেসে বললো সবার দ্বারা যদি সব কিছু হতো তবে পৃথিবীটা এমন হতো না রে পাগলা। স্বপন ক্ষেপে গিয়ে বলল তার মানে? ফটিক বললো স্কুলে হেড মাস্টার কজন হয়—একজন, দেশে কজন রাজা হয়একজন। ঠিক তেমনি পাতালপুরীর অবিস্কর্তা কজন হবে– – একজন এবং সে হলো এই শর্মা। দীপক ক্ষেপে গিয়ে বলল মিথ্যা বলার জায়গা পাসনে না, ভেবেছিস আমরা কিছু বুঝি না, তুই যে সত্যি বলছিস তার প্রমাণ দিতে পারবি? ফটিক শান্ত মাথায় বিজ্ঞের মতো আবার বললো জলের নীচে অতোসময় ছিলাম এটাই একটা প্রমাণ। বেট লড় আর কি প্রমাণ চাস।

সকলে মিলে ফটিককে চেপে ধরলো। আক্তার বললো ঠিক আছে, আমি এক ছড়া ডয়রা কলা বেট লড়লাম। দীপক বললো পাঁচটা আম, স্বপন বললো লিচু, সেকেনালি বললো আনারস। বেটের উপাদান তো ঠিক হলো, কিন্তু পাতালপুরী থেকে আনবে কি তা কেউ ঠিক করতে পারছে না। পচা তুতলিয়ে বলে, রাজকন্যা। রাজকন্যা বলতে পারে, এটা ভেবে ফটিক কি বলবে ভেবে ফেলেছিল এবার বন্ধুদের বললো, দেখ রাজকন্যাকে আনা কোনো ব্যাপার না। কিন্তু একটা সমস্যা আছে, আমি পাতালপুরী থেকে রাজকন্যাকে নিয়ে আসলাম, তোরা দেখলি, তারপর আমাকে আম, জাম লিচু, আনারস দিলি এই পর্যন্ত ঠিক আছে। এবার বল তাকে রাখবি কোথায়? সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। ভাবলো ঠিকই তো এই বিষয় টাতো কেউ ভাবেনি। ফটিক এই সুযোগে বললো, শোন সবথেকে ভালো হবে আমি গিয়ে রত্ন ভান্ডার থেকে কয়েকটি রত্ন নিয়ে আসবো। সবাই রাজি হলো, বিকালে পুকুর ঘটে দেখা হবে।

ফটিকদের ঠাকুর ঘরে একটা লক্ষ্মীর ঝাঁপি আছে, তাতে ফটিকের মা বস্তু মতে কিছু পুরোনো আমলের পয়সা, কড়ি, পাথর ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি করে রেখেছেন। ফটিক এক ফাঁকে ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঝাঁপি থেকে পয়সা, পাথর, কড়ি মিলিয়ে এক মুঠো নিয়ে পকেটে ভরলো। তারপর চুপি চুপি দোতলা থেকে নেমে এসে খিড়কির দরজা খুলে পালাতে গিয়ে দেখল বন্ধু মহোদয়রা সব ভেট নিয়ে হাজির। ফটিক ফলগুলো নিয়ে নিচের একটা ঘরে লুকিয়ে রেখে সকলে মিলে পুকুরের দিকে চললো। যেতে যেতে ফটিক সবাইকে জানিয়ে দিল যে সে আজ প্যান্ট পরেই জলে নামবে, কারণ পকেটে ভরে মণি, মাণিক্য, হীরে, জহরত আনতে হবে তো। ওরা প্রায় পুকুরের কাছে এসে পড়েছে। ফটিক যেন আবার যুদ্ধ জয়ে যাচ্ছে, এমন ভাব করতে থাকলো। বিরাট যোদ্ধার মতো বুক ফুলিয়ে বললো, তবে রাজকন্যাকে আমি উদ্ধার কোরে—। ফটিক শানের ঘাটে এসে পুকুরের মাঝখানে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল। ওর মুখ থেকে কোনো কথা বার হচ্ছে না। অস্ফুটে শুধু বললো, কচুরিপানার দামটা?

পচা তুতলিয়ে বললো, 'আজ সকালে জেলেরা এসে কচুরিপানার দাম পরিষ্কার করে সব মাছ ধরে নিয়ে গেছে।' ❑

শৈশব পর্ব – ৩

বিসর্জন

এই খোকা মাটির তালটা আমার কাছে এনে দে দিকিনি— কাশতে কাশতে সত্তরোর্ধ বৃদ্ধ পরেশ পাল ফটিককে ঠাকুর গড়ার কাজ করতে করতে ছোট ছোট হুকুম করে। ফটিকও খুশি মনে সেই হুকুম তামিল করে।

রথের দিন থেকে মা দুর্গার মূর্তি তৈরির কাঠামো বাঁধার কাজ শুরু হয়। অগাস্ট মাস থেকে ফটিককে আর এলাকায় দেখা যায় না। খেলার সময় ফটিককে পেতে হলে যেতে হবে বদরতলা হসপিটালের উল্টো দিকে পোটো পাড়ায়, পরেশ পালের স্টুডিওতে। স্টুডিওর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা উদাস হয়ে মূর্তি তৈরি দেখে। বাঁশের বাখারী বাঁধা থেকে মূর্তিতে রংয়ের প্রলেপ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ ফটিকের মুখস্থ। ফটিক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে মূর্তিগুলোর দিকে। চার ফুট হাইটের ফটিক, আর পাঁচ ফুট হাইটের পরেশ কাকা যেন গালিভারের দেশে লিলিপুট। পরেশ পালের স্টুডিওতে বসিরহাটের বড়ো বড়ো পুজো কমিটির মূর্তি তৈরি হয়। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং সিংহের পিঠে মা দুর্গার মুখ কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে গেলে ফটিকের ঘাড় ব্যথা হয়, তবুও পূর্ণ অবয়ব মনুষ্যরূপী ঈশ্বর সৃষ্টি, ফটিক অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। পরেশ কাকা ছয় সাত ফুটের এক একটা মূর্তি তৈরি করছে, যেন তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর।

নদীতে লোক পারাপার করে মহম্মদ আর তার ছেলে আনসার। সেই কাজের ফাঁকে বাপ বেটাতে ইছামতী নদীর পলি মাটি তুলে যোগান দেয় পরেশ পালের স্টুডিওতে। আনসার ফটিকদের গ্রামের ছেলে, ওরই হাত ধরে ফটিকের এই মূর্তি তৈরি দেখতে আসা। আনসার প্রতিদিনই খানিকটা করে মাটি আনে। আনসারের সাথে পরেশ পালের খুব দোস্তি। আনসারও পরেশ পালের অনেক ফাই ফরমাস বিনি পয়সায় খেটে দেয়। এই ফাই ফরমাস খাটতে গিয়ে একদিন হলো এক বিপত্তি— পরেশ পালের ছেলের ধুম জ্বর, এদিকে বাঁশের কাঠামোয় বিচুলির বাঁধন প্রস্তুত। আজ বিচুলির উপর তুষের মিশ্রণে মাটির প্রলেপ দেয়ার কথা। কিন্তু তুষ মাটির মণ্ড তৈরি হয়নি, এখন উপায়? আনসার বললো, কাকা, আব্বা আজ নৌকো বের করবে না, আমারও কাজ নেই, আমি মাটি চটকে দেব? পরেশ পালেরও অসহায় অবস্থা, একটু ইতস্তত করে বললো, তাই

দে। বছর কুড়ির আনসারের গায়েও অসুরের মতো শক্তি। খানিকটা করে তুষ আর মাটি রাস্তার উপর ফেলে, খড়ের তৈরি ভোতা অসুরের দিকে তাকিয়ে বলল দেখি বাপ অসুর কার গায়ে জোর বেশি।

মাংসল কালো দুটো পা দিয়ে মাটি চটকাতে চটকাতে ছড়া কাটতে থাকলো—

আয় রে অসুর দেখে যা—
কার বেশি জোর মেপে যা,
লোড়বি যখন দুগ্গা মায়ের সঙ্গে—
বুঝবি তখন কত শক্তি অঙ্গে।

পোটো পাড়ায় থাকে খগেন ঘোষ, তার নজরে পড়ে গেলো ব্যাপারটা, মুসলমানের ছেলে আনসার দুর্গা প্রতিমা তৈরির মাটি পা দিয়ে চটকাচ্ছে। ছিদ্রান্বেসি মনোভাবাপন্ন খগেন ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে এলাকার কয়েক জন মাতব্বরকে নিয়ে পরেশ পালের স্টুডিওতে হাজির হলো। আনসার কিছু বোঝার আগেই খগেন ওর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে চটকানো মাটির তাল থেকে সরিয়ে দিল। তারপর চিৎকার চেঁচামেচি করে আরো লোক জড়ো করতে লাগলো। বৃদ্ধ পরেশ পাল কোলাহল শুনে স্টুডিওর বাইরে বেরিয়ে এসে সব কিছু দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না, মুরুব্বিদের আসার হেতু কি। তিনি মাথা নিচু করে, হাত জোড় করে ছেলের অসুখের কথা বলে ক্ষমা চাইলেন। খগেন তো মানতেই চায় না, যেন ধর্মীয় বিধি নিষেধের অগ্রদূত সে নিজেই। বৃদ্ধ পরেশ পাল মুরুব্বিদের বললেন আমি বুড়ো মানুষ বুঝতে পারিনি, ও তো মাটি এনে দেয় তাই— ঠিক আছে আপনারা বলুন এখন কি করণীয়। যা বলবেন আমি মাথা পেতে মেনে নেব। এলাকাতে পরেশ পালের নির্লোভ, নিরীহ, গোবেচারা বলে একটা সুনাম আছে। সেই সুনামের উপর নির্ভর করে মাতব্বররা আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত নিলো— ওই মাটি প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এবং আর কখনো তিনি যেন এমন কাজ না করেন। কারণ মাটি আনা আর পা দিয়ে মাটি চটকানো এক কাজ নয়।

ছোট্ট ফটিক হা করে সব কিছু দেখছিল, কিন্তু বুঝে উঠতে পারেনি ব্যাপারটা কি ঘটলো। লোকজন ফাঁকা হলে পরেশ কাকা বললো, আনসার মাটিটা ফেলে দিয়ে হাত পা ধুয়ে নে। ফটিক গুটি গুটি পায়ে আনসারের পাশে এসে দাঁড়ালো। আনসারের চোখের কোণায় চিক চিক করছে জলকণা। হঠাৎ বৃষ্টি নামলো, ঝমঝমিয়ে মুসল ধারে। আনসার একটা খুঁটি ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকলো

বৃষ্টির মধ্যে। ফটিক এক ছুটে স্টুডিওর ভিতরে ঢুকে অনসারকে ডাকলো, আনসার কোনো উত্তর দিলো না নড়লোও না। পরেশ কাকা বললো, ওরে ডাকিস নে, মা দুগ্গার চোখের জলে ওর মুসলমান কালিমাটা ধুয়ে যাক।

আজ বেশ রৌদ্র করোজ্জ্বল দিন। আনসারের মনের মেঘ কেটে নতুন ভাবে সূর্য উঠেছে। ফটিককে ডেকে আনসার বললো, আজ যেন সে মসজিদে আসে, রহমত চাচা নামাজের পর সবাইকে জিলাপি দেবে। ফটিক আনন্দের সাথে যাওয়ার সম্মতি জানালো, কারণ রহমত চাচা গ্রামের উচ্চবিত্ত গণ্যমান্য ধার্মিক মানুষ। প্রতি শুক্রবার নামাজের পর মসজিদের সকলকে একটা করে বড় বড় খাস্তা গরম বাতাসা নিজে হাতে দেন। উনি একটু মুচকি হেসে ফটিককে দুটি করে বাতাসা দেন। সবাইকে একটা করে, ফটিকের বেলাতে কেন দুটো, ফটিক তার রহস্য সমাধান করেনি, সে দুটি পায় তাতেই খুব খুশি। মাসে একদিন জিলাপি দেন তাও আবার দুটো, যাবে তো বটেই। পাড়ার কেষ্ট অধিকারী ফটিকের মসজিদে গিয়ে বাতাসা খাওয়ার ঘটনাটা ফটিকের বাবার কাছে নালিশ করে। কিন্তু ফটিকের বাবা এই ব্যাপারে ফটিককে কখনো কিছু বলেননি। কেষ্ট অধিকারী ফটিককে একদিন রাস্তায় ধরলো। ফটিক তখন বড় বড় গরম বাতাসা খেতে খেতে মসজিদ থেকে বাড়ির দিকে আসছে। ফটিককে মৃদু ভর্ৎসনা করে বলে তুই যে বাতাসা খাচ্ছিস, জানিস ওটা মুসলমানের দেওয়া! ফটিক একটু অবাক হয়ে বলল, কেনে রহমত চাচা যে হারু ময়রার দোকান থেকে জিলিপি বাতাসা কেন, আমি নিজে দেকিচি। এই বলে ফটিক দে ছুট।

পরেশ পালের স্টুডিওতে চার সন্তান নিয়ে মা দুর্গা অর্ধ প্রস্তুত। পরেশ কাকা মালসাতে মাটি গুলে ব্রাশ দিয়ে গোলা মাটি নাদুস নুদুস সাত ফুটি গণেশের গায়ে বুলাচ্ছে, যাতে মূর্তির গায়ে চিড় খাওয়া দাগগুলো মিলিয়ে যায়। ফটিক স্টুডিওর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পরেশ কাকার হাতের নিপুণ শিল্প কর্ম দেখছে। ঠিক সেই সময় পরেশ কাকার ছেলে একটা ডাব এনে বাবাকে খেতে দিলো। পরেশ কাকা গণেশের পায়ের কাছে বসে ডাব খাচ্ছিল। কিছুটা খেয়েই মুখ থেকে ডাব সরিয়ে নিয়ে গণেশের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি কিছু খেলেই তোর খেতে ইচ্ছে করে? নে খা তবে। এই বলে আধ খাওয়া ডাবটা গণেশের পায়ের কাছে রাখলো। ফটিক তো অবাক, পাগল নাকি মাটির গণেশ ডাব খাবে, তাও আবার চেয়ে! ফটিক ওখানে আর দাঁড়ালো না, বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। বন্ধু বান্ধবদের ঘটনাটা বলতে তারা তো বিশ্বাস করলোই না উল্টে ফটিককে পাগল বললো। শুধু আনসার ভাই শুনে চুপ করে ছিলো। ফটিকের

নিজে চোখে দেখা অথচ কেউ বিশ্বাস করলো না। ও একটু মন মরা হয়েই বাড়ি চলে এলো।

ফটিকের বাবা পেপার পড়ছেন, আর মা পাশে বসে সবজি কাটছেন। ফটিক মায়ের পাশে এসে চুপ করে বসে থাকলো। কিছু একটা ঘটেছে বুঝে মা বললো কি রে আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলি যে বড়! ফটিক মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে মা, তুমি যে ঠাকুরকে জল মিষ্টি দাও, সেটা তো কিছুক্ষণ পর আমরা খেয়ে নেই। কই ঠাকুর তো খায় না! মা হঠাৎ ফটিকের মুখে এমন একটা প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে বলল, ঠাকুর খাননা ঠিকই, তবে ঠাকুর ওই খাবারে দৃষ্টি দেন, তখন সেটা প্রসাদ হয়ে যায়। কিন্তু— ফটিক মাকে কথা বলতে না দিয়ে আবার প্রশ্ন করে— মা ঠাকুর তোমার কাছে কখনো খেতে চেয়েছে? মা আরো অবাক হয়ে বললেন, তা হলে তো আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত, কিন্তু তোর কি হলো বলতো?

ফটিকের বাবা ফটিকের বয়স ছাড়া প্রশ্নগুলো খেয়াল করছিলেন। এবার পরেশ কাকার স্টুডিওতে দেখা ঘটনাটা ফটিক সব বললো। ফটিকের বাবা পেপার থেকে মাথা তুলে বললেন—

ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানীর তাদাত্ম্য সম্বন্ধ। ফটিক বোকার মতো একবার বাবার, একবার মায়ের মুখের দিকে চায়। মা ফটিকের বাবার দিকে তাকিয়ে বলেন আমিই কিছু বুঝলাম না, তো ফটিক! একটু হেসে ফটিকের বাবা ঘটনাটার ব্যাখ্যা করলেন—

পরেশ পালের কাজ বলতে ওই মূর্তি তৈরি। খাওয়া ঘুম বাদে বাকি সময়টা প্রাণহীন ওই মূর্তিগুলোর সাথে থাকতে থাকতে, তার আর মূর্তিগুলোকে প্রাণহীন মনে হয় না। যেন একটা নিবিড় অবিচ্ছেদ্য আত্মিক সম্পর্কের বন্ধনে একাত্ম হয়ে গেছে। যে শক্তি গুনে ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব পাথরের বিগ্রহের সাথে আপন মনে কথা বলতেন। বিজ্ঞান কিন্তু এটাকে নস্যাৎ না করে, তাদের ভাষায় এটা কে বলছে টেলিপ্যাথি। হিন্দু শাস্ত্র বলছে ব্রহ্মাণ্ডে যিনি এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন, তিনি তো ব্রহ্মার সাথে বাক্যালাপ করতেই পারেন। যেটা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে উন্মাদের সমতুল্য। আরো সহজ করে ভাবা যায়— সদ্যোজাত শিশু তো শুধুই ঘুমায় আর ঘুম ভাঙলে কাঁদে, কিছু বলতেও পারে না, বোঝাতেও পারে না। প্রায় জড় বস্তুর ন্যায়। মা কিন্তু বোঝে সে কি বলতে চাইছে। এটা আত্মিক সম্পর্ক ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এখানে মূর্তিগুলোর মধ্যে আত্মা নেই ঠিকই, তবে পরেশ পালের সাথে একটা আত্মিক

সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। সে যখন গণেশের সামনে বসে ডাব খাচ্ছিল, তখন তার কর্তব্য, বিবেক একই সাথে জাগ্রত হয়ে উঠলো। এবং গণেশকে ডাবের ভাগ দিলো। যেটা সাধারণ দৃষ্টিতে হাস্যকর হয়ে উঠলো।

পুজোর আর মাস দেড়েক বাকি। বসিরহাট গোয়ালপোতার লাহা বাড়ি থেকে একচালার ঠাকুরের অর্ডার এলো। এতো অল্প সময়ে পরেশ পাল তো অর্ডার নিতে রাজি হয় না। তারাও অনেক অনুনয় বিনয় করে বললো, যিনি ঠাকুর দালানে রেখে ঠাকুর তৈরি করেন, তিনি হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। এখন পরেশ পাল অর্ডার না নিলে পুজোটাই বন্ধ হয়ে যাবে। পরেশ পালও ভেবে দেখলো, একশো বছরের বনেদি পুজোটা ঠাকুরের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। অসুবিধা হবে জেনে বুঝেও রাজি হয়ে গেল।

ফটিক আর আনসার অসম বয়সী হলেও বন্ধুত্ব অটুট। দুজনে গল্প করতে করতে পরেশ পালের স্টুডিওর দিকে আসছে—

আনসার তোদের উৎসবগুলোতে বেশ আনন্দ হয়,নতুন জামাকাপড় পরে মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে ঠাকুর দেখা, খাওয়া দাওয়া। আমাদের শুধু এর বাড়ি যাও ওর বাড়ি যাও, তোদের মতো আনন্দ নেই।

ফটিক— কিন্তু বাবা বলে হিন্দুরা মূর্তি নিয়ে আরাধনা করে, আর মুসলিমরা শূন্যে তাকিয়ে আরাধনা করে, ভক্তি দুটোতেই এক।

আনসার ঠিকই, তবে সব মিলিয়ে তোদের উৎসবে আনন্দ বেশি।

ফটিক আনসারের কথার উত্তর না দিয়ে বললো, ওই দেখো আনসার ভাই, পরেশ কাকা ঠাকুর গড়ছে না, দরজার পাশে বসে আছে!

আনসার— তাইতো, চলতো দেখি কি ব্যাপার!

সকাল থেকে মেঘলা আকাশ, সূর্যের তো দেখা নেইই বরং মাঝে মাঝে এমন কালো হয়ে আসছে যে, মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যা। পরেশ পালের স্টুডিওতে আলোর ব্যবস্থা না থাকায়, কাজের খুব অসুবিধা হতে থাকলো। ফলে পরেশ পাল দোরগোড়ায় বসে মায়ের উদ্দেশ্যে গুন গুন করে গান ধরলো—

মর্তে আসিস তুই মা যখন
কত আনন্দ করে,
এখানে তখন তোর সন্তানেরা
যুদ্ধ করেই মরে।
ভিন্ন জনে ভিন্ন রূপে
বিরাজিত মা তুই,

বোঝে না এরা এটাই সত্য
প্রভেদ নেই কিছুই।

আনসার, ফটিককে দেখে পরেশ পাল গান থামায়। কাজ না করে বসে থাকার কারণ জানতে চাইলে, পরেশ পাল কারণটা বলে। আরো বলে লাহা বাড়ির দুর্গা প্রতিমা অর্ডারের কথাটা। চিন্তিত মুখে বলে এত অল্প সময়ে কাজ তুলব কি করে ভাবছি। মনের অনাবিল উচ্ছ্বাসে আনসার বললো, জানো কাকা তোমার ওই এক চলার ঠাকুর আমিই তৈরি করে দিতে পারি। চক্ষু দান, শাড়ি পরানো এগুলো মনে হয় ঠিকঠাক পারবো না। কিন্তু উপায় নেই, খগেন ঘোষেদের আবার সহ্য হবে না। পরেশ পাল কি যেন একটা ভাবলো, তারপর লড়াকু সুরে আনসারকে বলল, পারবি, তুই পারবি? পরেশ পালের চোখ মুখ চকচক করে উঠলো।

আনসার যুদ্ধের সেনাপতির মতো বললো, পারবো, কিন্তু— ফটিকের দিকে আনসার করুণ ভাবে তাকালো। ফটিক ভাব বুঝে দুম করে বলে ফেললো– মা কালীর দিব্যি আমি কাউকে কিচ্ছু বলবো না। পরেশ পাল আনসারের কাঁধে দুবার বাহবার চাপড় মেরে বলে তুই পারবি, আমি জানি, তুই যে আমার একলব্য। ওই কোণের ঘরে বসে তুই মূর্তি গড়া শুরু কর। ওদিকটায় কেউ যায় না।

আজ পঞ্চমী, মা দুর্গা সেজেগুজে চার সন্তানকে নিয়ে মণ্ডপে গিয়ে উঠছেন। পোটো পাড়া যেন কৈলাস পর্বত হয়ে উঠেছে। মা হাতিতে আসবেন না ঘোড়া, দোলায়, নৌকায় আসবেন, সেটা না হয় পাঁজিতে থাক। পরেশ পালের স্টুডিও থেকে সাত আটটি দুর্গা পরিবার ভ্যান ও ডালাখোলা লরিকে বাহন করে মণ্ডপে মণ্ডপে পৌঁছাতে থাকলো। ফটিক এক কোণে দাঁড়িয়ে চুপ করে ভাবছে, লাহা বাড়ির লোকজন কখন আসবে! কাকা আবার আনসার ভাইকে স্টুডিওতে আসতে বারণ করেছে। ফটিককে দেখেও না দেখার ভান করছে। মনে হয় ভয় পাচ্ছে। লাহা বাড়ির প্রতিমা আনসার তৈরি করেছে, এটা যদি কোনো ভাবে পাঁচ কান হয়ে যায়। এর মধ্যে হৈ হৈ করতে করতে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে লাহা বাড়ির লোকজন চলে এলো। লাহা বাড়ির ঠাকুর যখন ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হচ্ছে তখন ফটিক দেখতে পেল, আনসার বাস রাস্তার উল্টো দিকে একটা বন্ধ দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আনসার–কে দেখতে পেয়েই ফটিক ছুটে চলে যায় তার কাছে। আনসার ভাবতেই পারছে না যে প্রতিমাটির সিংহভাগই ওর তৈরি। মা দুর্গা ওর হাতে ভর না করলে, এমন প্রতিমা তৈরি সম্ভব হতো না।

আনন্দে উচ্ছ্বাসে আনসারের মনটা টগবগ করে উঠলো। আবার সঙ্গে সঙ্গে মনের হালটাকে শক্ত করে ধরে নিজেকে সংযত করে নিলো।

সপ্তমীর দিন দুপুরের মধ্যে সেরার সন্মান ঘোষণা হয়ে গেল। সেরা প্যান্ডেল, সেরা পরিবেশ, সেরা আলোকসজ্জা এবং সেরা প্রতিমা। বিশেষ পুরস্কার সেরার সেরা প্রতিমা। এখানে প্রতিমা তৈরির নিপুণ শিল্প কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এবার লাহা বাড়ির এক চালার দুর্গা প্রতিমা সেরার সেরা সন্মান পেলো। লাহা বাড়ি উৎসবের উপর উৎসব লেগে গেলো। বাজি কম্পিটিশন, নরনারায়ণ সেবা, বিশেষ অতিথি আপ্যায়ন, বস্ত্রদান আরো কত কি।

খবরটা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত বসিরহাট অঞ্চলে। ফটিক বাবার কাছে খবরটা শুনেই ছুটলো আনসারদের বাড়িতে। আনসার খবরটা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো। আবার নিজেকে সংযত করে, ফটিককে সাবধান করলো যেন প্রকৃত শিল্পীর নাম পাঁচকান না হয়। ফটিক যে খুব সাবধানী তা বোঝাতে আস্তে আস্তে আনসারকে বলল, মা কালীর দিব্যি, আমি মাকেও বলিনি। ঠিক আছে চল, পরেশ কাকার ওখানে যাই। এই বলে ফটিককে নিয়ে আনসার পরেশ পালের স্টুডিওর দিকে পা বাড়ালো।

প্রতি বছর পরেশ পালের ঠাকুর প্রথম পুরস্কার পায়, এটা তার মন সওয়া হয়ে গেছে। নতুন করে কিছু মনে হয় না। কিন্তু এবারের সেরার সেরা সম্মানটা তার কাছে বড় বেদনা দায়ক হয়ে উঠলো। কারণ প্রকৃত প্রাপক থাকবে জন চক্ষুর অন্তরালে। প্রকৃত ঘটনাটা সে না পারছে হজম করতে, না পারছে উগরে দিতে। আনসার ও ফটিক স্টুডিওতে ঢুকতেই পরেশ পাল আনসার-কে জড়িয়ে ধরলো। আনসার আনন্দে কেঁদে ফেললো। আবেগঘন কণ্ঠে বললো, কাকা, আমার তৈরি ঠাকুর পুরস্কার পাবে এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আবেগে পরেশ পালেরও গলা ভারী হয়ে গেল, বললেন, আনসার তোর উপরে মা ভর করেছেন। না হলে কাঁচা হাতে এমন সৃষ্টি হলো কিভাবে! মা তোর সৃষ্টি দিয়ে মর্ত্যবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন-মা সবার, যে মাকে মন দিয়ে ডাকে মা তার। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবেতেই তিনি অধিষ্ঠান করেন।

ফটিক হঠাৎ ছুটে গেটের দিকে চলে গেল। একটু এদিক ওদিক চেয়ে ফিরে এসে বললো তার মনে হলো, কে যেন একটা উঁকি মারছিল। পরেশ পাল, আনসারও সতর্ক হয়ে গেল। এরই মধ্যে স্টুডিওর সামনে একটা রিক্সা এসে দাড়ালো। রিক্সা থেকে একটা ফুলের স্তবক হাতে নেমে স্টুডিওর দিকে আসছেন স্বয়ং বিজয় লাহা। উনি যখন স্টুডিওর ভিতরে আসছিলেন তখন কয়েকেজন

কৌতূহলী মানুষও তার সাথে ঢুকলো, যার মধ্যে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল খগেন ঘোষও আছে। লাহাবাবু ফুলের স্তবকটি পরেশ পালের হাতে দিয়ে বললেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ লাহা বাড়ির তরফ থেকে। নবমীর দিন সন্ধ্যায় আপনি আমাদের মণ্ডপে আসবেন। স্বয়ং চেয়ারম্যান সাহেব আপনাকে উত্তরীয়, শাল এবং কিছু অর্থ দিয়ে সংবর্ধনা দেবেন।

নবমীর সন্ধি পূজা চলছে। জনসমাগমে গমগম করছে লাহা বাড়ির ঠাকুর দালান। পাশে মঞ্চ তৈরি, সেখানে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বসে আছেন। মঞ্চের এক দিকে গরিব বৃদ্ধ বৃদ্ধারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বস্ত্র পাবার আশায়। গোটা দশেক ঢাকের আওয়াজে মুখরিত চারদিক। পরেশ পাল হাঁটু বার করে ধুতি আর একটা ফতুয়া পরে, পান চিবুতে চিবুতে গুটি গুটি পায়ে ঠাকুর দালানে গিয়ে উঠলেন। মাকে একটা প্রণাম করে মনে মনে বললেন, আমাকে ক্ষমা কর মা, আনসারের যোগ্য সম্মান থেকে আমি ওকে বঞ্চিত করলাম। এর পর এদিক ওদিক তাকিয়ে বিজয় লাহাকে ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে লাগলেন। ভিড়ের ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পরেশ পালকে ডেকে একটা চেয়ারে বসতে দিলেন। পরেশ পাল বসেই আছেন। এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন কিন্তু লাহাবাবুকে দেখতে পাচ্ছেন না। এক সময় উনি লাহাবাবুকে দেখতে পেলেন, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লাহাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। লাহাবাবু না দেখতে পাওয়ার ভান করে সরে গেলেন। পরেশ পাল ঘটনাটা স্বাভাবিকভাবে নিতে পারলেন না। যে মানুষটা একদিন আগে তার স্টুডিওতে গিয়ে ফুলের স্তবক দিয়ে নিমন্ত্রণ করে এলেন, একদিন পরে তিনি তাকে চিনতেই পারছেন না! বৃদ্ধ মনে মনে অশনিসংকেতের আভাস পেলেন। মনের অস্বস্তিটা যেন শরীর ধরে নিলো। তাঁর ওখানে একদম বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আবার ভদ্রতা বলে একটা ব্যাপার আছে। ভিড়ের ভিতর থেকে সেই ভদ্রলোক আবার এগিয়ে এলেন। হাতে একটা মিষ্টির প্যাকেট। পরেশ পাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোককে বললেন— আমার শরীরটা খুব খারাপ লাগছে, আমি বাড়ি চলে যাই। পরেশ পালের মুখে স্বেচ্ছায় বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা শুনে, মেঘ না চাইতে জল পাওয়ার মতো খুশি হয়ে তিনি বললেন, ঠিক আছে, সাবধানে যাবেন। মিষ্টির প্যাকেটটা হাতে দিয়ে বললেন একটা ভ্যান ডেকে দেব? লজ্জায় অপমানে পরেশ পালের শরীরটা তখন থর থর করে কাঁপছে। মিষ্টির প্যাকেটটা হাতে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন তার আর দরকার হবে না, আমি ঠিক চলে যাবো।

পরেশ পাল প্রথমে খেয়া ঘাটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর পার্শ্ববর্তী উদ্যানে ঢুকে একটা বেঞ্চে চোখ বন্ধ করে মিনিট পনেরো বসে থাকলেন। ইছামতী নদীর ফুরফুরে বাতাসে শরীরটা একটু হালকা হলো। মনটা হলো না। পরেশ পাল বেঞ্চ থেকে উঠে নদীর কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন। জলের দিকে তাকিয়ে বললেন মা, কাল এখানে তোর বিসর্জন হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সন্তানকে ক্ষমা করিস মা। আজ তোর মণ্ডপ থেকে পাওয়া প্রসাদ আমি বিসর্জন দিলাম। হাতের বড়ো মিষ্টির প্যাকেটটা জলে ভাসিয়ে দিয়ে পরেশ পাল উপরে উঠে এলেন।

আজ শুক্রবার, দশমী, বাঙালির মনে বিষাদের রেশ। মা কৈলাসে ফিরে যাবে। তার মধ্যে প্রতিটা হিন্দুদের ঘরে ঘরে আজ নারকেল নাড়ু, নিমকি, গজা তৈরির ধুম পড়ে যায়। ফটিকদের বাড়িতে যেন ভিয়েন বসে যায়। এই দিন পেটুক ফটিক সারাদিন বাড়িতেই থাকে। সন্ধ্যার পর বড়দের সাথে বসিরহাট উদ্যানে যায়। ওখান থেকে ইছামতী নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দেখে।

সেরার সেরা প্রতিমা যে একজন মুসলিম তৈরি করেছে, এই খবরটা সংক্রামক রোগের মত ছড়িয়ে পড়লো। কিছু মানুষ মৃদু সমালোচনা করা শুরু করলেন। কেউ বলছে পরেশ পালকে সাবধান করা সত্ত্বেও তার এই কাজ করা উচিত হয়নি। ফটিকের বাবার বক্তব্য, ছেলেটির নিপুণ শিল্পকর্মকে গুরুত্ব না দিয়ে জাতিভেদকে গুরুত্ব দেওয়া চরম নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ। খবরটা বাপ বেটা মহম্মদ ও আনসারের কানেও পৌঁছলো। দিনটা শুক্রবার হওয়ায় মসজিদে ইমাম ছিলেন। মহম্মদ অনসারকে নিয়ে ছুটল তার কাছে। ইমাম প্রথমে ধমক দিলেন কারণ ইসলাম ধর্ম এমন কাজকে মান্যতা দেয় না। অনেক বিবেচনা করে পরামর্শ দিলেন কয়েক দিন অন্যত্র ঘুরে আসতে।

একাদশীর ভোর, একটা কুস্বপ্নে পরেশ পালের ঘুম ভেঙে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিছানাতেই শুয়ে থাকলেন। এরই মধ্যে স্টুডিওর পার্শ্ববর্তী কয়েক জন হন্তদন্ত হয়ে এসে জানালো, গতকাল রাতের অন্ধকারে কারা যেন এসে পরেশ পালের স্টুডিও ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। বাড়ির অন্য সকলে রুদ্ধশ্বাসে স্টুডিওর দিকে ছুটলো। পরেশ পাল নির্লিপ্ত, যেন তাঁর অন্তর আত্মা আগেই তাকে জানান দিয়েছিল, শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও।

গাত্রোত্থান করে ফটিকের আজ প্রাতঃকর্ম সারা হয়নি। খবরটা শুনেই রুদ্ধশ্বাসে ছুটলো স্টুডিওর দিকে। দোচালা স্টুডিও ভেঙে চুরমার। অর্ধ নির্মিত লক্ষ্মী, কালীর ভাঙা ভাঙা মূর্তিগুলো এমন ভাবে পড়ে আছে যেন কুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধ সদ্য সমাপন হয়েছে। এ কোনো সুরাসুরে যুদ্ধ নয়। এ সধর্মের যুদ্ধ। স্টুডিওতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ভাঙা মূর্তিগুলো দেখে ফটিক চোখের জল ধরে রাখতে পারছিলো না। সে বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

ফটিক জানালার গরাদ ধরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ফটিকের মা ফটিকের মনের ব্যথাটা অনুভব করেন এবং ওর মনটাকে অন্য দিকে ঘোরাতে কাছে গিয়ে বলেন, কি রে বেলাতো অনেক হলো, টিফিন করবি না? ফটিক মার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলো, মা, বাবাতো বলে মা দুর্গা বিশ্বজননী, সার্বজনীন। এটা কি মিথ্যা মা? মা দুর্গা শুধুই কি আমাদের? ফটিকের মা ফটিককে বুকে টেনে নিয়ে বলেন না বাবা, মায়ের কোনো জাত হয় না। মা শুধু মাই হয়। তোমার বাবা মিথ্যে বলেননি। কিন্তু ওরা যে তা মানতে চায় না। ❑

নববর্ষ

গুড মর্নিং দাদু, হ্যাপি পয়লা বৈশাখ।

বছর দশেকের নাতি টয় প্যান্টের ভিতর জামা গুজতে গুজতে ভীষণ ব্যাস্ততার সাথে অমিতাভ বসুর ঘরে ঢুকে উইশ করেই বেরিয়ে যাচ্ছিলো। কারণ দেরি হলে মা বকবে। সপ্তাহে এক দিন ড্রয়িং ক্লাস লেট হলে পিছিয়ে পড়বে। দাদু মুচকি হেসে— সুপ্রভাত দাদু ভাই, শুভ নববর্ষ।

দশ বারো বছরের টয় দাদুর অন্ধের যষ্টি। কিন্তু মনের ক্ষুধা নিবারণে নাতিকে আর কাছে পান কই? সমস্ত সপ্তাহ ধরে তার এডুকেশন রুটিন চলে, শৈশব জীবনটা বুঝে নেওয়ার ফাঁকফোকরও নেই। দাদুর ইচ্ছা একমাত্র নাতি বড় স্কুলে পড়ুক, ভালো ইংরেজি জানুক, কিন্তু বাংলা কালচার যেনলোপ না পায়। ড্রাইভার দুই–তিন বার গাড়ির হর্ন বাজাতেই বৌমা টয়কে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

কলকাতা শহরের তিন কামরার ফ্ল্যাটটাই এখন অমিতাভবাবুর কাছে গ্রাম বা পাড়া। রুটিন মাফিক কিছু কাজ আর দিনের বাকি সময় খেয়ে ঘুমিয়ে অবসর জীবন কাটানো। কমপ্লেক্সের দারোয়ান আর তাঁর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই, দারোয়ান দরজার বাইরে পাহারা দেন বাবু দেন ভিতরে। ছুটির দিনগুলোতে ব্যস্ততা যেন আরো বেড়ে যায়। ফলে তাঁর অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। উনি ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। দেখলেন দোকান পাঠ সব খুলে গেছে কিন্তু কোনো সাজ সাজ রব নেই। অথচ ফার্স্ট জনুয়ারির সপ্তাহ দুই আগে থেকেই দোকান পাট সব সেজে ওঠে। চায়না লাইটে মুদি, পান বিড়ির দোকানও সেজে ওঠে। হালখাতা প্রায় উঠেই গেছে। বিকালের দিকে সাত আট রকম মিশিয়ে এক বাক্স মিষ্টি আর ঠাকুরের ফটো যুক্ত একটা পঞ্জিকা ক্যালেন্ডার এখন আর ঘরে আসে না। ছেলে রাতে বাড়ি ফেরার সময় হয়তো নামি কোম্পানির চকচকে মোড়কে লাড্ডু বা শনপাপড়ী নিয়ে আসবে।

মনটা কেমন পানসে হয়ে গেল। বাইরে রোদ্দুরের তাপটা অনেক বেড়ে গেছে। বোসবাবু ব্যাল্‌কনি থেকে ঘরে এসে আরাম কেদারাতে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। একটা গরম বাতাস জানালার বাইরে দিয়ে বয়ে যেতে লাগলো, তাতেই শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। বোসবাবু চোখ বন্ধ করে পৃথিবীর সব থেকে দ্রুতগামী যানে চেপে বসলেন। যাতে করে ষাট বছর থেকে সেকেন্ডের মধ্যে

দশ বছরে পৌঁছে যাওয়া যায়।

ভোর পাঁচটায় টাইম পিস ঘড়ির এলার্ম ক্রিংক্রিং শব্দে বেজে উঠল। ছোট্ট অমিতাভের ঘুমের ঘোর তখন কাটেনি, পাশ বালিশটা পাঁজা করে পাশ ফিরে শোয়। ঠাকুমা জানালা খুলে দিয়ে সুতির তালি দেওয়া মশারিটা পেরেকের এক কোন গুজতে গুজতে দাঁত ফোকলা গালে গান ধরেছেন— এস হে বৈশাখ এস এস। অগত্যা অমিতাভ বিছানা ছেড়ে হাতে এক খাবলা লাভা মাজন নিয়ে পুকুর পাড়ে যায়। পুকুর পাড়ের পাশ দিয়ে গ্রামের রাস্তা গিয়ে উঠেছে নকপুলের বড়ো রাস্তায়। পুকুর পাড়ে আরো দুই চারটে বাচ্চা আসে। দাঁত মাজা উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য হলো সারাদিনের খেলার রুটিন। পচা নামে নয় বছরের ছেলেটি ঘুটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজছিলো, ওর আঙ্গুল থেকে ঘুটের ছাই মেশানো লালা গড়িয়ে কব্জি বেয়ে কনুই দিয়ে পড়ছে। দূর থেকে রবীন্দ্র সংগীতের আওয়াজ ভেসে আসলো। কচি মন উৎকণ্ঠায় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। পয়লা বৈশাখের প্রভাত ফেরি ততক্ষণে অনেক এগিয়ে এসেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শাড়ি ধুতি পাঞ্জাবি পরে লাইনের প্রথমে আছে। অমিতাভর বাবা বাচ্চাগুলোকে পরিচালনা করছেন এবং দরাজ কণ্ঠে একের পর এক রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে চলেছেন। যেন পয়লা বৈশাখ, দোল পূর্ণিমা, আর পঁচিশে বৈশাখ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

বাড়িতে ফিরে অমিতাভ মাকে অনুরোধ করলো আজ সে আচ্ছটি পাতার তিতো রস খালি পেটে খাবে না। মা সম্মতি দিলে অমিতাভ খুশি হয়ে বইপত্র নিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় বাবা ঘরে ঢুকে বললেন, আজ আর অমিতাভকে পড়তে বসতে হবে না। শম্ভু ঘোষের মিষ্টির দোকানে নিমন্ত্রণ করেছে ওখানে যেতে হবে। অমিতাভের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সকাল থেকেই একটা উৎসব মুখর পরিবেশ। পড়তে হলো না, তিতো খেতেও হলো না। ঘোষ সুইটস-এর মিষ্টি দিয়ে প্রাতঃরাশ শুরু, ভাবাই যায় না।

সমস্ত বাড়ি কাজের মাসি আজ গোবর জলে সুন্দর করে লেপেছে। প্রতিটা ঘরের দরজায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি মালা লাগানো হয়েছে যেটা আম পাতা ও গাঁধা ফুল দিয়ে তৈরি। আজ সব ঘরের রাজা ঠাকুর ঘর অমিতাভের মায়ের হাতের ছোঁয়ায় যেন এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। সমস্ত বাড়ি ধূপ ধুনোর গন্ধে ম-ম করছে। ঘোষ সুইটসের পূজা খুব সকালে হয়ে যায়। পূজার পর শম্ভু ঘোষ বিশেষ কিছু বাড়িতে এক হাঁড়ি রসগোল্লা আর একটা নতুন বছরের দেবদেবীর ক্যালেন্ডার পাঠিয়ে দেন। বোস বাড়ি বিশেষ বাড়ির মধ্যে একটি।

আজকের দিনে বোস বাড়িতে দুপুরের খাওয়াটা বেশ অনুষ্ঠান বাড়ির মতো ঘি, শুক্তো, ডাল, বেগুন ভাজা, ধোঁকার ডালনা, এঁচড়ের ডালনা, চাটনি, পায়েস, সব নিরামিষ। সংস্কার আছে বছরের প্রথম দিন যেমন কাটবে সমস্ত বছর তেমনি যাবে। দুপুরে পেট পুরে খেয়ে অমিতাভ আই ঢাই শরীরটা নিয়ে সোজা আম বাগানে ছুটলো। সেখানে পচা, ন্যাদা, রসুল, গণশা, কেতো সবাই হাজির। ঝড়ে পড়া আম খাওয়ার উৎসব চলবে। তারপর সন্ধ্যাবেলা বাবার হাত ধরে মোড়ের মাথায় বিভিন্ন দোকানে গিয়ে হালখাতা করা, ভাবাই যায় না কত ধরনের মিষ্টি। মনে হয় সব খাই, কিন্তু পেট তো পারমিট করবে না। তখন তো ফ্রিজের প্রচলন ছিল না, তাই মা মিষ্টিগুলো জল পেতে মিটসেভের ভিতর রেখে দিতেন যাতে পিঁপড়ে আরশোলা ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা হয়। এত কিছুর মধ্যেও উপরি পাওনা বিকালে গাজনের মেলা। বলাকা সংঘের মাঠে বিরাট মেলা। নাগরদোলা, বাঁদর নাচ, পাঁপড় ভাজা, ভ্যাপুর আওয়াজ মাটির পুতুল আরো কত কি! এত বড় দিনটা যে কিভাবে কেটে যায় ছোট্ট অমিতাভ তার হিসাব মেলাতে পারেনা।

দাদু স্নান করবে না? নাতির প্রশ্নে বৃদ্ধ অমিতাভের সম্বিত ফিরল। ঠিক বলেছ দাদুভাই অনেক বেলা হয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে। স্নান সেরে ঠাকুর ঘরে গিয়ে প্রণাম করে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলেন।

ভাত, ডাল, আলুভাজা, চিকেন, আর আমূল কোম্পানির টক দই দিয়ে ভাত খেয়ে বিছানায় এসে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছোট একটা ভাত ঘুমের। ঘুম তো এলোনা, ভাবতে থাকলেন পয়লা বৈশাখের একাল সেকাল।

পয়লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ। বছরের প্রথম দিন। পৃথিবীর সব দেশই পালন করে তাদের মতো করে। প্রকৃতপক্ষে এটি নতুন বছরকে বরণ করার উৎসব। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কোনো উৎসব হতো না, এটি ছিল শুধু হালখাতার দিন। ফারসি ভাষায় হাল মানে নতুন। দিনটি ছিল ব্যবসায়ীদের কাছে নতুন খাতা খোলার দিন। এইদিনে রাজা, মহারাজা, সম্রাটরা প্রজাদের কাছ থেকে কৃষি জমির খাজনা আদায় করতেন। মোগল সাম্রজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরি পঞ্জিকা অনুসারে কৃষিপণ্যের খাজনআদায় করতেন। হিজরি সন গণনা করা হত চাঁদের হিসাবে। আর চাষবাস চলত সৌরবছর মেনে। তাতে কৃষকরা ভীষণ সমস্যায় পড়তেন। কারণ অসময়ে কৃষকদের খাজনা দিতে হত। প্রজা হিতৈষী সম্রাট আকবর পয়লা বৈশাখ খাজনা আদায়ের দিন ধার্য করলেন। কথিত আছে সম্রাট আকবর বাংলা সন হিসাবে হালখাতার প্রবর্তন করেন। প্রতি

বছর কৃষকরা চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সমস্ত খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকতেন। সেই নীতিই প্রণয়ন করেন বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, জমিদারদের উপর নবাবি কায়েম বজায় রাখার জন্য পয়লা বৈশাখ খাজনা আদায় করতেন। ছোট রাজা, জমিদাররা এই দিনে মুর্শিদাবাদে আসতেন এবং নবাবের দরবারে খাজনা জমা দিতেন। নবাবও তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী নানা রকম উপহার দিতেন। সেই নিয়ম আজও চলে আসছে। তাই আমরা হালখাতা করতে গেলে কিছু না কিছু উপহার পেয়ে থাকি। নির্দিষ্ট দিনের এই হালখাতাকে উৎসবের আঙিনায় এনে যিনি বাঙালির প্রাণের সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিলেন, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যা ছিল বাণিজ্যিক উৎসব, তা কবি গুরুর মসির গুণে (কবিতা, গান, প্রবন্ধ, নাটক) সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হল।

হঠাৎ জানালার শব্দে অমিতাভ বাবুর সম্বিৎ ফিরে এলো। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে দেখলেন প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছে। দরজা জানালা বন্ধ করে চার দেয়ালের মধ্যে বসে শুনতে থাকলেন বাতাসের শব্দ। বছরের প্রথম দিনে কালবৈশাখী বুঝিয়ে দিচ্ছে তার করাল ভয়ংকর রূপ। ঘরের টিউব লাইট কয়েকবার নিভে জ্বলে একেবারে ফ্যানকে নিয়ে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গরম কিন্তু জানালা খোলার কোনো উপায় নেই। বাইরে তখন ঝড়ের তাণ্ডব চলছে।

ঘণ্টা খানেক ঝড়ের তাণ্ডব চলার পর বৃষ্টি শুরু হলো। সেও প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চললো, তাতে অবশ্য ধুলোটা মরে গেলো। জানালা দরজা খুলে দিতেই বেশ সুন্দর ঠান্ডা বাতাস ঘরটা ভরিয়ে দিলো। এরি মধ্যে কারেণ্ট চলে এলো, অমিতাভ বাবু টিভিটা চালালেন। কাজের বউটি এক কাপ গরম চা–হাতে ধরিয়ে দিতেই সেটি নিয়ে আয়েশ করে বসে কালবৈশাখী কোথায় কিভাবে তাণ্ডবলীলা চালালো তা টিভির পর্দায় দেখতে থাকলেন। ততক্ষণে ছেলে অফিস থেকে ফিরে এক কাপ চা নিয়ে গুটি গুটি পায়ে বাবার পাশে এসে বসলেন। টিভির স্ক্রীনে তখন কালবৈশাখী কলকাতায় কিভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তাই দেখাচ্ছে। চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে অমিতাভবাবুর পুত্র বললেন কালবৈশাখী পয়লা বৈশাখ দিনটাকে লণ্ডভণ্ড করে দিল, মনেই হচ্ছে না আজ নববর্ষ।

অমিতাভ বাবু মনে মনে হেসে ভাবলেন ভাগ্যিস কালবৈশাখী ঝড়টা হল। তাতে অন্তত বাংলা নববর্ষের অনাড়ম্বরতা নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের হাতে একটা অজুহাত তো এলো। ❑

আত্মার আকুতি

এ... তে.. এককা গাড়ি খুব ছুটেছে
ঐ... তে.. ঐ দেখো ভাই চাঁদ উঠেছে

—ছড়া কাটতে কাটতে, সোমনাথ প্রামাণিক একটি ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে বসে বললো যে, সে আগে একবার মুর্শিদাবাদে এসেছিল কিন্তু ঘোড়ার গাড়িতে চাপা হইনি। ব্যবসাপত্র সামলিয়ে আর বেড়ানো হয় না। পনির ব্যবসায়ী মনোজ ঘোষ, দাদা সঞ্জিত ঘোষের মেয়ের বিয়েতে জোর করে না আনলে হয়ত আসাই হতো না।

এক্কা গাড়ি চললো জামালপুর মোল্লাপাড়ার দিকে। এদিকটা টুরিস্ট স্পট নয়, তবুও বেশ সাজানো গোছানো। প্রতিটা বাড়ি বিঘা খানিক জমি নিয়ে নারকেল, সুপারি গাছ দিয়ে ঘেরা। সুন্দর পিচ রাস্তাটা জামালপুরের দিকে এগিয়ে গেছে। চারদিক খোলা এক্কা গাড়িতে সওয়ার হয়ে বেশ লাগছে। ভোরবেলা তো চোখে একটা ঘুম ঘুম ভাব রয়েছে, কারণ গত রাতে ট্রেনে ভাল করে ঘুম হয়নি। এদিকে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলোও হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করছে না। সোমনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিভঙ্গিতে এদিক ওদিক দেখতে থাকল। এর পর সোমনাথের নজরে আসলো দূরে একটা প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সে মনোজ ঘোষকে জিজ্ঞেস করতে যাবে বাড়িটি সম্পর্কে, এরই মধ্যে মনোজ ঘোষ বলে উঠলো—এসে গেছি, ও-ই যে বড়ো বাড়িটা দেখা যাচ্ছে— সোমনাথ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ওই বড়ো বাড়িটা আপনাদের? মনোজ ঘোষ একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, আরে না না, ওটা একটা দেড়শো বছরের পুরনো ভুতুড়ে বাড়ি, ওই বাড়ির পাশেই আমাদের বাড়ি। সোমনাথ বিজ্ঞান মঞ্চের লোক, ভুতুড়ে বাড়ির নাম শুনে একটু নড়েচড়ে বসলেন, কারণ তাকে তো ভুতুড়ে বাড়ির কাণ্ডকারখানার রহস্য সমাধান করতে যেতে হয়। মনোজ ঘোষ অল্প সময়ে হালকা করে যেটুকু বললেন, ওই বাড়িটা আজ প্রায় একশো বছর ধরে ওই ভাবেই পড়ে আছে। লতাপাতা, গাছপালায় ভরে ওঠেনি কারণ সরকারি কাজের উদ্দেশ্যে বাড়িটিকে প্রয়োজন মতো পরিষ্কার করা হয়। প্রশ্ন হলো তাহলে ভুতুড়ে বাড়ি কি করে হলো? আসলে রাত্রে ওই বাড়িতে কেউ থাকতে পারে না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ওই বাড়িতে অপদেবতার উৎপাত চলে। পূর্ণিমা রাত্রে ভৌতিক কাণ্ডকারখানা আরো বেড়ে যায়। অনেক সাহসী

মানুষ এর রহস্য উদঘাটন করতে এসেছে, লাভ তো কিছু হয়নি বরং তাদের ক্ষতি হয়েছে। সোমনাথবাবুর কিউরিওসিটি বেড়ে গেলো। উনি জানতে চাইলেন ক্ষতিটা কেমন হয়েছিল। মনোজবাবু তাঁর অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে থাকেন– একবার তিনজন ভদ্রলোক এলেন বাড়ির রহস্য উদঘাটন করতে। মূলত বাড়ির রহস্যটা সবার সামনে আনা। সারাদিন তিনজন মিলে এলাকায় ঘুরলেন, পাঁচ বিঘা বাগানসহ ভিটে বাড়িটা ঘুরেফিরে নিরীক্ষণ করলেন। কাজ না মেটায় সেই রাত্রে ভুতুড়ে বাড়িতে থেকে যেতে মনস্থ করলেন। গ্রামের যে মানুষজন তাঁদের গাইড করছিলেন তাঁদের বারণও শুনলেন না। পরদিন সকালে দেখা গেলো ওই বাড়িতে তিন জায়গায় তিনজন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। জ্ঞান ফিরতেই তারা গত রাতের ঘটনার বর্ণনার থেকে কলকাতায় ফেরার উপর গুরুত্ব বেশি দিচ্ছিলেন। তার মধ্য থেকে যেটুকু জানা গেল, ওঁরা রাত্রে কিছু অশরীরী ক্রিয়াকলাপ দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। ঘটনাটা শুনে তারক, পরিমল, উজ্জ্বল বিশেষজ্ঞের মতো তাদের মত প্রকাশ করে উঠলো। সোমনাথ কোনো মন্তব্য না করে মনোজবাবুর কাছে জানতে চান আর কি, কি ঘটেছিল? মনোজবাবু আবার বলতে শুরু করলেন— আর একবার এক মধ্য তিরিশের যুবক এসেছিল আত্মা নিয়ে রিসার্চ করতে, সে তো সারাদিন বাড়িটি ঘুরে ঘুরে দেখলো এবার রাতের পালা। আগের তিনজনের মতো এলাকার সবাই তাকে সাবধান করলো, পুরনো বাড়িটার কিছু ভৌতিক কাণ্ডকারখানার কথাও বললো কিন্তু কে শোনে কার কথা। একাই ওই বাড়িতে রাত কাটাবে ঠিক করলো, পরদিন খুব ভোরে গ্রামের লোকজন গিয়ে দেখে যুবকটি উদভ্রান্তের মতো পোড়ো বাড়িটার ভেতরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকলে কি হয়েছে জানতে চাইলে যেটুকু বোঝা গেল যুবকটি সম্ভবত ভয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। সোমনাথ বাবু জানতে চাইলেন তারপর কি হলো? মনোজবাবু বললেন— আর কি পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল পুলিশ যুবকটিকে বাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিল। শুনেছিলাম ছেলেটি সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট হয়ে গেছে। ততক্ষণে এক্কা গাড়িটা পুরনো বাড়ির সামনে চলে এসেছে। সোমনাথ মনোজবাবুকে বাড়িটা একটু দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলো। এক্কা গাড়ি এসে দাঁড়াল দেড়শো বছরের পুরনো বাড়িটার সামনে। বিরাট বড়ো বাড়ি, সামনে অনেকটা বাগান আছে। বেশ কিছু পুরনো সারি সারি গাছ আর লতাপাতার জঙ্গলে ভর্তি। বাড়ির একতলায় অনেক ঘর, তার মধ্যে দুই একটা ঘরে পঞ্চায়েতের মালপত্রে ভর্তি, বাকি দশ বারটি ঘর খালি খাঁ খাঁ করছে। পুরনো আমলের বড় বড় ঘর, যার

জানালাগুলো ঘরের তুলনায় ছোট, ফলে দিনের বেলাতেও কেমন অন্ধকার অন্ধকার ভাব। সোমনাথ দোতালায় উঠে গেলেন ওখানেও নিচের মত অনেক ঘর, ঘরগুলো বেশ বড়ো, আলো বাতাস খেলছে। দক্ষিণ খোলা বড়ো একটা ব্যাল্‌কনি আছে। মনোজবাবু বললেন এখানে স্বাস্থ্যসাথী, অঙ্গনওয়াড়ী, আশাকর্মী, একশো দিনের কাজকর্মের পরিচালনা করা হয়। জায়গা প্রচুর তো লোক সমাগমও হয় অনেক। কিন্তু সূর্য অস্ত যেতে না যেতেই সব ফাঁকা। সম্পূর্ণ বাড়িটা জনমানবহীন শূন্যতায় রাতের অপেক্ষায় সময় গোনে। সোমনাথ মনোজবাবুর মুখের কথা কেড়ে বলেন, সবাই মনে ভাবে ভূত আসার সময় হয়ে গেছে। মনোজবাবু হেসে বললেন, ঠিক তাই, এবার বাড়ি যাই চলুন, সবাই আমাদের যাবার অপেক্ষায় রয়েছে।

মনোজবাবুর বাড়িতে পৌঁছতেই, এক ভদ্রলোক তাদের দেরি হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে এগিয়ে এলেন। মনোজবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, উনি মনোজবাবুর দাদা সঞ্জিত ঘোষ। গ্রামের মানুষ ট্রেনের টাইমের উপর নির্ভর করে আশা যাওয়ার সময় নির্ধারণ করে। মনোজবাবু সোমনাথের পরিচয় দিয়ে জানালেন তিনি একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। পুরনো ভুতুড়ে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে একটু সময় লেগে গেল। সঞ্জিতবাবু বললেন, ঠিক আছে, কাল রাতে ট্রেনে তো ভালো করে ঘুম হয়নি, এখন হাত মুখ ধুয়ে টিফিন করে একটু বিশ্রাম নিন। আমি দা-ঠাকুরকে খবর দিচ্ছি, উনি এলে ওই বাড়ির একশ বছরের ইতিহাস জানতে পারবেন। সোমনাথ, তারক, উজ্জ্বল, পরিমল খুব উৎসাহিত হয়ে একটি গামছা নিয়ে পুকুরে চলে গেলেন হাত পা ধুতে।

বৈশাখ মাস গরম পড়েছে যথেষ্ট, তবে গ্রাম তো প্রচুর গাছপালা থাকায় হালকা একটা ফুরফুরে বাতাস আছে। মনোজবাবুদের বিরাট বাগানআলা ভিটে বাড়ি। একটা ছোটখাটো পাকা বাড়ি আছে বটে, কিন্তু বেশি আছে খড়ের চাল, টালির চাল। কলকাতার চার অতিথি একটা মোটা আম গাছের তলায় শীতল পাটি পেতে বসে টিফিন খাচ্ছে। পরিমল দুইবার শব্দ করে ঘ্রান নিয়ে জানালো এখানে একটা ভৌতিক ব্যাপার আছে। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল বলে উঠলো ঠিক ঠিক আমিও কেমন একটা বিটকেল গন্ধ পাচ্ছি! তারক বলে উঠলেন জানেন তো আমি যখন পুকুরে হাত মুখ ধুচ্ছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল কে যেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সোমনাথ জোরে হেসে বললো, আরে ভুতুড়ে বাড়ি তো পাশেরটা, এটা নয়। তাহলে ভোটকা গন্ধটা? পরিমল সন্দেহ যুক্ত প্রশ্নটা ছুড়ে দিলো। এরই মধ্যে মনোজবাবু এসে পড়েছেন, উনি বললেন, আপনারা যে

গন্ধটা পাচ্ছেন সেটা গরুর গোবর ও চোনার মিশ্রণের গন্ধ। ওই যে খড়ের চালা ঘরগুলো দেখছেন, ওগুলো সব গোয়াল ঘর। বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান, তাই ঘরগুলোকে পরিষ্কার করে গরুগুলোকে আপাতত বাগানের শেষ প্রান্তে বেঁধে রাখা হয়েছে। উজ্জ্বল অবাক হয়ে বললেন, চুরির ভয় নেই? মনোজবাবু হেসে বললেন, না, চুরিরও ভয় নেই, ভূতেরও ভয় নেই, আছে শুধু সাপের ভয়। আর ওইটুকু রিস্ক নিতেই হবে। তারক নড়েচড়ে বসে বললো, কি সাপ ভাই? মনোজবাবু— কেউটে, গোখরো, শঙ্খচূড়, চন্দ্রবোড়া আরো কতকিছু। ওরা কি গরুর দুধ খেতে আসে? উজ্জ্বল জিজ্ঞাসা করলো। সোমনাথ একটু হেসে বললেন—সাপ কখনো গরুর দুধ খেতে আসে না। আসলে সাপ দুধ খেতেই পারে না। কারণ তরল পদার্থ চুষে খেতে হলে জিভের প্রয়োজন, কিন্তু সাপের জিভ চেরা হওয়ায় সাপ চুষে খেতে পারে না। জিভটি শুধু শ্রবণ ইন্দ্রিয় হিসাবে কাজ করে।

এরই মধ্যে সঞ্জিত ঘোষের সাথে বেঁটে খাটো রোগা পাতলা বছর সত্তরের এক পৈতেধারী বৃদ্ধ হুঁকো হাতে কলকাতা বাবুদের কাছে গুটি গুটি পায়ে হাজির হলেন। সঞ্জিত বাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, উনিই দা-ঠাকুর। এবার দা-ঠাকুরের কাছ থেকে ওই ভুতুড়ে বাড়ি সম্পর্কে যা যা জানতে চান জেনে নিন, কারণ এই গ্রামে একমাত্র উনিই ওই বাড়ির ইতিহাস ভালোভাবে বলতে পারবেন। বিয়ে বাড়ি তো অনেক কাজ, আমরা ওদিকটা দেখিগে। এই বলে সঞ্জিতবাবু, মনোজবাবু বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

দা ঠাকুর আমাদের জন্য পেতে দেয়া শীতল পাটিতে বসে আগে হুঁকোতে কয়েকটি সুখটান দিলেন, তারপর ধোঁয়া ছাড়তেই পরিমল বলে উঠলেন— গন্ধে বেশ একটা মাদকতা আছে। দা ঠাকুর হুঁকো থেকে মুখ সরিয়ে বললেন, গন্ধ তো থাকবেই, তামাক যুক্ত নেশার জিনিস না। আপনারা যেমন পুরনো বাড়ির নাম শুনেই একটা ভূত ভূত গন্ধ পেয়েছেন, ঠিক তেমনি। আমার যেমন হুঁকোর নেশা, আপনাদের তেমনি ভূতের নেশা। তারক বললো, না না আমাদের না শুধু সোমনাথের। সোমনাথ বললো, বিতর্কের দরকার নেই, আপনি আমাদের পোড়ো বাড়ির ইতিহাসটা বলুন।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ওই পোড়ো বাড়িটার মালিক ছিলেন মির খোদাবক্স। উনি খুব পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। সর্বোপরি উনি নবাব মীরজাফরের বংশোদ্ভূত। তখনকার সময়ে সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে ওনার উঠা বসা ছিল। শোনা যায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে ওনার ওতপ্রোতভাবে

যোগাযোগ ছিল। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী কলকাতা থেকে এসে এই বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকতেন। তিনশ বছরের বেশি সময় ধরে মীরজাফরের বংশের একটা বদনাম আছে। বদনামটা সেই সময়ও ছিল। কিন্তু মির খোদাবক্সের চলন বলন ব্যবহার দেখে মানুষের চিরাচরিত ধারণাকে ভুল মনে হতো। বংশের বদনামের ব্যাপারে উনি ঘনিষ্ঠ মহলে একটা কথাই বলতেন, যে কথাটা ইতিহাস মান্যতা দেয়নি। নবাব সিরাজদৌলহ সিংহাসনে বসা নিয়ে তাঁর পরিবারের মধ্যে মতো বিরোধ তো ছিলই। তাছাড়া তিনি তৈরি বাংলা, বিহার, ওড়িশার মসনদে বসে বাংলা পরিচালনার থেকে তাঁর নিজের ভোগ লালসার দিকে নজর দিয়েছিলেন বেশি। তাঁর সুরা ও হারেম নিয়ে যে ঘটনাগুলো আমরা জানতে পারি, তাতেই তা প্রমাণিত। মীরজাফর ছিলেন তাঁর প্রধান সেনাপতি। তিনি এইরূপ দায়সারা শাসন মেনে নিতে পারেননি। রাজনীতি তো তাঁরও রক্তে ছিল। আবার নবাবের পরিবারের ইন্ধনও কম ছিলো না। এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপনিবেশ কায়েমের উদ্দেশ্যে কলকাঠি নাড়া, ফলে মীরজাফর সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। যাই হোক ওই সব কাহিনী এখানে প্রাসঙ্গিক নয় যেটা বলছিলাম, মির খোদাবক্সের একটি মাত্র কন্যা ছিল, নাম রুকসানা। মির খোদাবক্স চাননি তাঁর কন্যা অবগুণ্ঠনাবৃত থাকুক। তিনি চেয়েছিলেন কন্যা শিক্ষা দীক্ষা কালচারে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিভূ হয়ে থাক। হয়েছিলও তাই, সেই সময়ে ভারতের ইতিহাসে মুসলিম শিক্ষিত মহিলাদের তালিকায় তাঁর নাম ছিল প্রথম সারিতে। শিক্ষা গ্রহণকালে তাকে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিশেষত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ কালে। মুসলিম সমাজে তাঁর এই শিক্ষার মান্যতা দেয়া তো হয়নি বরং রক্ষণশীল মুসলিম সমাজ তাঁর বিয়ে দেয়ার জন্য মির খোদাবক্সকে বিভিন্ন ভাবে চাপ সৃষ্টি করেছিল। সমাজে বসবাস করতে গেলে সমাজের নিয়ম নীতি কিছুটা তো মেনে চলতে হবে। তাই মির খোদাবক্স দেখেশুনে মেয়ের বিয়ে দিলেন। জামাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, জমিদার পরিবারের একমাত্র সন্তান। জামাইয়ের উৎসাহে রুকসানা বিবির পড়াশোনা চলতে থাকলো। বছর পাঁচ সাত এই ভাবেই চললো। ইতিমধ্যে মির খোদাবক্স গত হয়েছেন। বাবার আদর্শে অনুপ্রাণিত রুকসানা বিবি উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্যে তখনো সন্তান ধারণ করেননি। হঠাৎ পিলে জ্বরে মাস খানিক ভুগে রুকসানা বিবির স্বামী মারা যান। তার পরেও বছর দশেক রুকসানা বিবি শ্বশুর বাড়িতে ছিলেন। তারপর মির খোদাবক্সের স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ হলে মায়ের সেবা শুশ্রূষার জন্য রুকসানা বিবি বাপের বাড়িতে এলেন। শোনা যায় তিনি আর ফিরে

যাননি। মায়ের অসুস্থতার এবং সম্পত্তি সংক্রান্ত কারণে তাঁর পড়াশোনায় ইতি টানতে হয়েছিল। আরো কয়েক বছর ভোগার পর রুকসানা বিবির মা মারা যান। পিতার সম্পত্তি ও শ্বশুর বাড়ির সম্পত্তি মিলিয়ে রুকসানা বিবি তখন প্রচুর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালকিন। সম্পত্তি অর্থ দিয়ে কি হবে? তিনি বাঁচবেন কাকে নিয়ে। আল্লা তো আপনজনদের তুলে নিলেন পরিবর্তে কাউকে দিলেন না। এতদিনে তিনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হলেও মনে যেন একটা মাতৃত্বের অভাব অনুভব করলেন। বিয়ে আর করবেন না এটা আগেই ঠিক করে ফেলেছিলেন। তাহলে উপায়? উপায় একটাই আছে, সেটা হলো একটা সন্তান দত্তক নেয়া। রুকসানা বিবি মনস্থ করলেন সন্তান দত্তক নেবেন। কিন্তু তাতেও সমস্যা কম নয়, তখনকার দিনে কোনো হোম থেকে বা পছন্দ মতো সন্তান দত্তক নেয়া যেতো না। প্রমাণিত রক্তের সম্পর্কে অর্থাৎ নিজের বংশ থেকে কোনো শিশুকেই দত্তক নেয়া যেত। তা না হলে ইংরেজ সরকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতো। ফলে অনেক তথ্য প্রমাণ নিয়ে অবিভক্ত বাংলার রংপুর থেকে তাঁর তুতো ভাইয়ের সন্তানকে দত্তক নিলেন। রুকসানা বিবির কপালটা মন্দ ছিল। যে শিশুটিকে দত্তক নিয়েছিলেন তার নাম ছিল মির মনছুর। লেখাপড়া বেশি করেনি। মায়ের টাকার জোরে বাবুয়ানী করে বেড়াতো। তার এই উচ্ছৃঙ্খলতা রুকসানা বিবির একেবারেই পছন্দ ছিল না। বয়সের ভারে তিনি মনছুরকে সামলাতেও পারতেন না। এমতাবস্থায় তিনি ধর্মে কর্মে মনোনিবেশ করলেন। এমনিতেই তিনি বাবা মির খোদাবক্সের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তাছাড়া ওনার মধ্যে একটা ধারণা কাজ করতো— মীরজাফরের বংশের কন্যা হওয়ায় বেইমানি রক্ত তাঁর শরীরে না বইলেও আপামর ভারতবাসীর মনে বইছে। সুতরাং যথাসাধ্য সামাজিক কল্যাণ করে পূর্ব পুরুষের করা পাপ থেকে নিজেকে যতটুকু মুক্ত করা যায়। এদিকে তাঁর এই দান খয়রাতি পুত্র মনছুরের একদম পছন্দ ছিল না। ফলে ঝগড়া অশান্তি রোজ লেগেই থাকতো। মাঝে মাঝে সেটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যেত। একবার এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে মা ছেলেতে তুমুল ঝগড়া বাঁধলো, শোনা যায় সেই রাতে মির মনছুর প্রচুর মদ্যপান করেছিল।

ওই দিনের পর থেকে রুকসানা বিবি ও তাঁর পরিচারিকাকে আর দেখা যেত না। দিনে দিনে মানুষের মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। গ্রামের সকলে মিলে মির মনছুরের নামে কতোয়ালিতে নালিশ জানিয়েছিল। খবরটা মির মনছুর আগেই পেয়ে গিয়েছিল। তাই পুলিশ আসার আগেই মনছুর পালিয়ে যায়। সে

আর কখনো গ্রামে ফেরেনি।

সেই সময় থেকে বাড়িটা ওই ভাবেই পড়ে আছে। কিছু ভুতুড়ে কাণ্ড কারখানার জন্য ঐ বাড়িতে কোনো মানুষজন থাকে না। পুরনো বাড়ির ইতিহাসটা যে এত তথ্য বহুল এবং বেদনাদায়ক হবে সোমনাথ তা ভাবতেও পারেনি। একটা সুন্দর মনের বৃদ্ধার শেষ পরিণতি কি হলো কেউ জানতে পারলো না! উজ্জ্বল, তারক, পরিমল নিছক সুন্দর গল্পের তারিফ করলো বটে, সোমনাথের মাথায় একটা খটকা থেকেই গেল। ইংরেজ পুলিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরতে যতটা গুরুত্ব দিতো ভারতীয়দের ব্যক্তিগত সমস্যায় সেই ভাবে গুরুত্ব দিত না। এরই মধ্যে মনোজ এসে স্নান খাওয়া করে নিতে বললেন। কারণ বেলা অনেক হয়ে গেছে। মফস্বলের বিয়ে বাড়িতে দুপুর থেকেই প্রচুর লোক সমাগম হয়। স্নান খাওয়া সেরে সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে সোমনাথ, তারক, পরিমল, উজ্জ্বল বিয়ে বাড়ির ছোট ছোট কাজে লেগে পড়লো, তাতে সময়টা কেটে যাবে। দা ঠাকুর কর্তা হয়ে একটি চেয়ারে বসে বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে থাকেন।

সন্ধ্যায় লগ্ন ছিল বলে রাত এগারোটার মধ্যে সব কমপ্লিট। সোমনাথদেরও খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এবার শোয়ার পালা, বাড়িতে অনেক অতিথি, শোয়ার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দা ঠাকুর প্যান্ডেলের ভিতর পরিস্কার করিয়ে শোয়ার ব্যবস্থা করছেন। তারক ফিস ফিস করে বললো, মনে হয় এই খাবারের গন্ধের মধ্যে মাটিতে মাদুর পেতে শোয়াবে। সোমনাথ একটু ব্যঙ্গ করে বললো, তবে কি তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে পালঙ্কে শোয়াবে? আমার কথা শুনলে রাত্রে ভালো করে ঘুমাতে পারবে। পরিমল জানতে চাইলো সোমনাথের ইচ্ছেটা। সোমনাথ বললো পোড়ো বাড়িটায় দক্ষিণ খোলা একটা ব্যালকুনি আছে, ওখানে চারটে মাথার বালিশ একটা শতরঞ্চি নিয়ে গেলেই যথেষ্ট। খেপেছ নাকি, রাতে ঘুম না হলে এখানে জেগে বসে থাকবো, তবুও ওই অনিশ্চিন্ত জায়গায় নিশ্চিন্তে ঘুমুতে যাবো না, উজ্জ্বল একটু রেগে গিয়ে কথাটা বললো। এদের চাপা স্বরে বাকবিতণ্ডা খেয়াল করে দা ঠাকুর এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা। পরিমল সোমনাথের ইচ্ছেটা দা ঠাকুরকে জানাতেই, দা ঠাকুর বিস্ময়ে চমকে উঠলেন, বলেন কি? বিয়ে বাড়িতে এসেছেন, বিয়ে কাটালেন, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। এবার সোমনাথ তার বক্তব্য পরিস্কার করলো, যে সে আজ রাতটি ওই পোড়ো বাড়িতে কাটাবে, কারণ সে নিজে চোখে দেখতে চায় সেখানে কি ঘটে। ইতিমধ্যে সেখানে মনোজ ও সঞ্জিতবাবু

এসে পড়েন। তারাও বাধা দিলেন। তারক, উজ্জ্বল, পরিমল বলে দিল তারা ওই ভুতুড়ে বাড়িতে শুতে যাবে না। কিন্তু সোমনাথ কারোর কথা শুনলো না। একটা বালিশ, একটা শতরঞ্চি, একটা টর্চ লাইট নিয়ে গট গট করে ভুতুড়ে বাড়ির দিকে চলে গেল। দা ঠাকুরের দুশ্চিন্তায় রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। একটা গোঁয়ার ছেলে, কারোর কথা শুনলো না। যদি ভালো মন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তবে সঞ্জিব বেচারা বিপদে পড়ে যাবে। তাই ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে গুটি গুটি পায়ে চলে আসেন মনোজ ঘোষের বাড়িতে। উদ্দেশ্য সকলকে নিয়ে পোড়ো বাড়িতে গিয়ে সোমনাথের খবর নেওয়া।

দা ঠাকুর, সঞ্জিববাবু, মনোজ বাবু তারক, উজ্জ্বল, পরিমল আরো কয়েক জন মিলে পোড়ো বাড়িতে গেল। ওরা গতকাল সোমনাথ-কে ব্যাল্‌কনিতে শোবে বলতে শুনেছিল, তাই সোজা ব্যাল্‌কনিতে চলে গেল। ওখানে গিয়ে দেখল সোমনাথ নেই, শতরঞ্চিটা গুটিয়ে এককোণে পড়ে আছে, মাথার বালিশ ও টর্চলাইট-টা মাটিতে পড়ে আছে। ওরা সেখানে সোমনাথকে না দেখতে পেয়ে রীতি মতো ভয় পেয়ে গেল। সম্পূর্ণ বাড়ির ঘরগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কোথাও নেই। এলাকার দুই একজন ছিল, তারা বাগানের দিকটা খুঁজতে গেল।

কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এলো। সকলে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেল। নানা জনে অকারণে দুঃসাহসিক কাজ করার জন্য সোমনাথের সমালোচনা করতে লাগলো। এরই মধ্যে গ্রামের একটি কিশোর এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, বাড়ির পশ্চিম দিকের ঝোপের মধ্যে একটা মানুষ পড়ে আছে। কারোর আর বুঝতে অসুবিধা হলো না। সকলে ছুটলো সেই দিকে। পোড়ো বাড়ির পশ্চিম কোণে একটা ভাঙা কুটির আছে, তার পাশে যে ঝোপ জঙ্গল আছে, তার মধ্যে সোমনাথ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সকলে মিলে সোমনাথকে জঙ্গল থেকে তুলে এনে বাড়ির রোয়াকে শোয়ালো। তারপর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দেয়া হলো। মনোজ ঘোষ লোকাল ডাক্তারকে খবর দিলো। ততক্ষণে খবরটা পাঁচ কান হয়ে গেছে, গ্রামতো ফলে বিভিন্ন দিক থেকে উৎসাহিত মানুষজন এসে ভিড় করতে লাগলো। ডাক্তার এসে ভালো করে পরীক্ষা করে, একটা ইনজেকশন দেওয়ার মিনিট দশেকের মধ্যে সোমনাথের জ্ঞান ফিরলো। জ্ঞান ফিরতে সোমনাথ হতভম্ব হয়ে এদিক ওদিক এমন ভাবে দেখতে লাগলো যেন সে টাইম মেশিনে চেপে এই মুহূর্তে পৃথিবীর বুকে পড়লো। দা ঠাকুর ভিড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে, সোমনাথকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা কলকাতার সাহেব,

গতকাল রাতে সবাই মিলে এত বোঝালাম, এখানে আসতে বারণ করলাম, কারোর কথা তো তখন শুনলেন না, জোর করে তো এলেন, এখন মনে করে বলুনতো কি এমন ঘটেছিল যার জন্য আপনি ওই ঝোঁপের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন? সোমনাথ এতক্ষণে অনেকটাই ধাতস্থ হয়েছে। সে একটু জল খেয়ে নিল, তারপর গতকাল রাতে শোয়ার পর থেকে অজ্ঞান হওয়ার আগে পর্যন্ত ঘটা ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করলো।

বৈশাখী পূর্ণিমা রাত্রি, চাঁদ তখন মধ্য গগনে। ফুরফুরে বাতাস বইছে। সোমনাথ টর্চের আলোতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে সোজা দোতলার ব্যাল্‌কনিতে চলে যায়। ব্যাল্‌কনিতে সুন্দর বাতাস বইছে, চাঁদের আলোতে ব্যাল্‌কনি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সোমনাথ শতরঞ্চি পেতে বালিশটা নিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। সারাদিনের ক্লান্তি চোখে ঘুমের আবেশ। সোমনাথ শুয়ে শুয়ে ভাবলো, এসে ভালোই করেছে, নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা বিয়ে বাড়ির মতো কোলাহল নেই, ঘুমটা ভালোই হবে। যতক্ষণ ঘুম না আসে সোমনাথ ভাবতে থাকে এই এত বড় বাড়িটায় কোনো মানুষ না থাকায় বাড়িটা খাঁ খাঁ করে, আর লোকে বলে ভুতুড়ে বাড়ি। অথচ একটা সময় হয়তো এই বাড়ি লোক সমাগমে গমগম করতো। নিশ্চই সেই পূর্ণিমা রাতে এমন কিছু ঘটেছিল যে সেইদিনের পর থেকে আর ওই ভালো মনের বৃদ্ধা রুকসানা বিবিকে দেখা যায়নি। সাত পাঁচ ভাবনার মধ্যে সোমনাথের মনে হলো দূর থেকে একটা এক্কা গাড়ির শব্দ এই পোড়ো বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছে আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে, এক সময় এক্কা গাড়ির শব্দ পোড়ো বাড়ির নীচে এসে থামল। সোমনাথ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, একটা সাদা ধপধপে ঘোড়া একটা সুন্দর করে সাজানো রথের মতো গাড়িকে টেনে এনে বাড়ির লনে দাঁড়ালো। বাড়ির সামনেটা আর জঙ্গলাকীর্ণ মনে হচ্ছে না। সোমনাথ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তাও বুঝতে পারছে না। বাড়িটা আর চুন সুরকি খসা পুরনো বাড়ি নেই, একটা ঝা চক চকে জমিদার বাড়ির মতো লাগছে। সোমনাথ নিজের শরীরের অস্তিত্ব বুঝতে পারছে না। শুধু দুই চোখের সামনে ঘটে চলা ঘটনা ছবির মতো দেখে চলেছে।

এক্কা গাড়ি থেকে নেমে এলেন ষাট পঁয়ষট্টির এক বৃদ্ধা। সঙ্গে কম বয়সী আর একজন মহিলা। সম্ভবত তার পরিচারিকা। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে বাড়ির ভিতর ঢুকছেন।

— আপা, আজ তুমি যদি ঠিক সময়ে না পৌঁছোতে ওই গরিব ব্রাহ্মণের মেয়েটি লগ্নভ্রষ্টা হতো, মেয়েটির জীবনটা তো নষ্ট হতই, ওই গরিব বাপটিও

সমাজচ্যুত হতো। ছেলের বাড়ির লোকগুলো কি মানুষ? একশ টাকা বরপণ না দিতে পারায় বিয়ের পিঁড়ি থেকে বর তুলে নিয়ে যায়! বৃদ্ধা সমাজ ব্যবস্থার নিন্দা করে বলেন, আমি নই, আল্লা ওকে বাঁচিয়েছে, আল্লাতলা তো নিজে হাতে কিছু করে না আমার হাত দিয়ে হলো এইযা। এরই মধ্যে মদ্যপ অবস্থায় বছর তিরিশের এক বলিষ্ঠ যুবক তাদের পথ আগলে দাঁড়ালো। টলতে টলতে বৃদ্ধা-কে আঙ্গুল তুলে বলে, মুসলমানদের মধ্যে এতদিন দান ধ্যান করে আসছো, মেনে নিয়েছি, কিছু বলিনি, এখন হিন্দুদের মধ্যে বিতরণ শুরু করেছ? আর তো মেনে নেওয়া যায় না। বৃদ্ধা যুবককে মদ খেয়ে তার সামনে আসায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে বললেন, মাতাল, লম্পট আমার টাকা আমি কাকে দেব না দেব তোর কাছে অনুমতি নিতে হবে? লোকে ঠিক বলে, মীরজাফরের বংশধরদের রক্তে বেইমানি আছে তা না হলে খাওয়ার দুধ টুকু জুটত না সেই রংপুর থেকে এনে বড়ো করলাম এই তার প্রতিদান? তোকে আমি কিচ্ছু দেব না, তোকে তেজ্য পুত্র করবো, ইংরেজ সরকার আমার মৃত্যুর পর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করুক। এই কথা শুনে মাতাল যুবক সম্পত্তি হারাবার ভয়ে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বৃদ্ধার উপর আক্রমণ শানাল। চিৎকার করে বললো— সেই সুযোগ আমি তোমাকে দেব না, তার আগেই তোমাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব। এই বলে কোথা থেকে একটা ধারালো ছুরি এনে বৃদ্ধা-কে মারতে গেল। অল্প বয়সী মহিলাটি বৃদ্ধা ও যুবকের মাঝখানে এসে বাধা দিতে গেলেই যুবকটি অল্প বয়সী মহিলার পাঁজরের নীচে ছুরি বসিয়ে দিল। মহিলাটি একবার চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। বৃদ্ধা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চিৎকার করে বললেন, তোর' কীর্তি, সকালটা হতে দে, আমি সবাইকে জানিয়ে দেব, কতোয়ালিতে নালিশ করবো, তোকে গারদের ঘানি টানাব। তুই পার পাবি ভেবেছিস? কথাগুলো বলতে বলতে, মেঝের উপর পড়ে থাকা মহিলাকে তুলতে গেল। যুবকের মাথায় তখন খুন চেপে গেছে। তাছাড়া তার আসল লক্ষ্য অল্প বয়সী পরিচারিকা নয় ওই বৃদ্ধা। সে ছুরি হাতে বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, পার তুমিও পাবে না বুড়ি, আমি এই মুহূর্তে তোমাকে আল্লার দোরে পৌঁছে দেব। এই বলে ছুরিটা বৃদ্ধার তল পেটে ঢুকিয়ে দিলো। এবং বৃদ্ধা বিকট স্বরে চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

তীব্র চিৎকারে সোমনাথের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই সে মনে করতে পারছিল না সে কোথায় আছে। স্বপ্নের ঘোরে সে ভাবলো বৃদ্ধার বাড়ির মধ্যে আছে। একটু ধাতস্থ হয়ে সে দেখল, যে শতরঞ্চি পেতে শুয়েছিলো সেটি

হাওয়াতে গুটিয়ে গেছে। কোথা থেকে শুকনো পাতা পড়ে ব্যালকুনি অপরিষ্কার হয়ে আছে। সোমনাথের শরীরে বালি কিচ কিচ করছে। চাঁদের আলো অনেকটা কমে এসেছে। একটা প্যাঁচা চিৎকার করে ডেকে উঠলো, মুহূর্তের মধ্যে একটা বাদুড় ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে তার কানের পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গেল। রীতিমতো ভৌতিক ব্যাপার, কিন্তু সোমনাথ তো ভূত বিশ্বাস করে না। তার ধারণা মানুষ নিজের প্রয়োজনে ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। সে হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল রাত আড়াইটে বাজে। এখনো তাকে অনেকক্ষণ ঘুমুতে হবে, এই ভেবে উঠে দাঁড়িয়ে শতরঞ্চিটা ঠিক করে পাততে গেল। কিন্তু কিছুতেই সে শতরঞ্চিটা ঠিক করে পাততে পারছে না, মনে হচ্ছে কে যেন শতরঞ্চিটা টেনে ধরে রাখছে। সোমনাথ থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো ব্যাপারটা কি! হঠাৎ মনে হলো ওর পিছনে কে যেন দাঁড়িয়ে। সোমনাথ দ্রুত গতিতে যেই ঘুরে দেখতে গেল, অমনি তার পিছন থেকে একটা ছায়া মূর্তি সরে গেল। সোমনাথ ভাবলো সে কোনো ধান্দাবাজি চক্রান্তে পড়ে গেছে। আগে যারা এখানে এসে রাত কাটিয়েছে, প্রত্যেককে ভয় দেখিয়ে হয়ত নিজেদের কার্য সিদ্ধি করেছে। সোমনাথ চিৎকার করে বলল, ভুল করছ, আমাকে বোকা বানাতে পারবে না। সাহস থাকে তো সামনে এসে দাঁড়াও। মাঝ রাতে শুনশান অট্টালিকাতে তার চিৎকার তার কাছে বিভীষিকা হয়ে ফিরে এলো। সেই শব্দে প্যাঁচা, বাদুড়, চামচিকা এমন বিকট শব্দে ডেকে উঠলো যে একটা ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি হলো। সোমনাথের শরীরটা কেমন ভারী হয়ে উঠলো। একটা অস্পষ্ট ছায়া মূর্তি তাকে যেন ব্যাল্‌কনি থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে চাইছে। সোমনাথের ভূত সম্পর্কিত অবিশ্বাস আস্তে আস্তে কমতে থাকলো, আর ভুতের ভয় মনে গেড়ে বসতে শুরু করলো। মনের সাথে সে আর যুদ্ধ করতে পারছে না। তবুও আত্মবিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতেও পারছে না। সে ছায়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলল, কেন আমায় হিপ্নোটাইস করার চেষ্টা করছ, কি চাও তুমি? এর আগেও তুমি রাতে যাদের একা পেয়েছ তাদেরকেও ভয় দেখিয়েছো। এই কথা শুনে, কর্কট, ভয়ঙ্কর ভয়াল স্বরে দৈব বাণীর মতো ছায়া মূর্তি বললো, ভুল শুনেছ, আমি কটি কথা বলতে চেয়েছি। তারা ভয় পেয়েছে। ছায়া মূর্তি কথা বলতে বলতে দোতলা থেকে নেমে বাগানের পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো— রোকেয়া বিবি আর আমাকে মনছুর খুন করে পশ্চিমের ঘরে পুঁতে রেখেছে। আমাদের আত্মার আজও মুক্তি হয়নি। চেতন ও অবচেতনের মধ্যে দিয়ে সোমনাথের চিন্তা ভাবনা কাজ করছে। অনেকটা ঠিক

ঘুমের ঘোরের মতন। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের গোলোক ধাঁধায় পড়ে সোমনাথ বললো, এ সব মিথ্যা, হতেই পারে না। প্রেত আত্মা রেগে গিয়ে চিৎকার করে বললো, না মিথ্যা না। এত ভয়ঙ্কর সেই আওয়াজ যে সোমনাথের শরীরে শিহরণ খেলে গেল, এবং সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

সমস্ত ঘটনা শুনে উপস্থিত অনেক বয়স্ক মানুষ যাঁরা পোড়ো বাড়ির ইতিহাস অল্প বিস্তর জানেন তারা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দা ঠাকুর খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন তারপর নিজের মনে বলে উঠলেন— একটা বিস্মৃত ইতিহাস আজ একশো বছর পর উন্মোচিত হল। ততক্ষণে গ্রাম প্রধান জাকির হোসেন এসে পড়েছেন। জাকির সাহেব দা ঠাকুরকে খুবই সম্মান করেন। তিনি দা ঠাকুরের কাছে সংক্ষেপে সব শুনলেন, এবং পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা আলোচনা করে নিলেন।

খবর দেয়া হলো থানায়, হসপিটালে। ঠিক সেই সময় ভিড়ের মধ্য থেকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক দাবি করে বসলেন তিনি নাকি মির খোদাবক্সের বংশধর। দা ঠাকুর শুনে বললেন, আপনার নাম কি? তিনি বললেন, মির করিমবক্স। দাঠাকুর বললেন, সত্যি মিথ্যে যাই হোক আমার সাথে যোগাযোগ রাখবেন।

থানা থেকে পুলিশ এসে ভিড় সরিয়ে কুটিরের সামনেটা ফাঁকা করে ফেললো। হসপিটাল থেকে ডোম এসে গাইতি, কোদাল নিয়ে কুটিরের মেঝে অতি সাবধানতার সাথে খুঁড়তে শুরু করলো। বেশি খুঁড়তে হলো না। কারণ মির মনছুর যখন মৃতদেহ লুকিয়ে ছিল তখন সে মেঝেতে মৃতদেহ রেখে তার উপর বালি সিমেন্ট ঢেলেছিলো। যাই হোক দুটি কঙ্কাল এক সাথে বেরিয়ে আসলো। এমন ভাবে কঙ্কাল দুটি ভেঙেচুরে আটকে ছিল যে মনে হচ্ছিল একে অপরকে বাঁচাতে একই সাথে প্রাণ ত্যাগ করেছে। দুইটি কঙ্কালের মধ্যে একটি গলায় একটা চেন সহ লকেট পাওয়া গেলো। লকেটটিতে নাম খোদাই করা আছে, সেটা পরিস্কার বোঝা না গেলেও সম্ভবত কঙ্কালটি রুকসানা বিবির।

গ্রাম প্রধান জাকির হোসেনের উদ্যোগে এবং গ্রামের গণ্যমান্যদের তত্ত্বাবধানে মিলাতের আয়োজন করা হলো। মুর্শিদাবাদের বড়ো মসজিদ থেকে মৌলবী আসলেন, দা ঠাকুর স্বঘোষিত বংশধর করিমবক্স-কে ডেকে নিলেন। তারপর রুকসানা বিবির জন্ম ভিটেতে নতুন করে কবর খুঁড়ে, মুসলিম শাস্ত্র মতে রুকসানা বিবি ও তার ছায়া সঙ্গী রোকেয়া বিবিকে গোর দেয়া হলো।

একশো বছরের ইতিহাসের আকাঙ্ক্ষিত পরিসমাপ্তি ঘটলো, এবং তার সাক্ষী থাকলো জামালপুর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ। শোনা যায় এরপর থেকে আর ওই পোড়ো বাড়িতে কোনো ভূতের উপদ্রব হয়নি। ❑

কে ওখানে?

ভাই সামান্য কিছু মাল, দোতলায় একটু তুলে দিও। কিছু বকশিস দিয়ে দেব।

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, ওরফে দেবু চক্রবর্তী, ভীষণ মিতব্যয়ী মানুষ। যৌথ পরিবার ভুক্ত ছিল, কিন্তু মতের অমিল হওয়ায় বাড়ি ছেড়ে চলে আসে। গ্রাম কেন্দ্রিক অফিস, অফিস থেকে পাঁচ সাত কিলোমিটার ভিতরে এক মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে এই বাড়িটির সন্ধান পেয়েছে। বিঘা খানিক জমির উপর বিশাল একটা দুই তলা বাড়ি। উপর নীচে মিলিয়ে ছোট বড়তে গোটা দশেক ঘর আছে। চুন সুরকির বাড়ি, নিশ্চয়ই অনেক পুরোনো হবে। তা হোক, তাতে দেবুর কিছু যায় আসে না। বাড়িটি যে জলের দামে পেয়ে গেছে। আজকের দিনে যা ভাবাই যায় না। উপরি পাওনা হলো ব্যবহৃত ঘরগুলো ফার্ণিশড, ফলে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র ভ্যানে করে এনেই কাজ মিটিয়ে নিয়েছে।

রেখা অর্থাৎ দেবুর স্ত্রী, সমস্ত বাড়িটি ঘুরে ঘুরে দেখছে। দেবু কেনার আগে এসে সব কিছু ভালো করে দেখে গেছে। এখন সে কতটা লাভ করেছে তা সরজমিনে স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। চারটি ঘরে খাট, আলমারি, বড়ো ডাইনিং এ ডাইনিং টেবিল, আট খানা চেয়ার দক্ষিণ খোলা প্রায় চল্লিশ বাই পনেরো ফুটের বিশাল বারান্দা, সেখানে একটা দামি কাঠের রকিং চেয়ার আছে। আরো অনেক কিছুই আছে, কিন্তু ইলেক্ট্রিক নেই, হ্যারিকেনই ভরসা। দুই তলায় অ্যাটাচ বাথরুমের পাশে একটা ঘর আছে যাতে এক পেল্লাই তালা ঝোলানো। দেবু বলল এই ঘরটা নাকি প্রথম থেকেই তালা লাগানো। প্রয়োজন না পড়ায় কেউ এটাকে খোলে না। রেখা এতক্ষণ চুপচাপ দেখে যাচ্ছিল, তার একেবারেই পছন্দ হয়নি। চারদিকে বাগান, কাছাকাছি কোনো মানুষজন নেই। একটু বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, শুধু দামটাই দেখলে, বেবিকে নিয়ে তিনটি প্রাণী, এত বড় বাড়ি কি হবে? এত একটা ভুতুড়ে বাড়ি! কথাটা শেষ হতে না হতেই অন্য একটা ঘর থেকে আওয়াজ এলো ট-ক্কো, ট-ক্কো, ট-ক্কো। দেবুর চোদ্দ বছরের মেয়ে বেবি চমকে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরলো। রেখাও ভয় পেয়ে গেল। টিকটিকি তো নয় তবে কোনো প্রাণী সত্যের প্রমাণ দিলো! প্রথমে দেবুও একটু ঘাবড়ে তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ও কিছু না, তক্ষকের ডাক, পুরোনো বাড়ি তো কড়ি বর্গার ফাঁকে ফাঁকে তক্ষক থাকে। স্ত্রী মেয়েকে বোঝাল বটে কিন্তু

তার নিজের মনে দুটো খটকা থেকে গেল–এক, তক্ষক তো দিনে বেলায় ডাকে না, দুই, তক্ষক তিন বার নয় আট থেকে দশ বার ডাকে।

দিন চারেক পর—

দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে দেবু ভাবল রকিং চেয়ারে শরীরটা একটু এলিয়ে দেবে। কিন্তু চেয়ারে বসে দোলা খেতে গিয়ে দেখল, চেয়ারটা রক করছে না, মনে হচ্ছে কেউ যেন ধরে রেখেছে। দেবু দেখার চেষ্টা করছে কোথায় বাধা পাচ্ছে। হঠাৎ দেবু শুনতে পেল যাঁর চেয়ার তিনি হয়তো বসতে দিতে চাইছেন না। সে ভাবল, স্ত্রী বিদ্রুপ করলো। চেয়ার ছেড়ে রান্না ঘরে গিয়ে দেখল স্ত্রী আপন মনে বাসন মাজছে। দেবু বলল, তুমি কি কিছু বললে? রেখা বললো, কই না তো! মেয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছে।

দুই দিন পর—

রাতে শোয়ার সময় চোদ্দ বছরের বেবি বললো, মা আমি তোমাদের কাছে ঘুমাবো। দেবু অবাক হয়ে বলল, সে কি বেবি তুমি তো রাত্রে একাই ঘুমাও!

— না বাবা আমার খুব ভয় করছে?

— কিসের ভয়? (বাবা অভয় দেন)

— জানো বাবা, আমাদের মিনি এখানে এসে কেমন হয়ে গেছে।

— কেন সে কি করেছে?

— সব সময় যেন আড়ষ্ট হয়ে থাকে, আর কাউকে দেখে যেন ল্যাজ পাকিয়ে গরগর শব্দ করতে থাকে। অথচ আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা।

রেখা বিছানা করতে করতে বিরক্ত হয়ে বলল, দূর দূর এখানে কি মানুষ বাস করতে পারে? রেখার মুখের কথা শেষ না হতেই ট–ক্কো, ট–ক্কো, ট–ক্কো করে তক্ষক ডেকে উঠলো আট বারের জায়গায় তিনবার।

তারও দুই দিন পর—

মাঝ রাতে একটা শব্দে রেখার ঘুম ভেঙে যায়। দেবুকে জাগিয়ে তুলে ভয়ার্থ কণ্ঠে বলে, শব্দটা কোথা থেকে আসছে বলতো? দেবু ঘুম চোখে আওয়াজটা বোঝার চেষ্টা করল। পুরোনো বাড়িতো নিশাচর পাখির ডাক টাক হবে হয়তো চোখ বন্ধ করে কথাটা বলে রেখাকে অন্য মনস্ক করার চেষ্টা করল। 'ক্যাঁচ' 'ক্যাঁচ' করে আওয়াজটা বেশ কয়েক বার হলো। ঠিক যেন পুরোনো রকিং চেয়ারে কেউ দোলা খাচ্ছে। 'ক্যাঁচ' 'ক্যাঁচ' শব্দ থেমে 'থপ' 'থপ' পায়ের শব্দ শোনা গেল। মনে হলো কেউ যেন রকিং চেয়ারে বসেছিল সেখান থেকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে বাইরের দিকে চলে গেল। দেবু কিছু একটা অনুমান করল তো

বটেই মুখে বলল, নিশুতি রাত, এত বড় বাড়ি, কোথায় কি আওয়াজ হচ্ছে খেয়াল না করে ঘুমানোর চেষ্টা করো। পায়ের আওয়াজটা আবার শোনা গেল, এবার বাইরে থেকে ভিতরে আসার শব্দ, দরজা খুলল,এবং শব্দটা বাড়তে থাকল। রেখা দেবুর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলো।

রাতে রেখা ও দেবু কারোরই ভালো করে ঘুম হয়নি। রেখা কড়া করে দুই কাপ চা এনে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকা দেবুকে ডেকে তুললো। তারপর চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে দেবুকে বললো, চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই। এই জায়গাটা আমার একদম ভালো লাগছে না। জানতো সন্ধ্যার পর থেকে সামনের খামারে একটি লোককে আমি ঘোরাঘুরি করতে দেখেছি। দেখলাম লোকটি ধীরে ধীরে ঘোরাঘুরি করছে আবার চোখের নিমিষে কোথায় উধাও হয়ে গেল। দেবু প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য বললো, বাজারে যেতে হবে তো? দুশ্চিন্তা যে দেবুর ও বাড়ছে না তা নয়। কিন্তু চলে যাওয়ার কথা বলা যতটা সহজ, বাস্তবায়িত করা অতটা সহজ নয়।

অথএব কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়াটাই বুদ্ধি মানের কাজ।

সকাল নয়টা—

অনেক ঘরের মধ্যে একটা ঘরে বসে বেবি দুলে দুলে উচ্চ স্বরে পড়ছে আর শুনতে পাচ্ছে রকিং চেয়ারটা তালে তালে 'ক্যাঁচ' 'ক্যাঁচ' করে আওয়াজ হচ্ছে। রেখা বেবিকে টিফিন খেতে ডাকলো। বেবি সাড়া দিয়ে বারান্দা হয়ে রান্না ঘরে আসছিল। সে দেখল বাবা রকিং চেয়ারে বসে দোলা খাচ্ছে। কিন্তু রান্না ঘরে এসে দেখে বাবা অফিসে যাবে বলে ভাত খাচ্ছে, যেটা বেবির কাছে অসম্ভব মনে হওয়ায় সে বলল, বাবা তুমি তো রকিং চেয়ারে বসে দোলা খাচ্ছিলে, খেতে এসে বোসলে কখন? দেবু এক লাফে খাওয়া ছেড়ে উঠে বারান্দাতে গেল, এবং দেখতে পেলো রকিং চেয়ারটি মানুষ বিহীন রক করছে, যেন সদ্য কেউ চেয়ারটি ছেড়েছে।

দেবু ভূত বিশ্বাস করে না। কিন্তু যা দেখছে সবই কি চোখের ভুল! দুশ্চিন্তা মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। বাড়িতে স্ত্রী ও ছোট বাচ্চাকে রেখে অফিসে যেতে হয়! ভাবলো বাড়িটা সম্পর্কে এলাকায় ভালো করে খোঁজ খবর নেয়া উচিত ছিল।

হ্যারিকেনের আলো বলে দেবুরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে। আজ দেবুর মনটা ভালো না থাকায় একটু আগেই দেবু মেয়েকে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। রেখা তখনো সংসারের সব কাজ সেরে উঠতে পারেনি। চারদিক নিকষ কালো অন্ধকার।

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে পেঁচা, বাদুড়ের কর্কশ রব শোনা যাচ্ছে। এই তিনটি প্রাণী ছাড়া এ তল্লাটে আর জন মনিষ্যি নেই। মনে মনে স্বামীর উপর খুব রাগ হয়। মনে মনে বলে ওকেই ভূতে পেয়েছে, তা না হলে এই রকম ভুতুড়ে বাড়িতে এসে ওঠে! হঠাৎ রেখা শুনতে পেল, বেবি, দরজা খোল, ঠিক যেমন দেবু অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বেবিকে খিড়কির দরজা খুলে দিতে বলে। রেখার শরীরটা ভার হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখল বেবি বিছানা থেকে উঠে খিড়কির দরজার দিকে যাচ্ছে। বেবি যখনই দরজার ছিটকানি খুলতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে রেখা গিয়ে বেবির হাত চেপে ধরে বলল, ডাকটা আমিও শুনেছি। তারপর আঙ্গুল তুলে বেবিকে দেখালো বিছানাতে বাবা অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

পরদিন সকালে—

বেবি তখন ঘুম থেকে ওঠেনি। দেবু সকাল সকাল সেভ করছে আর গত রাতে বেবিকে নিয়ে ঘটা ঘটনার সাতপাঁচ ভাবছে ফলে একটু অন্য মনস্ক হয়ে ছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ রেখা পেছন থেকে এসে মুদি খানার মাল পত্র আনতে হবে বলে ওঠে। এবং অন্য মনস্ক থাকার জন্য দেবু চমকে ওঠে। হাতের রেজারটা নড়ে যাওয়ায় নিচের মাঝ ঠোঁটের তলায় ব্লেটে কেটে যায়। আয়নাতে দেবু দেখলো, রক্ত বেরিয়ে চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি সেভটি রেজারের বাক্স থেকে দেবু ফিট্‌কিরিটা বার করলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষতস্থানে ফিটকিরি লাগাতে গিয়ে চমকে উঠলো, মৃদু যন্ত্রণা আছে, অর্থাৎ ক্ষতস্থান আছে কিন্তু এক ফোঁটাও রক্ত নেই। রেখা স্তম্ভিত, এও কি সম্ভব! দেবু রেখাকে বোঝালো, রক্ত সাবানের ফ্যানায় মিশে গেছে। নিজেকে কিন্তু বোঝাতে পারলো না।

দেবু বসে মুদিখানার লিস্টটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। রেখা এক কাপ চা দেবুর সামনে রেখে বললো, লিস্টের সব মুদি মশলাই আনতে হবে। দেবু কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে বললো, ওরে বাবা! এ যে ভীষণ গরম। তারপর

কাপ রেখে বললো, তাইতো মুদি খানার লিস্টটা দেখছি, কতবড়ো ব্যাগ নেব। এরই মধ্যে বেবি ঘুমোতে ঘুমোতে মা বলে চিৎকার করে উঠলো। দেবু রেখা ছুটে বেবির ঘরে গেল। বেবি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, আমি স্বপ্ন দেখলাম মেনি একটা মানুষের সাথে লড়াই করছে। কথাটা শেষ হতে না হতেই মেনি ঘরে ঢুকলো মুখে তার রক্ত লেগে। রেখা দেবুকে দেখাতেই দেবু ঘটনাটা হালকা করতে বললো, মনে হয় ইঁদুর খেয়েছে। কিন্তু দেবু জানে মিনি কাঁচা মাংস খায়

না। দেবু চা খেতে চলে এলো। রেখা কিছু বলবে বলে দেবুর পিছু পিছু এলো। এসে দেখলো কাপে চা নেই, নেই তো নেই একেবারে তলানি পর্যন্ত নেই। রেখা বললো, তুমি কি-গো, অতো গরম চা তুমি কি ঢকঢক করে খেয়েছো? দেবু ফ্যাকাশে হেসে মনে করার চেষ্টা করতে থাকলো, কখন সে চা খেয়েছে।

ব্যাগ হাতে নিয়ে দেবু চলেছে শান্তি ঘোষের মুদিখানায়। কিন্তু মনে তার শান্তি নেই। কি যে সব ঘটে চলেছে যার মাথা মুন্ডু দেবু কিছুই বুঝতে পারছে না। সস্তার তিন অবস্থা প্রবাদটা তার কাছে খুব প্রাকটিক্যাল মনে হলো। বছর তিরিশ বয়সের শান্তি ঘোষের গ্রাম্য একটা মুদির দোকান, অনেকটা চায়ের দোকানের মতো। দোকানের সামনে প্রশস্ত জায়গা, দুটো মাঝারি সাইজের বেঞ্চ পাতা আছে। দোকানের অল্প বিস্তর ভিড় সরিয়ে দেবু দোকানদারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। শান্তি ঘোষ নতুন খদ্দের আর হাতে লম্বা লিস্ট দেখে এক গাল হেসে বললো, দিন, লিস্টটা দিন (দেবুর হাত থেকে লিস্টটা নিয়ে) আর ওই বেঞ্চে গিয়ে বসুন, আমি মাল রেডি করে আপনাকে ডেকে নেবখন। দেবু একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল। শান্তি ঘোষ দোকানের ভিতর থেকে উচ্চ স্বরে বললো, দাদা বিড়ি খাবেন? দেবুকে বলছে বুঝে দেবু বললো, না না ধন্যবাদ, আমার কোনো নেশা নেই। আপনি মালগুলো রেডি করুন।

মুদিখানার দোকান থেকে দেবুর বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। দেড়শো ফুটের মতো লম্বা জমিটার একদম পশ্চিম কিনারায় একটা বেদী করা কবর আছে। কবরের পাশ দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ দোকানের দিকে চলে এসেছে। দেবু এটা জানে, কিন্তু জলের দামে বাড়ি সহ অনেক জায়গা তো, তাই হাফ কাঠার মতো জমিতে কবরটাকে নিয়ে আর মাথা ঘামাইনি। এখানে কোনো গোরস্থান নেই,সব মুসলিমরা মৃত্যুর পর নিজের জমিতে কবর দেয়। দেবু বেঞ্চে বসে চুপ চাপ বাড়িতে ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক ঘটনাগুলো ভাবছিল, এরই মধ্যে সে দেখল কবরের পাশের পায়ে চলা পথ ধরে এক বৃদ্ধ লাঠি ভর করে দোকানের দিকে আসছে। বৃদ্ধ কাছাকাছি আসতে দেবুর মনে হলো বেশ খানদানী মুসলমান হবে। পরনে দামি লুঙ্গি, জড়ির কাজ করা দামি ফতুয়া, মাথায় বাদশাহী সাদা টুপি, হাতে বেতের লাঠি যার হ্যান্ডেলটি হরিণের সিং দিয়ে তৈরি। একেবারেই কাছাকাছি এসে পড়ায় দেবু একটু অন্যদিকে তাকিয়ে বসে থাকলো।

— বাবু, আমি কি এখানে একটু বসতে পারি? (বৃদ্ধ এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো)

— হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চই বসুন না। (দেবু একটু সরে বসলো)

— (বসতে বসতে) বাবুর এ গ্রামে মনে হয় নতুন আসা হয়েছে?

— হ্যাঁ, ওই বাড়িতে এসে উঠেছি। (নিজের বাড়িটা দেখিয়ে)

— বাড়িটা কি কিনেছেন, না ভাড়া—?

— না না, কিনেই এসেছি।

— তা বেশ করেছেন, কিন্তু কেনার আগে এলাকায় বাড়িটার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছিলেন কি?

দেবুর একটু খটকা লাগলো, সত্যিই তো সে কোনো খোঁজ খবরই নেয়নি। ভাবলো বৃদ্ধ মানুষ বাড়ি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানবে হয়তো। সেই জন্য একটু আমতা আমতা করে বললো না মানে হঠাৎ ই—

— বুঝেছি, সস্তায় পেয়েছেন আর সাতপাঁচ না ভেবে কিনে নিয়েছেন।

— হ্যাঁ, সেই রকমই—

— একবার ভাবলেন না, আজকের দিনে বাড়ি সহ এতটা জমি কেন এত সস্তায় হলো! এই বাড়ি আগেও কয়েকজন কিনেছে, কিন্তু বসবাস করতে পারেনি।

দেবু একরাশ কিউরিওসিটি নিয়ে প্রশ্ন করলো— কেন?

গোঁফহীন ছুঁচল দাড়ি বেষ্ঠিত মুসলিম মিঞা সাহেব মুচকি হেসে বললেন, কেন আপনি কিছু বুঝতে পারেননি? নাকি আমার কাছ থেকে আবার জানতে চাইছেন? দেবু মিঞা সাহেবের মুখের দিকে অসহায় ভাবে চেয়ে থাকে।

মিঞা সাহেব মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর শুরু করলেন পুরনো বাড়ির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—

ওই বাড়িটা তৈরি তরফদি মোড়ল নামে এক ব্যক্তির। উনি ছিলেন তখনকার সময়ে জমিদার। তাছাড়াও এই এলাকার বিচার ব্যবস্থার ভার তাঁর উপর ছিল। সেই জন্য এতদ অঞ্চলে তিনি মোড়ল নামেই খ্যাত ছিলেন। ভীষণ সৌখিন মানুষ ছিলেন। ওই বাড়িতে গিয়ে সেটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন। ঊনিশশো পাঁচ ছয় সালে যখন মানুষ মাঠে ঘাটে প্রাতঃকর্ম সারত, সেই সময় তিনি দুই তলায় শোয়ার ঘর লাগোয়া পায়খানা, স্নানের ঘর তৈরি করেছিলেন। নিশ্চয়ই দেখেছেন, বড়ো বারান্দায় একটা দামি কাঠের দোলা খাওয়া চেয়ার আছে। ওই চেয়ারে বসে তিনি দোলা খেতেন। ওনার কঠোর নির্দেশ ছিল, ওই চেয়ারে তিনি ছাড়া অন্য কেউ বসতে পারতো না। বাড়িতে ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে ঘরের মানানসই আসবাবপত্র তৈরি করিয়েছিলেন। ওই বাড়ি ছিল তাঁর প্রাণাধিক। তরফদি মোড়লের চারটি জোয়ান ছেলে ছিল, তারা কখনো আব্বার

কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সব ঠিকঠাকই চলছিল, গোল বাঁধল ভারত ভাগ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলে দলে হিন্দুরা এপারে আসতে থাকলো, আর এখানকার মুসলমানরা জমি বাড়ি জলের দামে বিক্রি করে চলে যেতে থাকলো ওপারে। সেই সময় তরফদি মোড়লের চার ছেলে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়ার মনস্থ করলো। এদিকে তরফদি মোড়ল জন্মভিটে পরিত্যাগ করতে একেবারেই নারাজ। ছেলেরাও নাছোড়বান্দা, অবশেষে তরফদি মোড়লকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শখের ভিটে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। পাকিস্তানে যাওয়ার আগে তিনি তাঁর শেষ ইচ্ছাটি কবুল করেছিলেন, যেন মৃত্যুর পর তাঁকে এই ভিটেতে কবর দেওয়া হয়। ছেলেরা তাই করেছিল, ওই সেই কবর (জমির পশ্চিম কোণে অবস্থিত কবরটি দেখিয়ে)। তবে এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় তাড়াহুড়োতে গুছিয়ে নেওয়া সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে যেতে পারেননি। পরে সুবিধা মতো নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। যারা এই বাড়ি কিনেছিলেন তারা সেই গোছানো মালপত্রগুলো একটা ঘরে রেখে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। শুনেছি ঘরটি নাকি এখনো তালা লাগানো অবস্থায় পড়ে আছে। তরফদি মোড়ল নিজের একটা তৈলচিত্র আঁকিয়ে ছিলেন, সেটি সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বলে একটা চাদরে তৈলচিত্রটি মুড়ে একটা টিনের বাক্সে ভরে নিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেটাও নিয়ে যাওয়া হয়নি, বাক্সবন্দি হয়ে ওই ঘরেই পড়ে আছে। এই ভিটের উপর অত্যধিক মোহের বশবর্তী হয়ে তরফদি মোড়লের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়। তিনি চান না কেউ এই বাড়ি ভোগদখল করুক।

শান্তি ঘোষ দোকানের ভিতর থেকে উচ্চ স্বরে বললো—

দাদা, আপনার মাল রেডি।

হ্যাঁ, যাচ্ছি বলে মিঞা সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে দোকানের খড়ের চালায় গিয়ে ঢুকলো। শান্তি ঘোষ মালপত্র বুঝিয়ে দিতে দিতে দেবুকে প্রশ্ন করলো— দাদা, মনে হচ্ছে আপনি খুব টেনশনে আছেন? দেবু এক রাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে বললো, তা আছি ভাই, এই বাড়িতে এসে উঠা অবধি একের পর এক যা সব ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে আমি পাগল হয়ে যাবো। তারপর এই মিঞা সাহেবের কাছে এখন যা শুনলাম তাতে আমি কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। শান্তি ঘোষ রীতিমতো অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, এখন, এখন কোন মিঞা সাহেবের সাথে কথা বললেন? আরে এইতো বেঞ্চে বসে, গায়ে ফতুয়া মাথায় সাদা টুপি পরা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাথে— কোথায় আপনি তো

আপন মনে কথা বলে যাচ্ছিলেন! দেবু বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখে মিঞা সাহেব নেই, দোকান থেকে বেরিয়ে এসে দেবু এদিক ওদিক ভালো করে দেখল। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলো না। শান্তি ঘোষের কথাটা শুনেই ভূত বিশ্বাস না করা দেবু চক্রবর্তীর শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। বাড়িতে মেয়ে, স্ত্রীর কথা মনে পড়তেই এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে দোকানের হিসাব মিটিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে চললো।

রেখা দুপুরের রান্নার কাজে ব্যস্ত, বেবি নিজের ঘরে আপন মনে পড়ছে। হন্তদন্ত হয়ে দেবু ঘরে ঢুকে হাতের ব্যাগ দুটো রেখেই তালা বন্ধ ঘরের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল। রেখা দেবুর এই অপ্রত্যাশিত আচরণ দেখে নিজের কাজ ফেলে দেবুর পিছু নিলো। দেবু মরচে ধরা তালাটা ধরে একটু টানাটানি করলো, তারপর একটা শাবল গোছের লোহার রড খুঁজে নিয়ে এসে বন্ধ ঘরের ইউ আকৃতি ছিটকানির মধ্যে রডটা ঢুকিয়ে দিলো এক চাপ। সাথে সাথে মরচে ধরা ইউটি ভেঙে দরজা খুলে গেল। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বন্ধ থাকা ঘর খুললে যেমন হয়। মাকড়শার জালে সমস্ত ঘর ভর্তি, জিনিসপত্র যা আছে মোটা ধুলোর আস্তরণ পড়ে তা বোঝার উপায় নেই। দেবু কোনো কথা বলছে না, ধুলো ঝেড়ে কিছু যেন খুঁজছে। হঠাৎ রেখার মনে হলো কেউ যেন ওর পিছনে দাঁড়ির আছে। মেয়ে ভেবে ফিরে তাকাতেই কাউকে দেখতে পেলো না। ভয়ে রেখার শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল, কে দাঁড়িয়েছিল? তবে কি—! হঠাৎ ট-ক্কো, ট-ক্কো, ট-ক্কো তক্ষকের ডাক। রেখা ছুটলো মেয়ের ঘরে। মেয়ের ঘরে ঢুকতেই বেবি ভয়ার্ত চোখে বললো, মা, বাবা কি এক্ষুনি এই ঘরে এসেছিল?

এদিকে দেবু উদভ্রান্তের মতো মাকড়শার জাল সরিয়ে,ধুলো ঝেড়ে অবশেষে খুঁজে পেল একটা টিনের বাক্স। তালা বিহীন বাক্সটা খুলতেই ভিতরে চাদরে মোড়া কিছু একটা আছে বোঝা গেল। মিঞা সাহেবের কথা মতো চাদরের মোড়কটা খুলে দেবু চমকে উঠল। সারা শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল। শিরদাঁড়া দিয়ে গলগল ঘাম ঝরতে লাগলো। ভয়ে আতঙ্কে বধির হয়ে গেল। এতো খানিকক্ষণ আগে কথা বলে আসা মিঞা সাহেব তরফদি মোড়লের ছবি। ❑

ফুলমনির আখ্যান

(প্রথম পর্ব)

''বাবু ছাপ এখানে আসেন, করোনা চা হবেক বটে শীর্ণ,'' মলিন দেহ মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মনে একটু আশা নিয়ে আমাদের ডাকলো। আমরা আজ সকালে এসে পৌঁছেছি পশ্চিম বর্ধমানের এক রিমোর্ট অঞ্চলে, গ্রামটির নাম সরপি। কাঁকুরে মাটির অঞ্চল, উঁচু নিচু কাঁকুরে রাস্তা। একটি বড় রাস্তা দুর্গাপুর থেকে সরপির উপর দিয়ে অন্ডাল বিমান বন্দরের দিকে চলে গেছে। এদিকটায় শুধু আগাছা আর ইউক্যালিপটাসের জঙ্গল। বর্তমানে সরপি গ্রামটা একটু উন্নতির মুখ দেখেছে। এখানে একটা স্টেডিয়াম ও একটা ইকো পার্ক আছে। আমরা বিয়ে উপলক্ষে এই ইকো পার্কে বরযাত্রী হয়ে এসেছি। এখানকার বিডিও সাহেব মৃণালকান্তি বাগচীর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ইকো পার্কটি ভাড়া করা হয়েছে। মৃণালবাবু খুবই সজ্জন মানুষ, আমাদের আতিথেয়তা ত্রুটি মুক্ত করতে উনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের তর সইলো না, বেরিয়ে পড়লাম চায়ের খোঁজে। দুই একটা দোকান পেলাম, কিন্তু সবই রেডি মেড দুধ চিনি চা। দুধ চিনি ছাড়া রেড টি–এর সন্ধান মেলা ভার। এরই মধ্যে করোনা চা–এর সন্ধান পেয়ে আমরা চারজন ভাঙাচোরা টিনের শেডের তলায় গিয়ে একটা বেঞ্চে বসলাম।

লবঙ্গ, গোলমরিচ, দারুচিনি, আদা সহযোগে চা–টা মন্দ করেনি। কিন্তু এত ছোট কাগজের কাপে দিলো যে খেয়ে পোষাল না। দোষ চা–ওয়ালার নয়, যে ফ্যাক্টরিতে কাপ তৈরি হয় তাদের। এত ছোট কাপ বানাবার দরকার কি, একটু বড়ো কাপ বানালে আরও দুবার ঠোঁটের স্পর্শ পেত। যাইহোক চা–ওয়ালার নাম বুধন মুণ্ডা, চা তৈরির হাত যেমন ভালো মিশুকেও ততোধিক। নিজের কাজ করতে করতে আমাদের জিজ্ঞাসা করলো, ''বাবু ছাপদের কুথা থেকে আসা হচ্ছে বটে?'' কলকাতা শুনেই বললো, ও বিডিও ছাপের মেয়ের বিয়েতে এসেছেন বটে। বুধন এলাকার খোঁজখবর দিতেও বেশ উৎসাহী। সোমনাথ বললো, বেশ, আর এক রাউন্ড করোনা চা বেকারি বিস্কুট দিয়ে হয়ে যাক, চা আর গল্প একসাথে জমবে ভালো। বুধনও খুশি হয়ে সেকেন্ড রাউন্ড চা দিলো। এবং বাড়তি চাটুকু গ্লাসে ঢেলে খেতে খেতে আমাদের সাথে এলাকার গল্প শুরু করে দিলো।

এই এলাকাতে জনসংখ্যা কম হওয়ায় বাড়ি ঘরও কম। দুই একটা বড় বাড়ি আছে বটে, তবে বেশির ভাগ বাড়ি নিচু নিচু কুঁড়ে ঘর বিশিষ্ট। এতদ অঞ্চল ইসিএল-এর একোয়ার করা। জমি রেজিস্ট্রি টুকটাক হলেও জমির মিউটিশন একদম হয় না। আমরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি কালো হীরের উপর দিয়ে। এইসব অঞ্চলের মাটির নিচে থেকে দুই স্তর কয়লা উত্তোলন হয়ে গেছে। ইসিএল যে কোনো সময়ে তৃতীয় স্তর কয়লা উত্তোলন করতে পারে। যখনই কাজ শুরু করবে ক্ষতিপুরণ দিয়ে এই এলাকা একদম জনশূন্য করে দেবে। কারণ বড়ো বড়ো ধস নেমে বাড়ি ঘর সব খাদে ঢুকে যেতে পারে। এখানকার জনসংখ্যার আশি শতাংশই দেহাতি গরিব সম্প্রদায়। গ্রানাইট পাথর সংগ্রহ, কয়লা খাদানের চোরাই কারবারের সাথে যুক্ত থাকে। সামান্য যা রোজগার হয় কোনো রকমে সংসার চলে, কিছুটা রাখতে হয় সন্ধ্যায় ভাটিখানার জন্য। হঠাৎ পরিমল বুধনকে প্রশ্ন করলো, তোমাদের মধ্যে ডাইন অপবাদ দিয়ে শাস্তি দেওয়ার বিধান আছে না? আছেক বটে, তবে আমাদের এখানে লাই বুললেই চলে। সাঁওতাল পরগনায় হয় বটে। তবে পাঁচ ছ বছর আগে আমাদের এখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল বটে। এই বলে বুধন বিগত দিনের ঘটনা বলতে শুরু করলো।

ফুলমনি ওরাং আর চারকু ওরাং–এর সুখের সংসার। দুই বছরের বাচ্চা পিঠে বেঁধে ফুলমনি কয়লা খাদানে কাজ করে। যা যেটুকু আয় হয় দুবেলা দু মুঠো জুটে যায়। চারকু যা আয় করে সব ভাটিখানায় খরচ করে ফেলে। তাতে অবশ্য দাম্পত্যের সুখ দুঃখে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কারণ স্বামীরা নেশা করে জীবন কাটায়, আর বউগুলো অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোনো রকমে অন্নের সংস্থান করে, এটা ওদের রক্তে আছে। চারকু ওরাং দিনের পর দিন হাঁড়িয়া খেতে খেতে তার লিভার পচিয়ে ফেললো। তাছাড়া খাদানের ধুলো ময়লা নাকে ঢুকে ফুসফুসও ড্যামেজ করে দিলো। পেট ও বুকের যন্ত্রণায় যখন ছটফট করতে থাকলো, তখন সবাই মিলে ওঝার কাছে নিয়ে গেল। বিরাট বিজ্ঞ ওঝা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললো ওকে ডাইনে ভর করেছে। এবং সেই ডাইন আছে তার গ্রামের মধ্যে। চারকু পেটের যন্ত্রণায় মরে মরুক, গ্রামের লোকেরা ওঝার কথা মতো ডাইন খুঁজতে ব্যাস্ত হয়ে পড়লো। গোপনে খোঁজ খবর চলতে থাকলো, গ্রামের কোনো মহিলার আচরণে অস্বাভাবিকতা দেখা যাচ্ছে কিনা। এদিকে চারকুর যায় যায় অবস্থা। আবার হাঁড়িয়ার নেশাও আছে। ফুলমনি শত কষ্টেও চারকুর জন্যে সাধ্য মতো প্রতিদিন হাঁড়িয়া এনে দেয়। ফুলমনি বুঝতেও পারে না যে ভালোবাসার মানুষটাকে সে নিজে হাতে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দিচ্ছে।

চারকু যত মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, ফুলমনি চারকুর পরিণতি বুঝতে পেরে পাগলের মতো হয়ে যায়। পান থেকে চুন খসলেই বছর পাঁচেকের ছেলেটাকে অমানুষিক মারধোর করে। যেটুকু জোটে তাও ঠিক মতো খায় না। ছোট্ট শিশুটির অপুষ্টিতে কঙ্কালসার চেহারা, কেউ কিছু বুঝিয়ে বলতে গেলে অট্ট হেসে বলে, মরুক মরুক বটে, কাউকে বাইচতে হবেক নাই। বলেই আবার উচ্চস্বরে কেঁদে ওঠে। গ্রামের কিছু ছিদ্রান্বেষি মানুষ ভেবে নিলো ফুলমনিই ডাইন হয়েছে। তারা ওঝা এবং মোড়লের কাছে গিয়ে তাদের মতামত জানালো। মোড়ল দলবল নিয়ে চারকুর কুঁড়েতে গিয়ে হাজির। ততক্ষণে সব শেষ। ফুলমনি উচ্চস্বরে কেঁদে চলেছে, দাম্পত্য জীবনের পুরনো স্মৃতির মুহূর্তগুলো মনে করে। ওঝা বললো ওই ডাইন, ওকে না মেরে ফেললে গ্রামে আরো ক্ষতি হবে। ফুলমনিকে মেরে ফেললে ওর বাচ্চার কি হবে, কুসংস্কারাছন্ন মোড়লদের মাথায় সেটা এলো না। ততক্ষণে দলে দলে ভিড় জমিয়ে ফেললো ডাইন দেখার জন্য। কিছু সাঁওতাল শাস্তির বিধান শুনতে অপেক্ষা করতে থাকলো, কারণ তারা শাস্তি দেওয়ায় অংশগ্রহণ করবে। তাদের মাথায় এটাই ঢোকানো হয়েছে, পাপ–কে শেষ করতে পারলে 'পুন্নি' এমনিই হয়। মোড়লরা ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে একটা বিচারসভা বসিয়ে সিদ্ধান্ত নিলো, ফুলমনিকে একচল্লিশ ঘা বেত মারা হবে, যার অর্থ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। চারকুর ডেডবডি যে পচন ধরবে, সে দিকে কারোর কোনো খেয়াল নেই ফুলমনির ডাইন অপবাদ নিয়েই মোড়ল ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এদিকে এই খবর কোনো এক সোর্স থেকে বিডিও সাহেব মৃণালকান্তি বাগচীর কানে পৌঁছালো। খবরটা শুনেই তিনি কাল বিলম্ব না করে পুলিশ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন। উনি পৌঁছেই পুলিশ দিয়ে আগে ভিড় সরালেন তারপর শবদাহের ব্যবস্থা করলেন। ওঝা ও মোড়ল প্রথমে তাদের সিদ্ধান্তে অনড়। মৃণালবাবু, এবং দারোগাবাবু বুঝিয়ে বললেন যে, এগুলো কুসংস্কার, ওরা যদি সময় মতো চারকুকে হসপিটালে নিয়ে যেত তাহলে হয়তো ফুলমনির জীবনটা অন্য রকম হতো। এর পরেও যদি পুলিশের কথা না শোনে তবে পুলিশ আইন প্রয়োগ করবে।

পুলিশের ভয়ে আস্তে আস্তে সব ফাঁকা হয়ে গেল। ফুলমনি তাৎক্ষণিক শাস্তি মুক্ত হলো। স্বামীর মৃত্যু শোকে বিধ্বস্ত ফুলমনি, অপুষ্টিতে জর্জরিত বছর পাঁচেকের শিশুকে নিয়ে ভাঙাচোরা কুটিরে দিন গুজরান করতে থাকলো। এই ভাবে কেটে যায় বছর খানিক। হঠাৎ একদিন সাঁওতাল পাড়ার ভিতরে একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। প্রথম দিকে কেউ ঠিক বুঝতে পারছিল না গন্ধটা কোথা

থেকে আসছে। আস্তে আস্তে গন্ধের তীব্রতা বাড়তে, প্রতিবেশীরা খেয়াল করলো দুর্গন্ধটা আসছে ফুলমনির কুটিরের দিক থেকে। সন্ধ্যা নামবে নামবে এমন সময় ঘটনাটা গ্রামের মোড়লের কানে গেল। মোড়ল আগের অভিজ্ঞতা থেকে একটু সতর্ক হয়ে, ওঝাকে ডেকে নিয়ে ফুলমনির কুটিরে গিয়ে হাজির হলো। কুটিরের কাছে গিয়ে তীব্র দুর্গন্ধের জন্য কেউ দাঁড়াতে পারছিল না। একজন সাঁওতাল যুবক নাকে গামছা বেঁধে ভিতরে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে এলো। তারপর একটু দম নিয়ে বললো ফুলমনি একটা পোটলা মতো কিছু নিয়ে বসে আছে। আধা অন্ধকারে সে বিশেষ কিছু বুঝতে পারল না। প্রতিবেশী এক সাঁওতাল মহিলা জানালো কদিন ধরে ফুলমনির ছেলেকে আর দেখা যাচ্ছে না। মোড়ল ব্যাপারটা অনুমান করে ফেললো। ক্ষেপে গিয়ে বলল, মাগী ডাইন, এবার ছেলেকে খাইছেক বটে। আর তো মেনে লেওয়া যাবেক না বটে। উকে গেরাম ছাড়া করতে হবেক বটে। তারপর চার পাঁচ জন সাঁওতাল যুবক কুঁড়েতে ঢুকে ফুলমনির পচাগলা শিশুকে নিতে গেল। ফুলমনি তো দেবে না, কারণ তার ধারণা তার ছেলে ঘুমিয়ে আছে। বুঝিয়ে বলায়ও তার মন বুঝলো না। কারণ ফুলমনি তখন আর স্বাভাবিক নেই। সে উন্মাদ পাগল। জোর করে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে সাঁওতালরা গেল শ্মশানের দিকে। ফুলমনি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিছু নিলো। পচাগলা দেহ বলে তাড়া ছিল, পয়সারও অভাব তারপর শিশু, ফলে না পুড়িয়ে শ্মশান সংলগ্ন সাঁড়া গাছের জঙ্গলে পুঁতে দিলো। ফুলমনির অলক্ষে পোতা হলো, কারণ দেখতে পেলে মাটি খুঁড়ে শব তুলতে পারে। ফুলমনি ডাইন না হোক পাগল তো হয়েছিল, পরে সে আর গ্রামে ফিরে যায়নি।

ফুলমনিকে ডাইন করার করুণ কাহিনী শুনে সবার মনে এই সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর ভীষণ করুণা হলো, আবার পুরুষদের উপর ততোধিক ক্রোধও হলো। সোমনাথ বললো, এতো রীতিমতো ক্রিমিনাল অফেন্স। ডাইন অপবাদ দিয়ে একটা পরিবারকে শেষ করে দেওয়া হলো! পূর্ব জন্মে অনেক পাপ করলে এই জন্মে গরিব ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মাতে হয়। মৃণালবাবু সাঁওতালদের চিরাচরিত প্রথা থেকে ফুলমনিকে চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি।

তারক বললো, সোমনাথদা এবার ফেরা যাক, আমাদের হয়তো সকলে খুঁজছে। বুধনকে সোমনাথ ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসছে ঠিক তখনই বুধন বললো, বাবু ইখানে একটা মহাশ্মশান আছেক বটে, টুডের বিয়া বাড়ি থেকে একটু দূরে হবেক। সোমনাথ দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক হয়ে বলল, কেন মহাশ্মশান

কেন? চা-এর ছিটা পরিষ্কার করতে করতে বুধন বললো, এক বড়ো সাধুর তৈরি শ্মশান আছেক বটে। এই খগেন ভাই ইদিকে শুনো, এই বলে একজন বাঙালি ভদ্রলোককে ডাকলো। তিনি আসতেই বুধন ওনাকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। বছর পঞ্চাশের ভদ্রলোকের জন্ম এই সরপি গ্রামে। উনি আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানেন। খগেনবাবুর বাড়ি সরপি ছাড়িয়ে ইছাপুর গ্রামে। খগেনবাবু বললেন, রাস্তায় যেতে যেতে আমাদের শ্মশানের জন্ম ইতিহাস বলবেন। আমরা যখন চায়ের ঘুমটি থেকে বার হচ্ছি তখন বুধন মুন্ডা আমাদের সতর্ক করে বললেন বাবু, শ্মশানে সন্ধ্যার পর যাবেন না বটে, উখানে সন্ধ্যার পর কেউ মরা পুড়াইতেও যায় না বটে। বিজ্ঞান মঞ্চের লোক সোমনাথ প্রামাণিক একটু নড়েচড়ে উঠল। একটু অবাক হয়েই বলল, কেন কেন সন্ধের পর শ্মশানে কি হয়? উখানে বাবু শাকচুন্নির কান্না শোনা যায় বটে। একটু ভয়ার্থ মুখভঙ্গি করে বুধন সোমনাথদের বললো।

সোমনাথ একরাশ কিউরিওসিটি নিয়ে বললো, ব্যাপারটা কি একটু খুলে বলুনতো? খগেনবাবু বললেন, চলুন আমি যেতে যেতে সব বলছি।

আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগের ঘটনা। তখন এই সব অঞ্চলে কোনো লোকজনের বসবাস ছিল না বললেই চলে। এই সব অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, গাছে ছিল বড়ো বড়ো হনুমান। আর নীচে ছিল কিছু ছোট ছোট মাংসাশী প্রাণীর আনাগোনা। এই অঞ্চল ছিল বর্ধমানের রাজাদের আন্ডারে। পরে ইংরেজ সরকারের হাতে আসলেও সরকার উন্নতির দিকে তেমন নজর দেয়নি। তাছাড়া কোলিয়ারি অঞ্চল ঘোষিত হওয়ার পর আর কোনো প্রয়োজন আছে বলে সরকার মনে করেনি। যাইহোক যে কথা বলছিলাম, কথিত আছে, এখন যেখানে শ্মশান অবস্থিত, তখন সেখানে গভীর জঙ্গল ছিল। সেখানে পর্ণ কুটিরে বাস করতেন এক কালী সাধক। মানুষ জন সেদিকে বেশি যেত না। আদিবাসী মহিলারা গাছের ফলমূল পেড়ে তাঁর পদতলে রেখে আসত, উনি বেশির ভাগ সময় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। কুটিরের সামনে একটা পুকুর ছিল, তাতেই তিনি স্নান এবং জলপান করতেন। ফলফলারি যা পেতেন তাই আহার করেই দিন অতিবাহিত করতেন। এমন ভাবেই চলছিল। একবার হল কি, ওই এলাকার আদিবাসীদের সর্দারের হলো এক কঠিন ব্যামো। দুই দিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, কিছুই খাওয়ানো যাচ্ছে না, জলও গিলতে পারছে না, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। সমস্যাটা ওঝার বোঝার বাইরে চলে গেল। ওঝা যখন অপারগ, তখন সর্দারের বউ সর্দারকে নিয়ে সাধু বাবার কাছে এসে স্বামীর প্রাণ

ভিক্ষা করলো। ধ্যানস্থ সাধু মানুষের কোলাহলে ধ্যান ভঙ্গ করে উপস্থিত আদিবাসীদের আর্জি শোনেন। তারপর সর্দারের দিকে তাকিয়েই বলেন, তোমাদের সর্দার মারা গেছে, এখন নয় অনেকক্ষণ। শরীর পচন ধরে গেছে, শীঘ্রই অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করো। সূর্য তখন পাটে যায় যায় অবস্থা। শ্মশান বহুদূর জঙ্গুলে পথ, পরদিন সকাল ছাড়া কোনো উপায় নেই। শিশু হলে না হয় জঙ্গলে এক জায়গায় পুঁতে দিত, এখানে তো সে উপায় নেই। তাছাড়া দাহসংস্কারওতো আছে। সাধু বাবা আদিবাসীদের চরম সমস্যাটা উপলব্ধি করলেন। তারপর কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বললেন, তোমরা কোলাহল পরিত্যাগ করো, আমার কুটিরের পূর্ব দিকে তৃতীয় সাঁড়া গাছটির পাশে যে ফাঁকা জায়গাটি আছে ওখানে চিতা সাজাও, দাহর পর নাভি ভস্ম এই পুকুরে ভাসিয়ে বৈতরণী কর্ম সমাধান করো। সেই শুরু হলো দাহ কাজ, আজও চলে আসছে। শোনাযায় প্রচণ্ড গরমে চারদিক যখন খটখটে শুকনো তখন ওই পুকুরে ভর্তি জল থাকতো। সবই যেন সাধু বাবার আশীর্বাদ। যদিও কালের গর্ভে সেই পুকুর মজে বুজে একাকার হয়ে গেছে। শ্মশানের পুরা কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা শ্মশানের কাছে চলে আসলাম।

বিরাট জঙ্গল, একটা পায়ে হাঁটা পথ জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেছে। জঙ্গলে ঢুকতেই একটা নড়বড়ে পাকা ঘর তালা দেয়া আছে, শব আসলে ঘরটি অস্থায়ী অফিস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আলোর ব্যবস্থা না থাকার কারণ জানতে চাইলে খগেনবাবু বললেন সন্ধে নামার পর এখানে আর শব আসে না। পাশেই কালি মন্দির, মা কালীর অবয়বটা ঠিক আমাদের সচরাচর দেখা মা কালীর মতো নয়। একটু আদিবাসীদের দেবতা গোছের। মাতৃরূপ যাইহোক ভক্তিটাই আসল। মাগো করোনার হাত থেকে তোমার ধরাধামকে রক্ষা করো মা। পরিমল হাতজোড় করে উচ্চস্বরে মাকে প্রণাম করে কথাটা বললো। খগেন বাবু জানালেন, কথিত আছে এই মা সেই মা যার সামনে বসে দেড়শ বছর আগে সাধু বাবা সাধনা করতেন। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা ছাউনি করা বেদি। যেখান থেকে আত্মা স্বর্গের পথে পা রাখে। পাশে একটা বড়ো চৌবাচ্চা জলে ভর্তি। খগেনবাবু বললেন, শব আসলে যখন বৈতরণী পার করার জন্য পরলৌকিক কাজ করা হয়, তখন পুরোহিত মশাই চৌবাচ্চার জলে এক শিশি গঙ্গাজল ঢেলে দেন, ব্যাস গঙ্গা প্রাপ্তি হয়ে গেল। সবই তো মন। মানলে শিব, না মানলে শিলা। এবার খগেনবাবু আমাদের জানালেন, বছর পাঁচেক এখানে রাতে কেউ শব দাহ করতে আসে না। কারণ

রাতের অন্ধকারে শ্মশানে এক মহিলা কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীদের ধারণা শাকচুন্নি আধপোড়া শবের লোভ লালসায় শ্মশানে এসে অমন করে। সব শুনে সোমনাথ খগেনবাবুকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন যে যাই বলুক, আপনার নিজের কি মনে হয়? খগেন বাবু চুপ করে থাকলেন কোনো উত্তর দিলেন না। সোমনাথ বললো বুঝলাম, বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে পড়ে গেছেন। আপনিই পারবেন আমাকে সাহায্য করতে। খগেন বাবু অবাক হয়ে বললেন, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না। সোমনাথ একটু হেসে বললো, 'আপনার বাড়িতে বড়ো টর্চ হবে? পাঁচ সেলের টর্চ হবে, কিন্তু কি হবে? খগেনবাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন। সোমনাথ এবার তার প্ল্যানটা বললো, আপনি টর্চটা নিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় ইকো পার্কের গেটের সামনে আসবেন, ওখানে, আমি, তারক রঘু আর পরিমল অপেক্ষা করবো। আপনি আসলে আমরা পাঁচ জনে মিলে শ্মশানে যাবো। তারপর শাকচুন্নির কান্না লক্ষ্য করে আমরা জঙ্গলে ঢুকবো। খগেনবাবু প্রথমে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। অনেক বোঝানোর পর রাজি হয়ে বললেন, দেখি তাহলে বুধন মুন্ডাকে সঙ্গে নিতে পারলে ভালো হবে। খগেনবাবু চলে যেতেই তারক বললো, সোমনাথ বিয়ে বাড়িতে এসেছি, এসব বিষয়ে নাক গলানো কি ঠিক হবে'? সোমনাথ অপরাজেওতার কাঠিন্যতায় বললো, ব্যাস, ধান ছাড়াতে গিয়ে চালে আটকালো, আরে এতগুলো লোক থাকবো, যদি সত্যিই শাকচুন্নি থাকে তো পালাবার পথ পাবে না।

ঠিক সাতটার সময় আমরা চারজন ইকো পার্কের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। খগেনবাবু আর বুধন মুন্ডা একটা পাঁচ সেলের টর্চ নিয়ে সময় মতো চলে এলেন। আমরা ছয় জন অনতিদূর শ্মশানের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

শ্মশানে ঢুকতেই কালী মন্দির পড়ে, বুধন বললো, বাবু এখানে দাঁড়ান বটে, কান্নার শব্দ শুনলে ভিতরে যাবোক বটে। তারক মা কালীকে প্রণাম করে বলল, মা গো পারলে সোমনাথের মাথায় একটু সুমতি সুবুদ্ধি দাও মা। নইলে বিয়ে বাড়িতে এসে কোথায় সেজে গুঁজে ঘুরবো ফিরবো, ভালো মন্দ খাবো তা নয় রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে ঘুরছি ভূত দেখতে। বুধোন ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, সবাই চুপ করেন, কান দিয়ে শুনেন কান্নার আওয়াজ আসছে বটে। আমরা সতর্ক হলাম ভালো করে খেয়াল করলাম সত্যিই জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা কান্নার চাপা আওয়াজ আসছে। আওয়াজটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। আমরা

শ্মশানে ঢুকলাম সামনে সোমনাথ, হাতে হাই পাওয়ার টর্চ লাইট। কানে আসলো খুব কাছেই মহিলা কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ, বলছে, তু কুথায় বাপ মুর কাছে আয় বটে। সোমনাথ আওয়াজ লক্ষ্য করে টর্চ মারতেই আমরা পরিষ্কার দেখলাম জঙ্গলের মধ্যে ধূসর রঙের কি যেন একটা সরে গেল। সোমনাথ টর্চের আলো ফেলে দ্রুত পায়ে খানিকটা এগিয়ে গেলো, কিছু না দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললো, এই কে তুমি? বেরিয়ে এসো। আমাদের ভয়ে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। সোমনাথের চিৎকারে শ্মশানের মধ্যে একটা বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি হলো। পেঁচা বাদুড়গুলো এমন ভাবে ডেকে উঠলো যে আমাদের শরীরের রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেল। কান্নার আওয়াজ কিছুক্ষণ থেমে আবার শুরু হলো। আমাদের সেনাপতি সোমনাথ বললো সামনের ঐ ঝোপের আড়ালে নিশ্চয়ই আছে। সে ছুটে সামনের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমরা ভয়ে পড়িমড়ি করে সোমনাথের পিছন পিছন ছুটলাম। জঙ্গলের ওদিকটায় গিয়ে সোমনাথ টর্চের আলো কোনো বস্তুতে ফেলে চিৎকার করে বললো, এই নড়বে না, দাঁড়াও। নিকষ অন্ধকারের মধ্যে টর্চের আলোতে দেখলাম একটা ছেঁড়া ময়লা ছোট কাপড় পরিহিতা অর্ধনগ্না মহিলা। যার চোখ দুটো শিকারি বাঘের মতো, মাথা ভর্তি রুক্ষ চুল। একলা থাকলে হয়তো ছুটে এসে গলা টিপে মেরে রক্ত খেত। আমাদের মধ্যে থেকে বুধন বলে উঠলো উ তো ফুলমনি আছেক বটে। বুঝছি ,উ ওর বেটাকে খুঁজতে শ্মশানে আসে বটে। পাগল হয়েক গিছে ল, পাঁচ বছর ধরে খুঁজে বেড়াইছে বটে! এদিকে ওই মহিলা কাঁদতে কাঁদতে ভাঙা গলায় চিৎকার করে বললো, তুরা শয়তান আছিস বটে, আমার বেটাকে ইখানে লুকিয়ে রাকছিস বটে। সোমনাথ বললো, তুমি দাঁড়াও, তোমার ছেলে আমার কাছে আছে। আমরা সবাই মহিলার কাছে গিয়ে ঘিরে ধরলাম। মহিলা তখন কাঁদতে কাঁদতে বলে যাচ্ছে, তুরা মিথ্যাবাদী বটে, ছেলেকে—হঠাৎ শ্মশানের বাইরে একটা কোলাহল শোনা গেল। এদিকে সোমনাথরা ফুলমনিকে ছেলে ফিরিয়ে দেয়ার লোভ দেখিয়ে শ্মশানের বাইরে আনার চেষ্টা করতে লাগলো।

বিয়ে বাড়িতে হাই প্রোফাইল নিমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে এসে পড়েছেন। এসডিও, পুলিশের এসপি, লোকাল পলিটিক্যাল নেতা, এবং বেশ কিছু কবি সাহিত্যিক, কারণ মৃণালবাবু নিজেই দুর্গাপুর অঞ্চলের একজন প্রখ্যাত কবি, বিয়ে বাড়ি যেন চাঁদের হাট হয়ে উঠলো। এরই মধ্যে মৃণালবাবুর কানে সংবাদটি পৌঁছুল যে সোমনাথরা শ্মশানে গেছে ভৌতিক প্রচারের সত্যান্বেষণে। সঙ্গে সঙ্গে

তিনি পুলিশের এসপি সহ কিছু পুলিশ নিয়ে শ্মশানে এসে উপস্থিত হলেন। এদিকে সন্তান ফিরিয়ে দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফুলমনিকে শ্মশানের বাইরে আনা হলো। তারপর সোমনাথ এসপি-কে সমস্ত ঘটনা বললো। মৃণাল বাবু, এসপি, লোকাল পলিটিক্যাল লিডার দ্রুত আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসলেন। ফুলমনিকে দ্রুত দুর্গাপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা করা হলো।

পরে সোমনাথ মৃণাল বাবুর কাছে খবর পায়, ফুলমনি এখন অনেক সুস্থ। সরকারি ভাবে তাকে অনেক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, স্বয়ং মৃণালকান্তি বাগচী। আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হলো, রাতের আঁধারে শ্মশানে আর শাকচুন্নির কান্নার আওয়াজ শোনা যায় না। ❑

ফুলমনির আখ্যান

(দ্বিতীয় পর্ব)

(পাঠক পাঠিকাদের অনুরোধে 'ফুলমনির আখ্যান'–এর দ্বিতীয় পর্ব লিখতে বসলাম। যাঁরা প্রথম পর্ব পড়েননি তাঁদের ক্ষেত্রে এই গল্পটা পড়লেও কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।)

স্যার, আপনাকে একজন খোঁজ করছেন, ভেতরে নিয়ে আসবো?

— কে আবার খোঁজ করছে, ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে ভেতরে নিয়ে এসো।

মৃণাল কান্তি বাগচী, দুর্গাপুর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার। সম্প্রতি বিপত্নীক মৃণালবাবু মনেপ্রাণে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে আছেন। দুই কন্যার বড়জনের মাস ছয়েক আগে বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়ে আর তিনি থাকেন এক পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে। সে আবার তার পারিবারিক সমস্যার কারণে গতকাল থেকে কাজ ছেড়ে দিয়েছে। মৃণালবাবু পড়েছেন মহাবিপদে। মেয়ে কাজ জানলেও তার তো পড়াশোনা আছে। হঠাৎ করে বিশ্বাসী কাজের লোক মেলাও দুষ্কর। এই সব সাত পাঁচ অফিসে বসে ভাবছেন। এরই মধ্যে দারোয়ান এসে জানালো ফুলমনি নামে এক সাঁওতাল মহিলা দেখা করতে এসেছে। মৃণালবাবু ফুলমনি নামটা শুনে একটু অবাক হয়ে তক্ষুনি তাকে তাঁর চেম্বারে আনতে বললেন।

ফুলমনি মৃণালবাবুর চেম্বারে ঢুকে জোড় হাতে প্রণাম করে বললো, তুই ভালো আছিস বাবু?

— হ্যাঁ আছি, তুমি কেমন আছো? ফুলমনি তার আর উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নিচু করে হাসল।

— তুমি আমার কথা জানলে কিভাবে? আর এখানে এলেই বা কি করে?

— আমি যখন সুস্থ হয়ে যাই, তখন নার্স দিদিদের কাছে তোর কথা শুনি বটে। আজ সকালে ছুটি হওয়ার পর মুনে হল কুথায় আর যাবো, তুর কাছে যাই বটে। এক নার্স দিদিকে বুলতে সে ইখানে দিয়ে গেল বটে।

মৃণালবাবুর সাথে ফুলমনির ভালো মন্দ কথাবার্তা চলাকালীন একটা ক্যান্টিন বয় এসে মৃণালবাবুকে ক্যান্টিনে খেতে ডাকল। মৃণাল বাবু ক্যান্টিন বয়কে সম্মতি জানিয়ে ভাবলেন এত বেলা হয়েছে ফুলমনিরও তো খাওয়া হয়নি, তিনি ফুলমনিকে সঙ্গে নিয়ে ক্যান্টিনে ঢুকলেন।

ফুলমনি কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে এক মনে খেয়ে চলেছে, মনে হচ্ছে এই প্রথম সে তৃপ্তি করে খাচ্ছে। মৃণালবাবুই খেতে খেতে জানতে চাইলেন, এখন সে কোথায় যাবে কি করবে—। ফুলমনি জানায় সাঁওতাল পরগনাতে ফেরার তার আর ইচ্ছা নেই, তার সমাজ তাকে তাদের সামাজিকতায় পুনর্বাসন দেবে এ ব্যাপারে ফুলমনি যথেষ্টই সন্দিহান। মৃণালবাবু অবাক হয়ে বলেন— তাহলে!! ফুলমনি করুণ বদনে মৃণালবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, বাবু তুর এত বড় অফিসে আমাকে একটা কাম দে না বটে? ফুলমনি তো দুম করে বলে দিল, সে তো জানে না যে মৃণাল বাবুর পক্ষে সেটা কখনই সম্ভব নয়। মৃণালবাবু কোনো উত্তর না দিয়ে বেসিনে গিয়ে মুখটা ধুতে থাকলেন। মৃণালবাবু নীরব থাকায় ফুলমনি বুঝতে পারলো এটা হয়তো সম্ভব নয়, সেই জন্য খাওয়া শেষ করে বেসিনের কাছে গিয়ে বলল, বাবু মুকে তুর বাড়ি নিয়ে চল, বাসন মাজব, ঘর মুছব, কাপড় কাজব, সব কিছু করবো বটে। মৃণালবাবু ভাবলেন, ফুলমনি কথাটা মন্দ বলেনি। তাঁর তো এখনই এই রকম একজন লোকের দরকার। সর্বোপরি এরা খুব সৎ এবং বিশ্বাসী হয়। মৃণাল বাবু মুখ মুছতে মুছতে বললেন, তোমার গ্রামে ফিরে যাওয়ার একদম ইচ্ছে নেই? ফুলমনি একদম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বললো, একদম লয় বাবু।

বিকালে ফুলমনিকে নিয়ে মৃণালবাবু বাসায় ফিরলেন। কলিংবেল চাপতেই ছোট মেয়ে মৌলি এসে দরজা খুলে দিল। বাবার সাথে এক অচেনা মহিলাকে দেখে কিছুটা অবাকও হলো। মেয়ের মুখের অভিব্যক্তি দেখে মৃণালবাবু বললেন, ভিতরে চল কথা আছে।

বড় ডাইনিং তার সাথে ওপেন রান্নাঘর, রান্না ঘরের সিঙ্কে সারাদিনের ব্যবহার করা বাসন রাখা আছে। মৃণালবাবু ফুলমনিকে ডাইনিং-এ বসিয়ে মৌলিকে ডেকে পাশের ঘরে ঢুকছিলেন। ফুলমনি তখন সিঙ্কের বাসনগুলো দেখিয়ে বললো, বাবু আমি বাসনগুলো মেজে রাখি বটে? মৃণালবাবু একটু হেসে বললেন না দেখিয়ে দিলে পারবেতো? ফুলমনি মৃণালবাবুর সাথে কয়েক ঘণ্টা কাটানোয় জড়তা অনেক কাটিয়ে ফেলেছে। একটু হেসে বললো, দেখলা বটে।

মৃণালবাবু মৌলিকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে ফুলমনির সম্পর্কে অতীত হইতে বর্তমান সবকিছুই সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন। এবং এই পরিস্থিতিতে কিভাবে ফুলমনির পাশে দাঁড়ানো যায় তা আলোচনা করে ঘর থেকে বেরিয়ে ফুলমনির কাণ্ড দেখে বাপ বেটিতে ভিমরি খেয়ে পড়লেন। সিঙ্ক থেকে বাসন

গুলো সব রান্না ঘরের মেঝেতে নামিয়ে পা ছড়িয়ে বসে মাজার চেষ্টা হচ্ছে। মৌলি একটুও রাগ না করে এক গাল হেসে ফুলমনিকে বেসিনে কিভাবে বাসন মাজতে হয় সেটা শিখিয়ে দিতে উদ্যত হলো।

দেখতে দেখতে কয়েক মাস কেটে গেল। মৌলির সহযোগিতায় এবং ফুলমনির শেখার আগ্রহে ফুলমনি এখন সভ্য সমাজের গৃহস্থালির অনেক কাজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ। আর কিছু দিনের মধ্যে হেঁসেলটাও সে সামলে নিতে পারবে। মৌলির অবসর সময়ে দুজনে মিলে নানা রকম গল্পসল্প করে। ফুলমনির পূর্ব জীবন কাহিনী শুনে মৌলি বলে, জানতো শিক্ষাহীনতাই তোমাদের জীবনকে এত দুর্বিষহ করে তোলে। তুমি যদি শিক্ষিত হতে তবে তোমার জীবনটা এমন হতো না। মৌলির কথা শুনে এক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফুলমনি মৌলিকে বলে, মৌলি দিদি তুই আমারে লিখা পড়া শিখাইবি বটে? তোর ওই মোটা মোটা বইগুলো আমার পড়তে ইচ্ছা হয় বটে। মৌলি অট্ট হাসি হেসে বলে দূর বোকা, ওই বই পড়তে গেলে আগে অ, আ, ক, খ, এ, বি, সি, ডি শিখতে হবে। ফুলমনি লজ্জা পেয়ে বলে, তুই হাসছিস বটে, আমাকে শিখানা বটে, দেখ আমি পারি কিনে! মৃণালবাবু অফিস থেকে ঠিক সেই সময় ফিরলেন, এবং ওদের কথপোকথন শুনে বলেন, বেশ তো মৌলি তুই প্রয়োজনীয় বইগুলো সংগ্রহ করে ওকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে থাক। আমি দেখছি বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কি সুযোগ সুবিধা করে দেয়া যায়।

দেখতে দেখতে আরো কয়েক মাস কেটে গেল। ফুলমনি এখন বাংলা ইংরেজিতে নিজের নাম ঠিকানা লিখতে শিখে গেছে। মৌলির মোটা মোটা বইগুলো শুধু নাড়াচাড়া করে না, থেমে থেমে রিডিংও পড়ে। মৃণালবাবু ফুলমনির নামে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছেন। যাতে ফুলমনির কয়েক মাসের (মৃণালবাবুর দেওয়া) মাহিনা জমা পড়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের গরিব যোজনার সুযোগ সুবিধা সবই মৃণাল বাবুর বদান্যতায় পেয়ে চলেছে।

একদিন মৌলির বইয়ের পাঁজা নাড়াচাড়া করতে করতে ফুলমনি সাঁওতাল সমাজের ইতিকথা নামে একটি বই পায়। এবং কয়েক দিনের মধ্যে বাংলায় লেখা বইটি পড়ে ফেলে। বইটি পড়ে এবং নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে সে এটুকু উপলব্ধি করে যে পূর্ব জন্মে অনেক পাপ করলে তবে এই জন্মে এমন সমাজ ব্যবস্থায় মেয়ে হয়ে জন্মাতে হয়। তাদের সমাজ ব্যবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে ফুলমনির মনটা বিষাদে ভরে ওঠে। নাড়ির টান খণ্ডন করা মুশকিল,

মনে মনে সে ভেবেই ফেলে – সময় সুযোগে একবার তার গ্রাম থেকে ঘুরে আসবে।

শিবু তুর বেটি একটা পাস দিলো বটে। উকে আরো লিখা পড়া শিখাইবি বটে। দেখবি উ গিরামের মান রাইখবে বটে। কাশতে কাশতে উপেন সোরেন কথাগুলো শিবু সোরেনকে বললো। এই প্রথম সাঁওতাল পরগনায় শিবু সোরেনের মেয়ে ঝুমুর প্রথম মাধ্যমিক পাস করলো। কিছুটা সরকারি সুযোগ–সুবিধা আর কিছুটা বাবা মায়ের ইচ্ছায় আদিবাসী শিশুরা বর্তমানে স্কুলমুখো হয়েছে। এর মধ্যে কিছু পড়ুয়ার নিজেদের আগ্রহ থাকায় পড়াশোনাতে কিছুটা উন্নতি ও করেছে। শিবু সোরেন মেয়েকে আর পড়াতে চায় না। সাঁওতাল সমাজে ষোল বছর অতিক্রান্ত মানে বুড়ি হয়ে যাওয়া। শিবুর পাত্র ঠিক করা আছে, চার হাত এক করে দিতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত। ঝুমুরের আরো পড়াশোনা করার ইচ্ছা, কিন্তু খরচ ও অনেক, শিবুর পক্ষে সেই খরচ টানা সম্ভব নয়। ঝুমুরের স্কুলের হেড মাস্টার মশাই আশীর্বাদ করে বলেছেন – পড়াশোনা চালিয়ে গেলে তাঁর দিক থেকে যতটা সম্ভব সাহায্য করবেন।

ফুলমনি–কে এখন আর চেনার উপায় নেই। মৌলির ডিরেকশনে আর নিজের ইচ্ছায় সে একজন সভ্য বাঙালি পরিচারিকা। কথার মাত্রা হিসাবে বটে বলা একদম বন্ধ করে দিয়েছে। কাজকর্মে কথাবার্তায় আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট। মৃণালবাবুকে তুই তামারি না বলে স্যার সম্বোধন করে। মৌলি আর মৃণাল বাবু লাঞ্চ করছেন, ফুলমনি পরিবেশন করছে। মৌলি আর মৃণাল বাবুর কথোপকথনের মধ্যে ফুলমনি বললো, স্যার, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলাটা আমাকে একটু শিখিয়ে দেবেন? ফুলমনির কাছ থেকে এমন একটা কথা শুনবে এটা দুজনের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। কয়েক সেকেন্ড পরস্পর পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। তারপর মৃণালবাবুর ইশারায় মৌলি কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। মৃণালবাবু বললেন, নিশ্চয়ই, নিজের কাজ নিজে করতে শেখা তো ভালোই, এতে পরনির্ভরশীল হতে হয় না।

বেশ কিছু দিন পর এক দিন মৌলি কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার নির্দিষ্ট সময়ের ঘন্টা খানিক আগেই ফিরে আসলো। এসে দেখলো দরজাতে তালা ঝুলছে। তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবিও নেই যে খুলবে। সে একটু অবাক হয়ে কিছু একটা ভাবছিল এরই মধ্যে ফুলমনি হন্তদন্ত হয়ে এসে মৌলিকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু ঘাবড়ে গেল। ফুলমনি আমতা আমতা করে কিছু একটা বোঝানোর চেষ্টা করতে মৌলি ওকে থামিয়ে দিলো। ভাবখান এমন ফুলমনির

বাড়ির বাইরে যাওয়াটাকে সে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। আসলে মৌলি ফুলমনিকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিলো।

লাউদোহার সাঁওতাল পরগনাতে আজ উৎসব হবে। মুরগির মাংসের সাথে হাঁড়িয়া প্রস্তুত। সঙ্গে আছে মাদল নিয়ে নাচগান। লক্ষ্যের থেকে উপলক্ষ বড়। অনুষ্ঠানের কাজে তৎপর বাবুরাম সোরেনকে কেউ একজন উৎসবের কারন জানতে চাইলে সে ব্যস্ততার সাথে বলল ঝুমুর বেটি এক সাথে দুটো পাশ দিয়েছে বটে। তার লিয়ে উৎসব হবে বটে।

ঝুমুর চারটে সাবজেক্টে লেটার নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছে। পাশাপাশি জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষাতে নব্বই শতাংশের বেশি নাম্বার পাওয়ায় মেডিকেলে চান্স পেয়েছে। ঝুমুরকে সন্তানের মতো গাইড করছেন ওদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরিমল হাঁসদা। সমস্যা হল অর্থ, তারপর ঝুমুরের ভাগ্য।

বছর পাঁচ পর—

মৃণালবাবুর অবসর নেয়ার সময় হয়ে এসেছে। আর বছর দেড়েক হাতে আছে। তিনি মৌলির জন্য সুপাত্রের খোঁজখবর করছেন। এ দিকে সোনার দাম হুহু করে বাড়ছে। মৃণালবাবু অর্নামেন্টসগুলো আগে কিনে রাখার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কে গেলেন টাকাকড়ির পজিশনটা জানতে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার তাঁর পূর্ব পরিচিত আবার বন্ধু স্থানীয়। বি এম এর চেম্বারে বসে চা খেতে খেতে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ম্যানেজারবাবু বললেন— মৃণালবাবু আপনাদের পরিচারিকা ফুলমনি তো বেশ চৌকোষ হয়ে উঠেছে। ব্যাঙ্কে আসছে টাকা পয়সা তুলছে জমা দিচ্ছে, এক ভদ্রলোককে মাঝেমধ্যে সঙ্গে দেখি। একটা নিরক্ষর আদিবাসী মেয়েকে এত সুন্দর ভাবে তৈরি করেছেন যে আপনি তো মশাই এওয়ার্ড পাওয়ার যোগ্য। ফুলমনি ব্যাঙ্কে এসে টাকা জমা দেয় তোলে এটুকু শুনে মৃণালবাবু রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তো মাসের প্রথমে একবারই ক্যাশ ডিপোজিট করেন তাও অনলাইনে, ফুলমনির হাত দিয়ে নয়। তাহলে ফুলমনি কেন এত ব্যাঙ্কে আসে আবার অন্য পুরুষ থাকে। মৃণালবাবু অঙ্ক কিছুতেই মেলাতে পারছেন না। তাঁর যুক্তি বুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। মৃণালবাবুকে চিন্তান্বিত দেখে ম্যানেজারবাবু বললেন— কিছু মনে করবেন না, আমি কি অপ্রত্যাশিত কোনো মন্তব্য করে ফেললাম?

— না না তেমন কিছু নয়, তবে আমাকে একটা হেল্প করলে খুব ভালো হয়।

— নিশ্চয়ই বলুন না!

— ফুলমনির অ্যাকাউন্টটা একটু ওপেন করবেন?

— নিশ্চয়ই আপনি যখন বলছেন!

ফুলমনির অ্যাকাউন্ট ওপেন করতেই মৃণালবাবুর চক্ষু চড়ক গাছ। দীর্ঘদিন ধরে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে জমা পড়ছে। কিন্তু সেই ব্যালান্স অ্যাকাউন্টে নেই, তাছাড়া অন্য কেউ এই অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করেছে। তা হলে কে বা কারা ফুলমনির অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করে এবং কেন করে! তিনিতো ফুলমনির ভালো চান, ফুলমনি সেটাও বোঝে, তবে তাঁকে এই ব্যাপারে অন্ধকারে রেখেছে কেন! অনেক প্রশ্ন মাথায় নিয়ে মৃণালবাবু ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসেন।

বাড়িতে এসে মৌলির সাথে মৃণালবাবু ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। উদ্দেশ্য মৌলির চোখে সন্দেহজনক কিছু ধরা পড়েছে কিনা। পারিবারিক দিক থেকে ফুলমনির কাজকর্মের দৃষ্টান্তমূলক কোনো ত্রুটি তারা পাইনি। তবে ফুলমনি যে মাঝে মধ্যে বাড়ির বাইরে বার হয়, এটা প্রমাণিত। দুজনে মিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো— এই ভাবে আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। ফুলমনির গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরোপ করতে হবে।

কয়েক দিন পর মৃণালবাবু একটু দেরিতে অফিসে ঢোকেন। চেয়ারে বসতে না বসতে বেয়ারা এসে এক গেলাস জল আর একটা খাম টেবিলের উপর রেখে গেল। মৃণালবাবু খামটি খুলে দেখলেন, আগামী রবিবার সরপির ইকোপার্কে একটা সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে ওনাকে প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করতে হবে। সরকারি উচ্চপদ এবং প্রচুর মর্মস্পর্শী কবিতা লেখায় তাঁর একটা ভালো পরিচিতি আছে। সেই সুবাদে এমন অনেক জায়গাতেই তাঁর প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করতে যেতে হয়। তেমনি একটা সাধারণ নিমন্ত্রণ পত্র ভেবে নিজের কাজে ডুব দিলেন।

বেলা দুটোর পর ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মৃণালবাবুকে ফোন করে জানালেন ফুলমনি এবং সেই ভদ্রলোক ঘন্টা খানিক আগে এসে টাকা তুলে নিয়ে গেলেন। মৃণালবাবু মৌলিকে ফোন করলেন জানতে সে আজ বাড়িতে আছে না কোথাও বেরিয়েছে। মৌলি জানালো— আমি বাড়িতে আছি, কিন্তু বাবা তুমি অফিসে বার হওয়ার সাথে সাথে ফুলমনি বেরিয়ে গেল। আমার অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে একবার 'মৌলি দিদি একটু বেরুচ্ছি তাড়াতাড়ি ফিরবো' বলে চলে গেল। মৃণালবাবু আর মৌলি ফোনের কথোপকথনেই ঠিক করলেন, ফুলমনিকে সরাসরি ওর চলাফেরা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে। এই ভাবে আর

ধোঁয়াশার মধ্যে থাকা সম্ভব হচ্ছে না।

আজ রবিবার ফুলমনি খুব ভোরে উঠে অতি তৎপরতায় সংসারের কাজকর্ম গুছিয়ে নিচ্ছে। মৃণালবাবু সকালে হাঁটতে বার হন, ফেরার সময় বাজার করে ফেরেন। রবিবার দুপুর একটার মধ্যে খাওয়া হয়ে যায়। আজ ফুলমনির ভাব এমন যেন বারোটায় সবাই খেয়ে নিলে ভালো হয়। তার এই আচরণ মৌলির একদম ভালো লাগছে না। মনে মনে ভাবে, 'আজ আবার বাবাকে না জানিয়ে গটগট করে বেরিয়ে যাবে না তো!' মৌলি বাবার সাথে সব কথা বললো, এবং দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলো–খাওয়ার টেবিলে আজ ফুলমনির কাছে এই ব্যাপারে জানতে চাওয়া হবে। ধৈর্যের বাঁধ তাঁদের একদম ভেঙে গেছে।

দুপুরে মৃণালবাবু মৌলি খাচ্ছে, ফুলমনি পরিবেশন করছে। ফুলমনি রান্নাঘরে মাছেরঝোল আনতে গেলে মৌলি বাবাকে ইশারা করে জানায়, ফুলমনি খাওয়ার টেবিলে এলেই যেন মৃণালবাবু কথাটা উত্থাপন করেন। মৃণালবাবুও সম্মতি জানালেন। ফুলমনি ডাইনিং টেবিলের সামনে আসতেই মৌলি বাবার দিকে তাকালো, মৃণালবাবু কথাটি উত্থাপন করবেন ঠিক সেই সময় ফুলমনি বিনা ভূমিকায় মৃণালবাবুকে বললো— স্যার, আজকে সন্ধ্যায় আপনাকে আর মৌলি দিদিকে একটু সরপি ইকো পার্কে যেতে হবে।

ফুলমনির মুখ থেকে এমন একটা কথা শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে দুইজন দুইজনের দিকে কয়েক সেকেন্ড অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। আজি তো মৃণালবাবুর সরপি ইকোপার্কে যাওয়ার কথা। কিন্তু একথা ফুলমনি জানলো কি করে! ফুলমনিকে নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। একটু ধাতস্থ হয়ে মৌলি জানতে চায়—কেন, সেখানে গিয়ে কি হবে? ফুলমনি খাবার পরিবেশন করতে করতে নির্লিপ্ত ভাবে বলতে থাকে— মৌলিদিদি আমি পাঁচ ছয় বছর তোমাদের কাছে আমার বিষয়ে অনেক কিছু গোপন করে রেখেছি। তোমরা দুইজনেই বুঝতে পেরেও আমাকে কোনো প্রশ্ন করোনি। করলে কি হতো আমি জানিনা। কিন্তু আমার ভিতর অকৃতজ্ঞতার জ্বালা কুরে কুরে খাচ্ছে। আজ হয়তো সেই জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে চলেছি।

মৃণালবাবু মৌলির খাওয়া হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফুলমনি তাড়াহুড়ো করে খেয়ে নিয়ে সংসারের পরবর্তী কাজ গুছিয়ে রাখলো। তারপর ড্রেস চেঞ্জ করে মৃণালবাবুর ঘরে গিয়ে অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। মৌলি এসে বললো— বাবা কিছু বুঝছ? মৃণালবাবু কবিতা লিখতে লিখতে বললেন—আর তো কয়েক ঘন্টা, আলোচনা পরিত্যাগ করে বরং অপেক্ষায় থাকি।

সরপি ইকো পার্কের অডিটোরিয়াম জনসমাগমে গমগম করছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে অনুষ্ঠান শুরু হবে। একে একে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে তাঁদের নির্ধারিত সিটে বসছেন। ঘোষক অনুষ্ঠান সূচিটা বারবার ঘোষণা করেছেন। মৃণালবাবু আর মৌলি এসে তাদের নির্ধারিত সিটে বসলেন। মিনিট তিন চারের মধ্যে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে একজন এসে মৃণালবাবুর হাতে একটা অনুষ্ঠান সূচির লিফলেট ধরিয়ে দিয়ে গেল। মৃণালবাবু লিফলেটটিতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন।

ঘোষকের ঘোষণা শুনে এবং লিফলেটটি পড়ে মৃণালবাবু একটি সম্যক ধারণা করে নিলেন এখানে কি হতে চলেছে, আর তাঁর ভূমিকাই বা কি। মৌলি এদিক ওদিক তাকিয়ে ফুলমনিকে খোঁজার চেষ্টা করছে। না দেখতে পেয়ে বাবাকে বললো, আচ্ছা বাবা ব্যাপার কি বলতো? মৃণালবাবু মুচকি হেসে বললেন— ক্রমশ প্রকাশ্য! এরই মধ্যে ফুলমনি এসে উপস্থিত। মুখে পরম তৃপ্তির হাসি, আপনারা এসেছেন স্যার, আমার যে কি ভালো লাগছে, কি বলবো! মৌলি ফুলমনির কথাবার্তার ম্যাচিউরিটি দেখে অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো। এরই মধ্যে ঘোষক ফুলমনিকে মঞ্চে ডাকলেন। ফুলমনি মৌলিকে বললো, মৌলিদিদি আজ আমার সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে, যাই ডাক পড়েছে। ফুলমনি দ্রুত পায়ে মঞ্চের দিকে চলে গেল। মৌলির একটু অভিমান হল, এতদিন ধরে পিছিয়ে পড়া সমাজের একটি মহিলাকে লেখাপড়া আদপ কায়দা শিখিয়ে সভ্য সমাজের উপযুক্ত করে তুললাম সেই কিনা তার সাথে লুকোচুরি খেলছে!

ঘোষকের ঘোষণা শোনা গেল— উপস্থিত শ্রদ্ধেয় অথিতিগণ, আপনাদের অনুমতি নিয়েই আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করছি। আজ আমরা একত্রিত হয়েছি একটি সংবর্ধনা সভাকে কেন্দ্র করে। লাউদোহার অনগ্রসর শ্রেণীর একটি মেয়ে নাম ঝুমুর সোরেন, যার বারো তেরো বছর বয়সে বিয়ে করে সংসারী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু না, তা হয়নি, সে এখন এম বি বি এস ডক্টর। আমরা তাকেই সংবর্ধনা জানিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করব। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন লাউদোহা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরিমল হাঁসদা। তিনিই ঝুমুরের পথ প্রদর্শক। তাঁর আশীর্বাদের হাত ঝুমুরের মাথায় না থাকলে ঝুমুর হয়তো একটি শিক্ষিত মানুষ হতো,ডাক্তার হতে পারতো না। এখানে আর একজনের কথা না বললেই নয়—মঞ্চের লাইট অফ হয়ে গেল, ঘোষক ঘোষণা পরিবর্তন করে জানালেন, আমাদের অনুষ্ঠান এখুনি শুরু হচ্ছে। প্রথমে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করছে বৈশাখী হাঁসদা।

উদ্বোধনী সংগীত সমাপ্ত হওয়ার পর মঞ্চে সভাপতিত্বের আসন অলংকৃত করার জন্য ডেকে নেয়া হলো মৃণালকান্তি বাগচীকে। তাঁকে একটি ছোট্ট মেয়ের দ্বারা মাল্যদান করে বরণ করা হলো। মৃণালবাবু সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য রাখলেন। তিনি কথা দিলেন, তাঁর তরফ থেকে অনগ্রসর শ্রেণীর যত সুযোগ সুবিধা আছে সব কিছু পাইয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। তিনি পরিমল হাঁসদাকে একটা কমিটি করতে বলেন, যার কাজ হবে মূলত পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয়া। সাথে সাথে তিনি পরিকল্পিত কমিটির উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকার একটি চেক পরিমল হাঁসদার হাতে তুলে দিলেন।

এরপর সাঁওতালি গানের সাথে একটা নৃত্য পরিবেশন হলো। তারপর মঞ্চে ডেকে নেয়া হলো ঝুমুর সোরেনকে। ঝুমুরকে শংসাপত্র, উত্তরীয় প্রদান করে সম্মান জানানো হলো। এবার ঝুমুরকে সংবর্ধনা কমিটির তরফ থেকে কিছু বলতে বলা হলো। ঝুমুর পোডিয়ামের সামনে এসে তার বক্তব্য শুরু করল —উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ভদ্রমণ্ডলীগণ, প্রত্যেককে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এমন মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি কখনো বক্তব্য রাখিনি, আর পারবোও না। বরং আমি আমার জীবনের একটা গল্প বলি—

আমার বয়স তখন পাঁচ ছয় হবে, পাঁচটা শিশুর মতো খেলাধূলা করেই বেড়াতাম। মা কাজ করতেন আমাদের গ্রামের বাইরে একটা বাঙালি বর্ধিষ্ণু পরিবারে। সকালে যখন মা কাজে যেতেন, আমাকে নিয়ে যেতেন। সেই বাড়িতে চার পাঁচ জন আমার মতো ছেলেমেয়ে ছিল। তারা সকালে যখন টিফিন করতো গিন্নিমা ওদের সাথে আমাকেও দিতেন। সত্যি কথা বলতে কি, ওই লোভেতেই যাওয়া। ব্রেকফাস্টের পর বাচ্চাগুলো পড়তে বসত। আমিও ওদের পাশে বসে পড়া শুনতাম। খুব ভালো লাগতো, ওদের দিদিমণি এসে যখন পড়া বুঝিয়ে দিতেন তখন আরো ভালো লাগতো। খাওয়ার লোভে যাওয়াটা আস্তে আস্তে আমার পড়ার লোভে পরিণত হলো। এই ভাবেই চলছিল, একদিন দিদিমণি এসে বাচ্চাদের একটা মুখস্থ করতে দেওয়া কবিতা বলতে বললেন। কিন্তু কেউই ঠিকঠাক বলতে পারছিল না। আমার মুখটা তখন উসখুস করছিল কবিতাটি বলার জন্য। বাচ্চাগুলো যখন বই দেখে জোরে উচ্চারণ করে কবিতাটি মুখস্থ করছিল, আমার শুনেই সেটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ‘দিদিমণি আমি বলবো’ কথাটা। তিনি একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, আমি কবিতাটি কি করে জানলাম। আমার উত্তর শুনে উনি আরো অবাক হয়ে আমাকে কবিতাটি বলতে বললেন। আমি বললাম, শুনে উনি

এতটাই খুশি হলেন যে সঙ্গে সঙ্গে গিন্নিমাকে এবং মাকে আলাদা ডেকে কিছু কথা বললেন। তারপর দিন দিদিমণি মাকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে এলেন। প্রথম দিকটায় আমাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করত, কিন্তু বছর খানিক পর আমার পড়াশোনার ধরন ও রেজাল্ট দেখে যাঁরা হাসাহাসি করতেন তাঁরা ভালোবাসতে শুরু করলেন। ক্লাস ফোরে মগ টেস্টে আমি খুব ভালো রেজাল্ট করলাম। স্কুলের এক্সজামেও আমি প্রথম হলাম। তারপর ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার হাত ধরে আবার ভর্তি হলাম লাউদোহা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ক্লাস ফাইভ থেকে যখন প্রথম হয়ে ক্লাস সিক্সে উত্তীর্ণ হলাম তখন আমি আমাদের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় পরিমল হাঁসদার নজরে পড়লাম। তিনি আমাকে ডেকে আমার পারিবারিক পরিস্থিতির সমস্ত খবর নিয়ে আশ্বস্ত করলেন যে আমি যেন হঠাৎ করে পড়াশোনা ছেড়ে না দেই। আমার সুবিধা অসুবিধাগুলো আমি যেন ওনাকে জানাই। ওনার আন্তরিক সহযোগিতায় আমি খুব ভালোভাবে একের পর এক ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়ে মাধ্যমিক পাস করলাম। পাঁচটা সাবজেক্টে লেটার পেয়ে পাস করলাম। আমিই হলাম আমাদের স্কুলের ম্যাক্সসিমাম নাম্বার প্রাপ্ত প্রথম স্টুডেন্ট। আমার নিজের খুশি হওয়ার ঢেউটা এবার এসে পড়ল আমার গ্রামের মানুষদের মধ্যে। তাঁরা আনন্দে উৎসব করলো, কেউ কেউ আরও এগিয়ে যাওয়ার আশীর্বাদও করলেন। কিন্তু বাবা সমাজের কথা ভেবে আর না পড়িয়ে বিয়ে দিয়ে দেবেন মনস্থ করলেন। কথাটা শুনে আমি খুব ভেঙে পড়েছিলাম। হেডস্যার এসে বাবাকে অনেক বোঝালেন, তাঁর দিক থেকে তিনি যতটা পারবেন সহযোগিতা করবেন। কিন্তু বাবা অনড়, মা চুপ। তাঁরা আমার শিক্ষার থেকে সমাজ নিয়েই বেশি ভাবিত। স্বাভাবিক ভাবেই মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। কলেজে পড়ার বিরাট একটা ইচ্ছা আমার মনে জাল বুনেছিলো, সেটা যেন এক লহমায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়ে আমার জীবনে এক নক্ষত্রের উদয় হলো। পরদিন দুপুরে আমি বারান্দায় বসে আছি, তখন এক ভদ্র মহিলা এসে মাকে ডাকলেন। মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু মা ভদ্র মহিলাকে চিনতে পারলেন না। ভদ্র মহিলা পরিচয়টা একটু পরিষ্কার করতেই মা চিনতে পেরে ওনাকে জড়িয়ে ধরলেন। মা আমাকে দেখিয়ে বললেন, আরে ওই তো ঝুমুর, তুর বেটার সাথে খেলতো বটে। বেঁচে থাকলে ঝুমুরের মতো হতো বটে। ভদ্র মহিলা আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অচেনা মানুষ, আমার অস্বস্তি লাগলেও সরে আসতে পারলাম না এই ভেবে, উনি হয়তো ওনার মৃত

সন্তানের অপত্য স্নেহের স্বাদটা আমার কাছ থেকে পেতে চাইছেন। এর পর যখন উনি শুনলেন আমি মাধ্যমিক পাস করেছি উনি আরো খুশি হলেন। আমারও ধীরে ধীরে আন্টির উপস্থিতি বেশ ভালো লাগছিলো। তিনি আমাকে বোঝালেন আমাকে আরো মোটা মোটা বই পড়তে হবে, বিদ্যান হতে হবে। বাবার না পড়াবার ইচ্ছার কথা শুনে বললেন, তুই একদম বাবার কথা শুনবি না, তোকে ডাক্তার হতে হবে। মনে রাখিস তোর জন্ম তোর জন্য হয়নি, হয়েছে নরকে ডুবে থাকা এই সমাজটার জন্য। তুই ডাক্তার হলে আর কোনো মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে না। ওঝা আর মোড়লের ডাইন অপবাদ দিয়ে নিরীহ মানুষগুলোকে মেরে তাদের সম্পত্তি গ্রাস করতে পারবে না। শিশু মৃত্যু আর কোনো মায়ের কোল খালি করবে না। এর জন্য দরকার সমাজে তোর মত ছেলেমেয়ে। তোরাই পারবি এই ঘুণ ধরা সমাজকে ঘুণ মুক্ত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এরই মধ্যে বাবা এসে আন্টির সব কথা শুনে বললেন— গরিব ঘরের মেয়েকে ওই সব স্বপ্ন দেখতে লাই বটে। উ যেমন আছে তেমন থাকতে দাও বটে। আরো পড়তে গেলে, ডাক্তার হতে গেলে কত বড়ো বড়ো কিতাব পড়তে হবে জানো? তার খরচও অনেক, কে দিবে সেই খরচ? আন্টি বাবার দিকে তাকিয়ে চোখে চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বললো, আমি দেব।

কয়দিন পর আন্টি আবার এলেন, আমি ততক্ষণে মায়ের কাছ থেকে আন্টির পরিচয়টা সম্পূর্ণ জেনে গেছি। উনি আমাকে আর বাবাকে নিয়ে লাউদোহা উচ্চ বিদ্যালয়ে গেলেন। ওখানে হেডস্যারের সাথে আন্টি আলাদা ভাবে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেন। কথা শেষে স্যার অতি উৎসাহে বললেন, আমি তো তাই চাই, এমন সম্ভাবনাময় মেধা অকালে ঝরে যাক কেউ কি তাই চায়! সব থেকে বড়ো কথা, আপনি আর্থিক ভাবে ঝুমুরের পাশে থাকছেন। আপনার ইচ্ছার লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে ওকে 'সায়েন্স নিয়ে পড়তে হবে।'

হেড স্যারের গাইড লাইন ও আন্টির অর্থ সাহায্যে শুরু হলো আমার নতুন করে পড়াশোনা। আমি বুঝলাম এবার আমার লেখাপড়া শুধু শিক্ষিত হওয়ার জন্য নয়, আন্টি আমার চোখের সামনে একটা মাইল স্টোন বসিয়ে দিয়েছে। আমাকে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবেই হবে। আন্টির কঠোর নজরদারিতে চলতে থাকলো আমার পড়াশোনা। একটা সময়ে আমি চারটি সাবজেক্টে লেটার নিয়ে খুব ভালো মার্ক্স করে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করলাম। পাশাপাশি জয়েন্টে খুব ভালো নাম্বার হওয়ায় মেডিকেলে চান্স পেয়ে গেলাম।

শুরু হলো আমার নতুন করে অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছনোর পরীক্ষা, এ যুদ্ধের

দুই সেনাপতি আন্টি আর হেডস্যার। কারণ আমি তো পড়ে দায় সেরেছি, তাঁরা দায় সামলিয়েছেন। আন্টি তাঁর সঞ্চিত সমস্ত অর্থ এনে স্যারের হাতে তুলে দিলেন। বাকিটা হেডস্যার নিজে এবং স্কুলের অন্য শিক্ষকদের থেকে কালেক্ট করলেন। কিন্তু ভর্তি হলেই তো হলো না। স্টাডি এক্সপেন্সেস তো কম নয়, সেটা নিয়ে ওনারা চিন্তায় পড়ে গেলেন। শেষে এক অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং সেটাকে বাস্তবে রূপ দিলেন। তাঁরা পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে কোনো অবস্থাপন্ন পরিবারে শুভ অনুষ্ঠান হলে সেখানে গিয়ে আমার কথা বলে অর্থ ভিক্ষা করতেন। অনেকে অর্থ সাহায্য করেছেন, আবার অনেকে ভণ্ডামি ভেবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আমার জন্য দুইজন অকৃতদার মানুষ, একজন তাঁর সর্বস্ব দিয়েও ভিক্ষা করেছেন। আর একজন তাঁর পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে ভিক্ষা করছেন, কেন না আমার ডাক্তারি পড়ায় যেন বিঘ্ন না ঘটে। এটা ভাবলেই আমার দুই চোখ জলে ভরে যেত। আন্টি আমাকে বুকে টেনে বলতেন, সেইদিন সব সুদে আসলে ফেরত পাবো, যে দিন তুই গ্রামের পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াবি।

আজ সেই দিনের দুয়ারে আমি দণ্ডায়মান। একটা সহায় সম্বলহীন অনগ্রসর শ্রেণীর ছাত্রীর পাশে থেকে তাকে পাদপ্রদীপের আলোতে আনা সেই কান্ডারি যুগলকে পাশে নিয়ে আমি শপথ নেব। আমার দুই কান্ডারির একজনকে তো সবাই চেনেন, তিনি হলেন লাউদোহা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় পরিমল হাঁসদা। আর এক জন হলেন আমাদেরই পিছিয়ে পড়া সমাজের এক লড়াকু মহিলা। যাকে এক সময় গ্রামের মোড়লেরা ডাইনি অপবাদ দিয়ে পাগল করে গ্রামের বাইরে বার করে দিয়েছিল। সেই লড়াকু মহিলা হলেন ফুলমনি ওরাং। আমি দুই জনকেই মঞ্চে ডেকে নেব।

ফুলমনি ওরাং এবং পরিমল হাঁসদা মঞ্চে উঠতেই ঝুমুর এগিয়ে গিয়ে দুজনকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। তারপর পোডিয়ামের সামনে গিয়ে ঝুমুর বললো, আমি ফুলমনি আন্টিকে পাশে দাঁড় করিয়ে সকলের সামনে কথা দিচ্ছি, আমি গ্রামের হসপিটালে চাকরি তো করবোই তাছাড়া যত দিন প্র্যাকটিস করব গ্রামের গরিব মানুষগুলোকে বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসা করবো। (অডিটোরিয়ামে হাততালির বন্যা বয়ে গেল) আবেগে ঝুমুরের চোখে জল চলে এলো। চোখ মুছতে মুছতে সে বলল, আমি আর কিছু বলতে পারছি না। আমার ইচ্ছা আন্টি আপনাদের কিছু বলুক, ধন্যবাদ।

ফুলমনি পোডিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালো। সে যে অপ্রস্তুত, সেটা তার

জড়তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তবুও সে বলার চেষ্টা করল— সবাইকে নমস্কার, ঝুমুর আমার সম্পর্কে একটু বেশিই বলেছে। ঝুমুরকে ডাক্তার হতে সত্যিই যদি কেউ সাহায্য করে থাকেন তিনি হলেন মাস্টার মশাই। আমি শুধু আমার মনের কথাগুলো বলেছিলাম। কারণ আমি এক সময় নরকে বাস করতাম। সেখানে ছিল কিছু মানুষরূপী পশু। তারা আমাদের সমাজের কোনো উন্নতি চায় না। বরং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমাজ ব্যবস্থাকে কুসংস্কারে ভরিয়ে রেখেছে। আমিও তাদের শিকার হয়েছিলাম। কিন্তু কপাল জোরে সভ্য সমাজের কিছু মানুষের সহযোগিতায় আমি সেখান থেকে মুক্তি পাই। যাইহোক আমি স্বর্গ দেখিনি, দেখিনি দেবতাও, তবুও আমার উপলব্ধি দিয়ে বলছি—আমি এখন থাকি এক দেবালয়ে, যেখানে থাকেন মানুষরূপী স্বয়ং মহাদেব। তিনি আমাকে ওই নোংরা পরিবেশ থেকে উদ্ধার করে তাঁর নিজ গৃহে স্থান করে দিয়েছেন। সেখানে আরও একজন আছেন, তিনি মহাদেব কন্যা সরস্বতী, আমার মৌলিদিদি। একটা নিরক্ষর আদিবাসী মেয়ের চোখে জ্ঞানের আলো ফুটিয়ে এই জায়গাতে আনা, এটা মা সরস্বতী ছাড়া কি সম্ভব? পরিশেষে আমি আমার একটা ইচ্ছার কথা জানাই—স্যার এর আনুকূল্যে আমার নিজস্ব কোনো খরচ হয় না। সেইজন্য স্যারের দেওয়া যে অর্থ আমি পাই তা সমাজের পিছিয়ে পড়া দুস্থ মানুষের জন্য আমি মাস্টার মশাই পরিমলবাবুর হাতে তুলে দেব, নমস্কার।

অডিটোরিয়ামের সমস্ত শ্রোতা উচ্ছ্বসিত করতালিতে ফুলমনির ইচ্ছাকে বরণ করে নিলো। আস্তে আস্তে মঞ্চের পর্দা পড়তে থাকলো। ঘোষক অনুষ্ঠানের যবনিকা পড়ার ঘোষণা করছেন। হলের মধ্যে ফুলমনিকে নিয়ে আলোচনার গুঞ্জন চলছে। কিন্তু মৃণালবাবু আর মৌলি নির্বাক। তাঁরা বাক্য হারা হয়ে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এদিক ওদিক চাইছে। মনে হচ্ছে জনসমুদ্রে কাঙ্ক্ষিত মানুষ ফুলমনিকে তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আস্তে আস্তে তাদের সামনে ফুলমনি এসে দাঁড়ালো। মৃণালবাবু ও মৌলির চোখে জল দেখে ফুলমনি মৌলির দিকে তাকিয়ে বলল— তুমি কাঁদছো মৌলিদিদি!! মৌলি ফুলমনিকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে ক্ষমা করে দাও, না জেনে না বুঝে তোমাকে ভুল বুঝেছি। ❑

আত্মা হইতে পরমাত্মা

আজ একজন মহামানবের পূর্ব জন্মের গল্প বলবো। কে সেই মহামানব হতে পারেন, তা পাঠকগণ অনুমান করবেন।—

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে প্রাচীন ভারতের হিমালয়ের পাদদেশে জঙ্গলাকীর্ণ কোনো এক গ্রামের বনান্তে এক কাঠুরে এবং তার স্ত্রী বসবাস করত। কাঠুরে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে দিত, আর তার স্ত্রী কাঠগুলোকে শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে প্রস্তুত করে বিত্তবানদের বাড়িতে যোগান দিত। এই ভাবেই তাদের দিন গুজরান হতো। সুখেই ছিল তারা, কিন্তু তাদের মনে কোনো শান্তি ছিল না। কারণ উনিশ বিশের দাম্পত্য জীবনে ভাঙা ঘর আলো করে একটা সন্তান এলো না। কাঠুরে দম্পতি সব সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতো একটি সন্তানের জন্য। কিন্তু ঈশ্বর তাদের দিকে মুখ তুলে তাকাননি। একদিন কাঠুরে দম্পতি খবর পেলো জঙ্গলে এক সাধু বাবা থাকেন, তাঁর আশীর্বাদে অনেক মানুষের অপ্রত্যাশিত ইচ্ছাও পূরণ হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই কাল বিলম্ব না করে তারা গিয়ে পড়লো সাধু বাবার চরণতলে।

তিনি কাঠুরে দম্পতির সমস্ত প্রার্থনা শুনে, ললাট নিরীক্ষণ করে বললেন, দেখো মা, তোমাদের ললাটে পুত্র সন্তান আছে, কিন্তু এই বয়সে তাহাকে পৃথিবীতে আনয়ন করা কি ঠিক হবে? সাধু বাবার মুখে 'কপালে পুত্র সন্তান আছে' এই টুকুই শুনে কাঠুরে দম্পতি আনন্দে উচ্ছ্বাসে কেঁদে কেটে সাধু বাবার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সাধু বাবা তাদের শান্ত করে বললেন, দেখো মা, তোমাদের সন্তান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। কিন্তু প্রবল আকাঙ্ক্ষিত সন্তানের কারণে পিতা মাতাকে যে অনেক কষ্ট পেতে হয়। সাধু বাবার এই অর্থবহ ভারী কথাটা আনন্দ উচ্ছ্বাসে কাঠুরে দম্পতির কর্ণগোচর হলো না। যেন তেন প্রকারেণ সন্তান হওয়ার আশীর্বাদ তাদের চাই–ই চাই।

এক সময় এক সুন্দর মহেন্দ্রক্ষণে কাঠুরের স্ত্রীর কোল আলো করে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান জন্ম নিল। কাঠুরে পরিবারে খুশির জোয়ার বয়ে গেল। শিশুটির নাম রাখলো বোধিরাজ। পরম আদর যত্নে বোধিরাজ ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকলো। বোধিরাজের বয়স যখন এক বছর পূর্ণ হলো, তখন তার মা বাবা বুঝতে পারলো, তার নিম্নাঙ্গের কোনো সমস্যা হচ্ছে। কারণ সে হামাগুড়ি দিতে শেখেনি, বোসতে শেখেনি, হাঁটতে শিখছে না। এই ভাবে আরো একটি

বছর পার করে দিলো। বোধিরাজ ছোট ছোট অনেক কথা বলা শিখে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভালো করে বোসতেই শিখছে না, হাঁটা তো অনেক পরের কথা। প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা করে বোধিরাজকে নিয়ে কাঠুরে দম্পতি বদ্যির কাছে গেল। বদ্যি মহাশয় ভালো করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিছু জড়িবুটি দিয়ে বললেন যে এটি একটি জটিল রোগ। শরীরের উপরের অংশের বৃদ্ধি বয়সের সাথে সাথে হবে। কিন্তু নিচের অংশের বৃদ্ধি তুলনামূলক ভাবে অনেক কম হবে। ফলে বোধিরাজ কোনোদিনই হাঁটা চলা করতে পারবে না। এমন কি দাঁড়াতেও পারবে না।

বদ্যির ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কাঠুরে দম্পতি দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়ে। কিন্তু তাদেরই তো সন্তান, অপত্য স্নেহ তো থাকবেই। ফলে সেই স্নেহছায়ায় বোধিরাজ ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকলো। বোধিরাজের যখন বছর দশেক বয়স, তখন কাঠুরে দম্পতি দেখলো তার বুদ্ধি, চিন্তা ভাবনা আচরণ সবই একটি কুড়ি বাইশ বছরের যুবকের মতো। অথচ সে কোনো চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করতে যায় না। কোনো পণ্ডিত মানুষের সান্নিধ্যে আসেনি। ওই বয়সের সাধারণ পাঁচটা কিশোরের মতো নয়, কেমন যেন অস্বাভাবিকতা বোধিরাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যাইহোক কাঠুরে দম্পতি তাদের পর্ণ কুটিরের দাওয়াতে একটা কেদারায় বোধিরাজকে বসিয়ে কিছু শুকনো খাবার ও জল দিয়ে নিজেদের কাজে চলে যায়। সন্ধ্যার আগে ফিরে না আসা অবধি বোধিরাজ একই ভাবে সেখানে অবস্থান করে। খিদে পেলে শুকনো খাবার খায়। ঘুম পেলে কেদারাতে ঘুমিয়ে পড়ে। যেন প্রকৃতির জীব প্রকৃতির ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠছে। বোধিরাজকে দীর্ঘ সময় কেদারাতে বসেই থাকতে হয়। কাঠুরে দম্পতির খুব দুশ্চিন্তা হয়, জঙ্গলের নিকট কুটির, জীব জন্তুর ভয়ও তো থাকে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, কুটির সংলগ্ন বিচরণ করা ছোট ছোট পশু পাখির সাথে বোধিরাজের একটা প্রাকৃতিক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। পক্ষীকুল তার চার পাশে ঘুরে বেড়ায়, বোধিরাজ শুকনো খাবার ছড়িয়ে দেয়, পাখিরা খুঁটে খুঁটে খায়। নেউল, মেছো বিড়াল, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি ছোট খাটো জীব জন্তুগুলো তার চারপাশে ঘোরাঘুরি করে। বোধিরাজের সাথে তাদের একটা আত্মিক যোগ সূত্র তৈরি হয়ে যায়। পশু পাখির সাথে নিজ নিজ ভাষায় ভাব বিনিময় চলে। এভাবেই চলছিল, একদিন ঘটলো এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা দেখে ওই গ্রামের মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কেদারাতে বসে বোধিরাজ এক ঝাঁক বিভিন্ন ধরনের পাখিকে চাল ভাজা

খাওয়াচ্ছে। এরই মধ্যে কোথা থেকে একটা কোলা ব্যাঙ থপ থপ করতে করতে বোধিরাজের কেদারার পিছন দিকে চলে গেল। বোধিরাজ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাখিগুলো খওয়া ছেড়ে হুটপাটি করে উড়ে পালালো। এরই মধ্যে সরসরিয়ে দাওয়ায় উঠে এলো একটা গোখরো সাপ। সাপটি কেদারার চার দিকে ঘুরতে থাকলো। সাপটি যে ব্যাঙটিকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে তা বুঝতে বোধিরাজের আর বাকি থাকল না। পাখিগুলো সহজাত ক্ষমতার দ্বারা সর্পের উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছিল। একটু দূরে গিয়ে পাখিগুলো খুব ডাকাডাকি করতে লাগলো। প্রতিবেশীরা বুঝতে পারলো পাখির এমন ডাকাডাকির অর্থ। নিশ্চয়ই সেইস্থানে তারা কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। কয়েক জন প্রতিবেশী ছুটে এলো বোধিরাজদের পর্ণ কুটিরে। ঠিক সেই মুহূর্তে কাঠুরেও কাঠ কেটে বাড়ি ফিরে এলো। তারা তো বোধিরাজকে দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। সাপটি কেদারার পায়া দিয়ে উঠে বোধিরাজের পেশীহীন সরু লিকলিকে পা দুটির ভিতরে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাঠুরে কুঠার উঁচিয়ে সাপটিকে মারতে উদ্যত হলো। বোধিরাজ ইশারা করে বাবাকে থামতে বললো। এরই মধ্যে ব্যাঙটা একটা কোণ থেকে দাওয়ার মাঝখানে চলে এলো। এবং সাপ সেটা দেখতে পেয়ে কেদারা থেকে নেমে ব্যাঙটাকে ধরল, তারপর জঙ্গলে চলে গেল। সাপ চলে যেতেই সকলে ছুটে এলো। বোধিরাজ সবাইকে বললো, সাপ হিংস্র প্রাণী নয়, নিরীহ প্রাণী। সে আমাকে ছোবল মারতে আসেনি, ব্যাঙটাকে ধরতে এসেছিল। যখন ব্যাঙ টাকে ধরে ফেললো কোনো দিকে না তাকিয়ে জঙ্গলে চলে গেল। ওকে আঘাত করলে ও হয়তো আমাকে ছোবল মারত।

এই ঘটনা যখন ঘটলো বোধিরাজ তখন অজাত শ্মশ্রু কিশোর। কাঠুরে দম্পতিরও বয়স হচ্ছে। একটা দুশ্চিন্তা তাদের মনপ্রাণকে দিনে দিনে বিধ্বস্ত করে তুলল। তাদের অবর্তমানে বোধিরাজকে কে দেখবে? কি হবে তার দুর্বিষহ জীবনের পরিণতি। যে বাবা মা শয়নে স্বপনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতো একটি সন্তানের আশায়, আজ তারাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে— ঈশ্বর যেন তাদের মৃত্যুর আগে এই ধরাধাম থেকে তাদের প্রাণাধিক সন্তানকে তুলে নেন। স্বামী স্ত্রীতে যখনই ঈশ্বরের কাছে এমন মিনতি করেন, তখন তাদের বুক চাপা কষ্ট অশ্রু হয়ে বেরিয়ে আসে। মা বাবার এই বুক চাপা কষ্ট শয্যাশায়ী বোধিরাজ অনুধাবন করতে পারে। এবং সেও ঈশ্বরের কাছে তার মৃত্যু কামনা করে। এই ভাবে আরো বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

বোধিরাজের বয়স যখন একুশ বছর, তখন একদিন রাত্রে খাওয়ার পর

বোধিরাজের মা তাকে ঠিকঠাক করে শুইয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ বোধিরাজ মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা আমি তোমাদের খুব কষ্ট দেই না? মা ছেলেকে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, না বাবা, তুমি কেন কষ্ট দেবে? আমাদের মতিভ্রমে তোমার আজ এত কষ্ট। বোধিরাজ অশ্রুসিক্ত নয়নে আবেগাপ্লুত হয়ে বলল, মাগো, আমার উপস্থিতি যে তোমাদের শরীর মনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। কাঠুরে বোধিরাজের মুখে এমন কথা শুনে কেঁদে ফেলে জড়িয়ে ধরে বলে সন্তানের মুখ থেকে পিতামাতাকে এমন কথা শোনাও যে মহা পাপ বাবা! বোধিরাজের গায়ের কাঁথা ঠিক করে দিতে দিতে তার মা বললো, তোমার আজ কি হলো বাবা? এসব কথা কেন বলছো? অনেক রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড়ো।

বোধিরাজ ঘুমিয়ে পড়লো, ভোর রাতের দিকে তার শরীরে একটা ঝাকুনি মেরে শরীরটা স্থির হয়ে গেল। বোধিরাজ দেখলো মা, বাবা, সে নিজে শুয়ে আছে। আবার সে নিজে যেন ঘরের মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। এই ভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হল। সে এই স্বপ্নময় অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজের শরীরটাকে নাড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। মা বাবার কাছে গেল, ওদের ডাকার চেষ্টা করলো অনেক। কিন্তু তাও পারলো না। ওর বাবা মা অকাতরে ঘুমোচ্ছে, বোধিরাজ যে এত ডাকাডাকি করছে তা ওর মা বাবার কর্ণ গোচর হচ্ছে না। এরই মধ্যে সে কুটিরের বাইরে পাখির করুণ কলরব শুনতে পেল। সে বাইরে চলে এলো, একটু অবাকও হলো। পাখিগুলো অমন করে ডাকছে কেন! কুটিরের চার দিকে বেজি, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি ছোট প্রাণীগুলো যেন উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। বোধিরাজ ওদের সাথে কথা বলতে চাইলো। কিন্তু পশু পাখি তা বুঝলো না। এরই মধ্যে সে কুটিরের ভিতর থেকে চিৎকার করে কান্নার আওয়াজ পেলো। ঘরে ঢুকে দেখে মা, বাবা তাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে চলেছে। বোধিরাজ মা বাবার কাছে জানতে চাইলো তারা ওকে জড়িয়ে ধরে অমন করে কাঁদছে কেন! পারলো না। আস্তে আস্তে প্রতিবেশীরা ভিড় করলো। বোধিরাজ সব দেখছে, কিন্তু নিজের অস্তিত্বের জানান দিতে পারছে না। এমন কি নিজের শরীরেও প্রবেশ করতে পারছে না। তার বিকলাঙ্গ ঘুমন্ত শরীরটা সকলে মিলে দাওয়াতে এনে রাখলো। চোখে দিলো তুলসী পাতা, গলায় ফুলের মালা। চন্দন নিয়ে সাজাতে এলো, চির দুঃখিনী মাতা। বোধিরাজ স্বপ্ন দেখার মতো সব কিছুই দেখে যাচ্ছে। শুধু স্বপ্নটা আর ভাঙছে না। সে যে মারা গেছে, তার আত্মা বায়ু মণ্ডলে সূক্ষ্মদেহে

ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ছেড়ে আসা স্থূল শরীরটা দাহ করার প্রস্তুতি চলছে। পিতা মাতার জন্য তার খুব কষ্ট হচ্ছে। কষ্ট অনুভব করছে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না। সকলে মিলে তার স্থূল শরীরটাকে নিয়ে শ্মশানে এলো। তারপর কিছু পারলৌকিক কাজ করে, স্থূল শরীরটাকে কাঠের চিতায় শুইয়ে অগ্নি সংযোগ করলো। চোখের সামনে তার শরীরটা পুড়ছে, এবং তার মা বাবার করুণ ক্রন্দন তাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। একটা সময় দাহকার্য সম্পন্ন করে মা, বাবা বাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো। বোধিরাজ চিৎকার করে ডাকলো, কিন্তু তাঁরা পিছন ফিরে তাকালো না। বোধিরাজ বুঝলো মা, বাবা তার মায়া ত্যাগ করেছে। গ্যাস ভর্তি বেলুন যেমন আস্তে আস্তে উপর দিকে ওঠে, ঠিক তেমনি বায়বীয় শরীরে বাবা মা-কে শেষ বিদায় জানিয়ে সে আস্তে আস্তে উপর দিকে উঠতে শুরু করলো।

বায়বীয় শরীরটা একটা সময় একটা বায়বীয় স্তরে গিয়ে দাঁড়ালো। যে স্তরে এমন আত্মা অসংখ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। সময়ের কোনো হিসেব নেই শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা অসহ্য কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করে চলেছে। স্বপ্নে যেমন আমাদের কেউ প্রহার করে বা আমরা আগুনে দগ্ধ হই তখন যেমন আমাদের কষ্ট অনুভব হয় ঠিক তেমনই। বোধিরাজের বায়বীয় শরীর, অন্য যন্ত্রণা ভোগী বায়বীয় শরীরের যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারছে। এরই মধ্যে একটি আত্মার বায়বীয় শরীরটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে ওঠা শুরু করলো। কে যেন বোধিরাজকে বলল ওই আত্মার নরক যন্ত্রণা সমাপ্ত হলো। চললো সে বিধাতা পুরুষের দ্বারে। মহাকালের দ্বারে এসে সময়ের কোনো হিসাব নেই। আদি অনন্ত কাল যেন একটা ছোট্ট দৃষ্টিপটে আবদ্ধ। বোধিরাজের আত্মা শুধুই বর্তমানে বিরাজ করছে। মহাকালের মহা পরিসরে প্রবেশ করায় সে অতীত ভুলে গেছে, ভবিষ্যৎ বিধাতা পুরুষের হাতে। চোখে তার শুধুই বর্তমান। তার বায়বীয় আত্মা গ্যাস বেলুনের মতো আবার ধীরে ধীরে উর্ধ্বমুখী হলো। কে যেন আবার বললো তার ক্ষণস্থায়ী জীবনে পুণ্যের ঝাঁপি পূর্ণ হয়ে আছে, ফলস্বরূপ তার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটতে চলেছে। মানুষের জীবন তো পাপ পুণ্যের মিশ্রণে অতিবাহিত হয়, সেই জন্য ক্ষণকাল নরক দৃষ্ট হয়ে তার স্বর্গে আগমন ঘটছে।

বোধিরাজের বায়বীয় আত্মা একটা সময় গ্যাস বেলুনের মতো আর একটি বায়বীয় স্তরে গিয়ে স্থিতি হলো। এখানে নেই কোনো হাহাকার, দুঃখ, কষ্ট, যাতনা কেমনে হয় কেউ বুঝতে পারে না। শুধুই মনের তৃপ্ত আনন্দ আর প্রাপ্তি। এ যেন এক নৈসর্গিক পরিবেশ। স্বর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে মহাকালে প্রবেশ করে,

ঈশ্বর সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে, বোধিরাজের আত্মা ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হতে থাকলো। তার জ্ঞান বুদ্ধির ভান্ডার পরিপূর্ণ হলো। এভাবে কতদিন অতিক্রান্ত হলো বোধিরাজের বায়বীয় আত্মা সেটা বুঝতেও পারলো না। অবশেষে বিধাতা পুরুষের দুয়ারে এসে উপস্থিত হলো। এমতবস্থায় বোধিরাজের ইহলোকের ক্ষণ জন্মের সমস্ত স্মৃতি পুনরায় জাজ্বল্যমান হলো। ভালো কর্ম ফলের জন্য বিধাতা পুরুষ তাকে কিছু নিজ সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিলেন। এসবই বোধিরাজের আত্মা স্বপ্নের মতো চাক্ষুষ করছে। বিধাতা পুরুষ তার ক্ষণজন্মের পুণ্য ফলের পুরস্কার দিতে চাইলেন। তিনি বোধিরাজকে বললেন, আমি তোমাকে নব জন্মের দ্বারা পুনরায় ইহলোকে প্রত্যর্পণ করিব। কহ, তুমি কিরূপ জীবন প্রত্যাশা করো— শান্তিময় না সুখময়? বোধিরাজের আত্মা একটু ভেবে উত্তর দিলো– – আমি শান্তিপূর্ণ জীবনই কামনা করবো।

বিধিতা পুরুষ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কিসের নিমিত্তে তুমি সুখময় জীবন প্রত্যাশা করো না?

বোধিরাজের আত্মা দৃঢ়ভাবে উত্তর দেয়— সুখ ক্ষণস্থায়ী, মানব জীবনে তা অতিথির ন্যায় স্বল্প সময়ের জন্য বিরাজ করে। ঠিক সেই সময়ে সুখের অনুসারী হয় (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) ষড়রিপু। যারা মনুষ্য জীবনকে মনুষত্ব হীনতায় ভরিয়ে তোলে। জীবন জীবনের পথে চলে না, সে শুধুই নিজের জন্য ভাবে। তড়িৎগতিতে জীবনে প্রবেশ করে, জীবনকে উলটপালট করে ভস্মে পরিণত করে বিদায় লয়। কিন্তু শান্তি, আমৃত্যু মানুষের সাথে থাকে। শান্তি থাকলেই সুখকে অনুভব করা যায়, কিন্তু সুখ থাকলে শান্তিকে অনুভব করা যায় না।

বিধাতা পুরুষ মৃদু হেসে বললেন— তোমার ব্যাখ্যায় আমি প্রীত হইলাম। শান্তি স্বর্গের অগ্রদূত আর সুখ নরকের। এবার কহ, মনুষ্য জীবনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র চতুর বর্ণের কোন বর্ণে তুমি জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক? বোধিরাজের আত্মা এবারও একটু ভেবে বললো, শুদ্রের বংশে। বিধাতা পুরুষ ভীষণ অবাক হয়ে বোধিরাজের আত্মাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি ভাবিয়া কহিতেছ? যেখানে তোমার পুণ্য কর্মের ফলে তুমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মাইতে পারো! তাহা না চাহিয়া তুমি শুদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিতে চাহিতেছ! বোধিরাজের আত্মা এই প্রশ্নের উত্তরে বলিল, ইহলোকে শুদ্রদের বড়ো করুণ অবস্থা, সমাজের নিকৃষ্ট প্রকৃতির কাজ তাদের করতে হয়। যে কাজ তারা না করলে উচ্চ শ্রেণীর উচ্চ জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। আর সেই কাজ করায় তারা

সমাজে অস্পৃশ্য। উচ্চ শ্রেণী তাদের স্পর্শও করে না। এমনকি ঈশ্বরের নামগান ও তারা করতে পারে না। তাঁর চরণতলে পৌঁছনো তো দুরস্ত।

তাদের বাকরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে তাদের আনতে গেলে আমাকে সেই বংশে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তা নাহলে আমি প্রকৃত প্রতিবন্ধকতা অনুধাবন করতে পারবো না। ওদের থাকতে হবে একটা বিনম্র প্রতিবাদ ও বাক স্বাধীনতা, যে তারা সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্টি, তাদের সকলেরই ঈশ্বর সান্নিধ্যে আসার সমান অধিকার আছে। এই কথা শুনে, বিধাতা পুরুষ বললেন, আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। যে মানব, সমগ্র মানব জাতির কথা ভাবে, সর্বোপরি পিছিয়ে পড়া মানব গোষ্ঠীর কথা, সেতো মহা মানবের সমতুল্য। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছে মানুষ, আর মানুষ সৃষ্টি করেছে জাতি। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা তৈরি হলো, তোমার কর্মফল অনুযায়ী আমি তোমাকে শুদ্র কুলে পাঠাইতে পারি না। স্বর্গেরও তো কিছু নিয়ম শৃংখলা আছে। বিধাতা পুরুষের কথা শুনে বোধিরাজের আত্মা বললো, একটি গাছ থেকে ফুল তুলে, মালা গেঁথে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করার সময় দেখা হয় না কোন ফুলটি বড়ো, কোনটি গন্ধ বেশি বা কোনটি বেশি রঙিন। সব ফুল একই সুতায় গেঁথে ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করা হয়। আমি চাই সমস্ত মনুষ্যকুলকে মালার ন্যায় গাঁথিয়া ঈশ্বরের আঙিনায় নিয়ে যেতে। বিধাতা পুরুষ বলিলেন তবুও আমি তোমাকে শুদ্র কুলে পাঠাইতে পারি না। তুমি ক্ষত্রিয়কুলে এক রাজ মাতার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবে। তবে রাজ সুখ তোমার অভীষ্টের কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে। লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, অবহেলিত পিছিয়ে পড়া মনুষ্যকুল তোমাকে পথ প্রদর্শক মানিয়া অনুসরণ করিবে। তুমিই তাদের পথ দেখাইবে। বোধিরাজের আত্মা নব নব জ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করে ইহলোকের লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে থাকলো। এদিকে পৃথিবীতে তখন কোনো এক গর্ভধারিণী রাজমাতা শিশু ভূমিষ্ঠের অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকলো। ❑

একুশে ফেব্রুয়ারি

আজ একুশে ফেব্রুয়ারি, এই দিনে ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এই দিনটি স্মরণ করার লক্ষ্যে আমরা সবাই এই সভাগৃহে উপস্থিত হয়েছি। মূলত আজকের প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীরা উপস্থিত, যারা আগামীদিনে এই বাংলা ভাষা উৎকর্ষের সাথে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ধারক ও বাহক হবে। আমাদের এই আলোচনা সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করতে, আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন, গোবরডাঙা হিন্দু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা প্রখ্যাত সাহিত্যিক উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। সভা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ওনাকে আমরা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ওনার মহা মূল্যবান বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

গৌরবর্ণ হালকা চেহারার, ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত, সদাহাস্যময় মধ্যবয়স্ক মানুষটি মঞ্চে উপস্থিত হলেন এবং ওনার মহামূল্যবান বক্তব্য শুরু করলেন —উপস্থিত শ্রদ্বেয় ভদ্রমণ্ডলী ও আমার সন্তানসম ছাত্রছাত্রীরা, সবাইকে আমার সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমি অল্প কয়েকটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। আমি যে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করবো, তা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর জন্য নয়, কারণ আমি যা বলবো সেটা তাঁরা জানেন। আমি তোমাদের (ছাত্রছাত্রীদের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) জন্য সামান্য কয়েকটি কথা বলবো।

দেখো, আজ একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরা সবাই যে একত্রিত হতে পেরেছি এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। কারণ এই সুমধুর বাংলা ভাষায় শুধু কথা বললেই হবে না, এটিকে আরো সমৃদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সারা বিশ্বে এই একটি ভাষা আছে যে ভাষাতে একটা সাংকেতিক চিহ্ন বদলে মনের ভাব বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা যায়। সেই জন্য বাংলা ভাষা ভীষণ কঠিন, আবার খুব সুন্দরও বটে। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটা গল্প বলি শোনো—বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা। একটি স্কুল পরিদর্শনের জন্য নৌকোতে চলেছেন চারজন। উনি আর মাঝি ছাড়া সাহেব আর তাঁর ব্রিটিশ ভৃত্য আছে। কথা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবকে বললেন যে, ইংরেজির থেকে বাংলা অনেক কঠিন ভাষা। কিন্তু সাহেব তো মানবার পাত্র নন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবকে বললেন, ঠিক আছে, আপনি আপনার ভৃত্যকে আপনাদের মাতৃভাষায় কিছু বলুন। তারপর দেখুন সে বোঝে কিনা। আর আমি

ঐ মাঝিকে কিছু বলবো দেখবো সে বোঝে কিনা। সাহেব তো সম্মতি জানিয়ে ভৃত্যকে ইংরেজিতে কয়েকটি কথা বললেন। ভৃত্য কথাগুলি বুঝে উত্তরও দিলেন। এইবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পালা। উনি মাঝিকে বললেন, ওহে কাণ্ডারী, তোমার তরী তুমি তীরে ভিড়াও। মাঝি আপন মনে দাঁড় বাইতে থাকলো। সে কোনো মন্তব্য করলো না। কারণ সে বোঝেইনি তাকে কি বলা হলো। এবার বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবকে বললেন, দেখলেন তো সাহেব, মাঝি আমার বাংলা কথা বুঝলো না। যাইহোক, এই যে বাংলা ভাষাকে আমরা সুমধুর ভাষা বলি, এই স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনেস্কো। (Bengali language is the sweetest language of the world.) বিশ্বে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছেন আমাদের পূর্বসূরি মহাপ্রাণ বাঙালিরা। যাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন। তাঁরা যে অস্ত্রকে (কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান ইত্যাদি) পাথেয় করে লড়াই করেছিলেন, সেই সব অস্ত্র সম্ভার তৈরি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, নজরুল, মধুসূদন, জসীমউদ্দীন আরো হাজারো নাম আছে। তাঁদের সৃষ্টিগুলো পাথেয় করে আমরা আজও এগিয়ে চলেছি। নতুন করে আর সৃষ্টি হচ্ছে কই? ওইসব মনীষীদের আমি সাধক বলি। তাঁরা ভাষা দেবীর সাধক। অনেক সাধনা করে মা সরস্বতীর বর পেয়ে এইসব গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই সম্পদ স্বযত্নে সুব্যবহার করাই তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। কিছুদিন আগে, আমার একটি ছাত্র আক্ষেপ করে আমাকে বলল, স্যার, সেই সব মানুষ কত ভাগ্যবান যারা এই সব মনীষীদের জীবিত কালে তাঁদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছেন। আমি ওকে বললাম কে বলেছে আমরা তাঁদের সান্নিধ্যে নেই। তারা আজও বেঁচে আছেন। বেঁচে থাকবেন তোমাদের মধ্য দিয়ে। তোমাদের মনে আর বই–এর পাতায় জাগ্রত দেবীর মত। একটা কথা সর্বদাই মনে রাখবে। তাঁরা সশরীরে যতদিন বাঁচেন, অশরীরে বাঁচেন তার থেকে অনেক বেশি দিন, তাঁদের কর্মের মধ্য দিয়ে। তাই তোমাদেরও সেই পথ অনুসরণ করতে হবে, যে পথে তোমরা মাতৃভাষাকে বয়ে নিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে পারো। তার মানে আমি কিন্তু বলছি না যে, তোমরা অন্য ভাষা পরিত্যাগ করে শুধু বাংলা ভাষাই জানো। তাহলে বিশ্বায়নের যুগে অন্নের সংস্থান হবে না। অনেক বাঙালি ভিনদেশে বা ভিনরাজ্যে কর্মরত। তাকে তো সেখানকার ভাষা জানতেই হবে। কিন্তু দেশে ফিরে কথা–বার্তায় যেন ভিনদেশি ভাষার প্রভাব না থাকে। ভাবখানা যেন এমন না হয়, দেখো আমি কেমন অন্য ভাষা শিখেছি। বাংলা ভাষায় আমরা আমাদের মনের

ভাব যত সুন্দর প্রকাশ করব, তা অন্য ভাষায় কখনোই সম্ভব নয়।

আর একটা কথা বলি, সমস্ত পিতা মাতার উদ্দেশ্যে— কয়েক দিন আগে আমি একটা মুদি দোকানে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম। ঠিক সেই সময় সেখানে একটা বছর বারোর বাচ্চা ছেলে এসে দোকানদারের কাছে পাঁচশো মুসুর ডাল কিনলো। দোকানদার ঊনপঞ্চাশ টাকা দাম চাইলে, বাচ্চাটি দোকানদারের মুখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললো তার মানে? তখন দোকানদার একটু মুচকি হেসে ফোরটিনাইন বললে বাচ্চাটি ওকে দাম মিটিয়ে চলে গেলো। অর্থাৎ ঐ বাচ্চাটিকে সরাসরি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। ও ধারাপাত, সহজপাঠ, বর্ণ পরিচয় কিছুই জানেনা। বাড়ি এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে যেটুকু বাংলা শুনছে সেইটুকু শিখছে। মনে রাখতে হবে, সাহেবরা ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলতে হলে, যতটুকু ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন হতো ততটুকুই বলতেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথা বলবার সময় মাতৃভাষায় কথা বলতেন। আমরা ঠিক তার উল্টোটা করবার চেষ্টা করি। কারণ, আমাদের মধ্যে আমিত্ব প্রমাণ করার প্রবণতা প্রবল।

পরিশেষে বলি, স্থানভেদে ভাষা অপভ্রংশ হয়ে যায়। তবে বাংলা বাংলাই থাকে। তার মধ্যে ইংলিশ, চাইনিজ, জাপানিজ বা হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি যেন মিশেল না থাকে। আমরা যদি এটা ঠিক মত মেনে চলতে পারি তো, এই ভাষা অন্য ভাষার মত সারা বিশ্বে মহীরুহ হোয়ে বিরাজ করবে এবং সেটা আগামী প্রজন্মের উপর আমরা ভরসা করতে পারি। ❑

এ প্লেটোনিক লাভ স্টোরি

তুই তো বসিরহাট বিএলআরও-তে আছিস, সময় সুযোগে হাসনাবাদে রতন মণ্ডলের বাড়ি গিয়ে জমির টাকাটা নিয়ে আসতে পারিস তো?

অপু, ওরফে অপরেশ লাহিড়ীকে ওর বাবা খানিকটা অনুরোধের সুরেই কথাগুলো বলেন। একসময় বসিরহাটে অপুদের পৈতৃক বাড়ি ছিল। সেসব এখন শরিকানা ভাগ বাটোয়ারায় কিছুই নেই। আবাদি জমি এদিক ওদিক অনেক ছিল, যদিও সেগুলো ভাগ চাষিদের হাতে। হাসনাবাদের বিঘা চারেক আবাদী জমি অপুদের ভাগে পড়েছিল। সেটা এখন ভাগ চাষে দেয়া আছে। বছরান্তে কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যায় বটে, তবে কলকাতা থেকে যাওয়ার অভাবে টাকা নেয়া হয় না। বছর চৌত্রিশের অপু বসিরহাট বিএলআরও-তে সদ্য জয়েন্ট করেছে। অপু ছোট বেলায় ওদের গ্রামের বাড়ি গরমের ছুটিতে বেড়াতে আসতো সে ওই তেরো চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত। উঁচু ক্লাসে উঠে পড়ার চাপে আর আসতে পারেনি। আজ আঠারো কুড়ি বছর পর চাকরি সূত্রে বসিরহাটে আসা। এতদিনে ইছামতী নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। যাইহোক অপু ঠিক করলো সামনের শনিবারে সে হাসনাবাদ গিয়ে রতন মণ্ডলের সাথে দেখা করবে।

ভাঙাচোরা একটা খড়ের চালা, মাটির স্যাঁতসেঁতে মেঝে, উঠোনে কয়েকটি ইঁট পাতা যার উপর দিয়ে জল এড়িয়ে ঘরে ঢোকা যায়। গুটি কয়েক মুরগি উঠোন এবং ঘরের বারান্দায় ঘুর ঘুর করছে। উঠোনে একটা গরু বাঁধা, একটু দূরে তার বাছুরটি মাঝে মাঝে ডেকে চলেছে তার মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য। অপু খোঁজ নিলো ওটাই রতন মণ্ডলের কুঁড়ে ঘর। একপা দুপা করে অপু বাড়ির ভিতর ঢুকলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে না দেখতে পেয়ে অপু ডাকলো, রতনদা বাড়ি আছেন নাকি? কোনো উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলো। এবার একটি বছর আটেকের ছেলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, আলগা মলিন গায়ে। অপু একটু ভেবে বললো, তোমার বাবা বাড়িতে আছেন? ছেলেটি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলো। অপু আবার ডাকতে যাবে, এমন সময় বছর দশেকের একটি মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। অপু মেয়েটিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। স্বাস্থ্যবতী, বড় বড় চুলগুলোকে লাল ফিতে দিয়ে বেঁধে দুই ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেয়া। ডাগর ডাগর চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অপুর দিকে তাকিয়ে থাকলো। অপুর মেয়েটিকে ভীষণ চেনা মনে হলো। এই মুখ কোথায়

যেন সে দেখেছে। মেয়েটি বলল, আপনি কোথা থেকে আসছেন? অপু আরো অবাক হলো, গলাটিও যেন খুব চেনা। মেয়েটি একই প্রশ্ন আবার করলো। অপু ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি কলকাতা থেকে আসছি, তোমার বাবা বাড়িতে আছেন? মেয়েটি কিছু বলবে বলে বাবা শব্দটি উচ্চারণ করতেই ভিতর থেকে একটি মহিলা কণ্ঠ মেয়েটিকে ঘরের ভেতর ডেকে নেয়। অপু মিনিট খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েটি আবার ঘর থেকে বেরিয়ে অপুর সামনে দাঁড়ালো। পিছনে চৌকাঠ অবধি এসে দাঁড়ালো সম্ভবত সেই নারী কণ্ঠী ভদ্র মহিলা। পরনে সাদা থান, অবগুণ্ঠনাবৃত। অপু একটু মিষ্টি হেসে বললো, তোমার নাম কি? মেয়েটি বলল, বিমলা অপু আবার অবাক না হয়ে পারলো না। নামেতেও একটা চেনা আভাস পাচ্ছে। অপু ভাবনাগুলোকে মাথা থেকে তাড়িয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলো, কৈ তোমার বাবা কোথায় গেছেন বললে না তো! বিমলা মায়ের দিকে একবার দেখে নিয়ে বললো, বাবা এক বছর হলো মারা গেছে। অপু সহমর্মিতা দেখিয়ে বিমলার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, সেকি কিভাবে? বিমলা একটু কাঁদো কাঁদো সুরে বললো, সাপের কামড়ে অপু খুব অস্বস্তিতে পড়লো, তারপর ভদ্র মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি কি আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি? ভদ্রমহিলা বিমলাকে একটা বসার জায়গা দিতে বললো। বিমলা একটা পিঁড়ি এনে বসতে দিলো। অপু পিঁড়িতে বসে বললো, দেখুন আমার বাবার অনেক বয়স হয়েছে, উনি জমি জমা দেখভাল করতে আসতে পারেন না, সেইজন্য আমার আসা। কিন্তু এসে যা শুনলাম তাতে আমি খুবই মর্মাহত। আমার আসার উদ্দেশ্য এখন মূল্যহীন, আপনাদের এই পরিণতি কি ভাবে হলো আমি কি তা শুনতে পারি? ভদ্রমহিলা এই কথার উত্তর না দিয়ে, ধীর স্থির নম্র ভাবে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আপনি কি অপু? অপু রীতিমতো বিস্মিত, মনে মনে ভাবলো এনার তো আমার নাম জানার কথা নয়। তাহলে উনি কি আমাকে আগে থেকে চিনতেন! অবগুণ্ঠনাবৃত মহিলাকে অপু জিজ্ঞাসা করলো, হ্যাঁ, আচ্ছা আপনি কিভাবে আমার নাম জানলেন? অবগুণ্ঠনাবৃত ভদ্রমহিলা উত্তর না দিয়ে আবার প্রশ্ন করে কমলা বলে আপনার কাউকে মনে পড়ে? অপু চমকে ওঠে, বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করে, কে আপনি? ভদ্রমহিলা ঘোমটা সরিয়ে মুখটা উন্মুক্ত করে অপুর দিকে ঘুরে তাকায়। দুই চোখ ছল ছল করছে জল পূর্ণ হয়ে। অপু মুখের দিকে তাকিয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। অস্ফুটে মুখ থেকে বেরিয়ে যায় কমলা !!! অশ্রুপূর্ণ টলটলে চোখে অপু দেখতে পেল তার হারিয়ে যাওয়া আঠারো বছর

আগের স্মৃতি।

বসিরহাটের হাটখোলা গ্রামে অপুদের শরিকানা বাড়ি। বছর চোদ্দ পনেরোর অপু এসেছে গরমের ছুটিতে এখানে বেড়াতে। এখানে প্রায় প্রতিটা বাড়িতে তাঁত আছে, কারণ ঘরে ঘরে কুটির শিল্পের মতো গজ কাপড়ের কারবার। অপুর কাকাদেরও ওই একই ব্যবসা। বাড়িতে গোটা পনেরো তাঁত আছে। কাক ভোর হতেই ওই এলাকায় গজ কাপড় তৈরির কাজ শুরু হয়ে যায়। অপুর কাকার বাড়িতেও তাঁতের খট খট আওয়াজে চারদিক মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। চারদিক মাতোয়ারা বলার কারণ মূলত মহিলারাই এই এলাকার তাঁত শ্রমিক। এরা তাঁত চালাতে চালাতে নিজেদের মতো করে লোকগীতি, ভাটিয়ালি, চটকদারি গান গাইতে অভ্যস্ত। ফলে তাঁতের খটা খট আওয়াজ আর অপরিণত বেসুরো গানের আওয়াজ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

কিশোর অপুর ঘুম ভাঙল ঠিক এমনি এক নতুন শব্দের ভোরে। তাঁতের খটাস খটাস আওয়াজের সাথে একটা সুন্দর ভাটিয়ালি গান অপুর কানে ভেসে এলো— পদ্মা নদীর মাঝি তুমি নাও বাইয়া যাও যেথায় তোমার পরান চায় সেথায় লইয়া যাও। অপুর মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। রেডিওতে অনেক ভাটিয়ালি গান শুনেছে, সেগুলো অনেক সুন্দর, কিন্তু তাতে কোনো রিয়েলিটি নেই। যান্ত্রিকতা বর্তমান, এখানে মেয়েলি গলায় তাঁতের শব্দ মিশে একাকার হয়ে যাওয়া গানটি অপুর মনকে আরো আকর্ষণ করলো। গাত্রোত্থান করে গানের উৎস সন্ধানে এগিয়ে গেলো। তাঁত ঘরে ঢুকে দেখে, তাঁতটি চালাচ্ছে এক ষোড়শী, শ্যামবর্ণা, লাবণ্যময়ী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। স্কার্ট জামা পরে, লাল ফিতের বেণী ঝুলিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে গান করে চলেছে। কোনো দিকে তার দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি শুধু তাঁতের মাকুর দিকে, যদি সুতো ছিঁড়ে যায়। অপু কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে বিভোর হয়ে গানটি উপভোগ করতে থাকলো।

তাঁতটি থেমে গেলো, মনে হয় সুতো ছিঁড়ে গেল। ঠিক তাই, মেয়েটি মাথা ঝুঁকিয়ে সুতো ঠিক করে পুনরায় তাঁত চালাতে গিয়েই অপুকে দেখতে পেলো। প্রায় তার বয়সী অপুকে তার দিকে ওই ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার নাম কি?

— অপরেশ লাহিড়ী,সবাই অপু বলেই ডাকে, তোমার নাম?''

— কমলা, বলেই কমলা তাঁত চালাতে শুরু করে। কিন্তু গান ধরে না। মিনিট খানিক অপেক্ষা করে অপু কমলাকে জিজ্ঞাসা করে সে গান করবে কিনা। কমলা একটু মুচকি হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে কেন আমার গানের গলা কি খুব

সুন্দর? অপু একটু লজ্জা পেয়ে কিছু না বুঝে বললো, এমনি। কমলা আবার আগের মতো তাঁত চালিয়ে গান গাওয়া শুরু করলো। অপু উদাস হয়ে কমলার দিকে চেয়ে থাকলো।

ওখানেই তাঁত চালায় বাইশ চব্বিশ-এর পূর্ণিমা ও শেফালী। তারা গল্প করতে করতে তাঁত ঘরে ঢুকেই অপুকে দেখতে পায়। অচেনা অপুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পূর্ণিমা কমলার কাছে ব্যাপারটা জানতে চায়। কমলাও অপু এসে দাঁড়ানোর কারণটা বলে। পূর্ণিমা মাকুতে নলি পরাতে পরাতে ব্যঙ্গের সুরে বললো, তোর গান মনে ধরেছে না তোকে মনে ধরেছে। কথাটি বলেই পূর্ণিমা ও শেফালী হো-হো করে হেসে উঠলো। ঠিক সেই সময় অপুকে তার কাকিমা ডাকায় অপু ছুটে চলে যায়।

পরদিন কমলা কাজে আসার সময় জামরুল খেতে খেতে আসছিল। হঠাৎ ওর অপুর কথা মনে হলো। ভাবলো সেতো ভালো গান জানে না, অপু তাহলে তার মধ্যে কি পেলো! অপু কি পেলো কমলা তা ঠিক না বুঝলেও, এক দিন কিছুক্ষণের দেখায় ষোড়শী কমলা তার শরীর মন দিয়ে অনেক কিছু ভেবে নিলো। যা আগে কখনো সে ভাবেইনি। কমলা আর জামরুল না খেয়ে গোটা পাঁচেক রেখে দিল।

তাঁত চালাতে চালাতে ভাবলো অপু আসলে জামরুলগুলো দেবে। কিন্তু অপু তখনো না আসায় কমলা একটা ইচ্ছে না মেটার অস্বস্তি অনুভব করলো। পাশাপাশি এটাও ভাবলো পূর্ণিমাদি শেফালী দির সামনে দেয়া যাবে না, ওরা আবার কি বলে বসবে। কিন্তু অপু তখনো না আসায় কমলা একটা ভাটিয়ালি সুর ধরে, পরান বনধু রে, মোর ললাটে তোর দেখা নাহি হয় আনচান করা নয়ন যে মোর তোকে খুঁজে বেড়ায়। এদিকে অপু ভাবছে তাঁত চলছে কিন্তু গান তো হচ্ছে না। যখনই কমলা ভাটিয়ালি সুর ধরল অপুও গুটি গুটি পায়ে তাঁত ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। কমলা যেন এই মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। গান থামিয়ে, তাঁত বন্ধ করে জামরুলগুলো নিয়ে এগিয়ে এসে বললো, এগুলো খাও, খুব মিষ্টি। অপু ফল খুব ভালোবাসে, কমলার হাত থেকে নিঃসঙ্কোচে যেই জামরুলগুলো নিতে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তেই পূর্ণিমা শেফালী এসে পড়ল। পূর্ণিমা বক্র হাসি হেসে বলল, কিরে কমলা কি দেওয়া নেওয়া চলছে? শেফালী বললো, প্রথম প্রথম না হয় ফলই হোক। কমলা গম্ভীরভাবে তাঁতে গিয়ে বসল। অপু কিছু বুঝুক না বুঝুক এটুকু বুঝলো, পূর্ণিমা, শেফালী ভালো মেয়ে নয়। সে ওখানে না দাঁড়িয়ে চলে আসল। সেদিন সন্ধে বেলা গজ কাপড়ের হিসাব

দেওয়ার সময় অনিলবাবু কমলার উপর রেগে গিয়ে বললেন, কমলা তোর কাপড়ের বুনন কিন্তু ভালো হচ্ছে না। নজর দিয়ে কাজ করিস না? পূর্ণিমা কমলার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করে বলে— নাগো কাকা কমলার নজর শুধু কাপড়ে থাকে না, তাই না শেফালী? পূর্ণিমা, শেফালী এক সাথে হো হো করে হেসে উঠে।

পরদিন কমলা কাজে আসলনা, তার মা কাজে না যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে সে বলল তার নাকি প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকে। মাথার যন্ত্রণা তো নয়, মনের যন্ত্রণা তার প্রবল হয়ে চলেছে। কমলার কিছুই ভালো লাগছে না, ঘুমও যদি আসতো তা হলে একটু শান্তি পেতো। বালিশে মাথা গুঁজে সে মনে মনে ভাবল, তার জন্যে অপুকেও কটু কথা শুনতে হয়েছে।

সকাল থেকে তাঁতের খট খট আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অপু ভাটিয়ালি সুর শুনতে পাচ্ছে না। যে গানের আওয়াজ পাচ্ছে সেটা যে কমলার নয় তা অপু ভালোই বুঝতে পারছে। অপুর যেন কিছুই ভালো লাগছে না। কি যেন একটা মিস করছে। বিরাট বাগান বাড়ি, ভাবলো আম বাগানে গিয়ে পাকা আম খেয়ে আসবে। আম বাগানে যাওয়ার রাস্তা তাঁত ঘরের পাশ দিয়ে গেছে। অপু যখন তাঁত ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে দেখার চেষ্টা করেছিল কমলা সেখানে আছে কিনা। কিন্তু তাঁত ঘরের পাশে যেতেই মহিলা কণ্ঠের হিন্দি গান থেমে গিয়ে শুনলো, আজ কমলা নেই, তাই আমার মনও ভালো নেই। এই বলে হো হো করে হেসে উঠলো। অপুর বুঝতে অসুবিধা হলো না, যে পূর্ণিমাদি, শেফালীদি তাকে দেখেই কথাটি বললো।

পর দিন ছিল হাটখোলার হাট, হাটে খুব তেলে ভাজা উঠে, অপু গরম গরম পিঁয়াজি খুব ভালোবাসে, এক ঠোঙা পিঁয়াজি কিনে খেতে গিয়েই ওর কমলার কথা মনে পড়লো। বাড়িতে এসেই অপু তাঁত ঘরে চলে যায়। ভাগ্যক্রমে সেখানে তখন পূর্ণিমারা ছিল না। অপুকে দেখে কমলা খুশিতে আত্মহারা। অপু জিজ্ঞাসা করলো যে, সে গতকাল আসেনি কেন? কমলা কি উত্তর দেবে ভেবে পাচ্ছিলো না। একটা অনাবিল আনন্দের ঢেউ এসে তার মন প্রাণ সব সিক্ত করে দিল। আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল, কাল আমার মনটা ভালো ছিলো না। কাল আমি আসিনি ঠিকই, কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসা করছো কেন গো? কমলা তার মনের মতো উত্তরের অপেক্ষায় অপুর মুখের দিকে চেয়ে থাকলো। —কাল আম গাছ তলায় আম কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তোমাকে দেব বলে এসে দেখি তুমি

নেই। অপুর থেকে কমলা বছর দুই এর বড়ো, তাছাড়া সমবয়সী ছেলের থেকে মেয়েদের মানসিক উন্নতি সব সময়ই বেশি। কমলা খুশিতে গদ গদ হয়ে বলল তুমি যে আমার এখানে এসেছিলে এটা শুনেই আমার ভীষণ ভালো লাগছে। অপু এবার পিছন থেকে পিঁয়াজি ভরা ঠোঙাটা কমলার সামনে আনলো। কমলা অবাক বিস্ময়ে বললো, কি আছে ঠোঙায়?

— হাটে গিয়েছিলাম, পিঁয়াজি কিনেছি। কমলার জন্য অপু পিঁয়াজি কিনেছে, এটা কমলা ভাবতেই পারছে না। আনন্দে কমলার চোখে জল এসে গেল। পিঁয়াজির ঠোঙাটা অপুর হাত থেকে নিয়ে বললো, বলো, তুমি আমার কাছে কি চাও? অপু একটু ভেবে বললো, কিছু না। কমলা অপুর দিকে তাকিয়ে খুশিতে ডগোমগো হয়ে বলল, কিছুতো বলো, আমারও তো ইচছা করে তোমাকে কিছু দিতে অপু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, কমলার দিকে তাকিয়ে সরল হাসি হেসে 'গান' বলেই দৌড়ে পালালো।

কমলার জীবনে এতো ভালো দিন আর আসেনি। পূর্ণিমা শেফালী আসছে দেখে ওর রাগ না হয়ে আনন্দ হলো বেশি। জোর করে ওদের পিঁয়াজি খাওয়ালো। পূর্ণিমা শেফালীতো অবাক মেয়েটির হলো কি। কমলা তাঁতে বসে ভাটিয়ালি সুরে গান ধরলো। পূর্ণিমা শেফালী আর গান ধরতে পারল না। কারণ কমলা নদী মাত্রিক ভাটিয়ালি গান যেন আজ অন্য মাত্রায় গেয়ে চলেছে। যেমন তার সুর তেমন তার কথা। বিকালে গজ কাপড় জমা দেয়ার সময় অনিলবাবু খুব প্রশংসা করলেন। আজ গজ কাপড়ের বুনন তো ভালো হয়েছে, উপরন্তু একটি কাপড় বেশি বুনেছে।

পরদিন কমলা গাছের জাম কিছুটা পেড়ে ঠোঙায় ভরে নিয়ে কাজে এলো। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তার মনকে উথাল পাথাল করে দিচ্ছে। সে মনে মনে ভাবছে, মনের না বলতে পারা কথাগুলো যদি মন উজাড় করে কাউকে বলতে পারত, তাহলে মনটা একটু হালকা হতো। পূর্ণিমা শেফালী এসে দেখে কমলা তাঁতে বসে পড়েছে, পাশে এক ঠোঙা কালো জাম। পূর্ণিমা মুচকি হেসে বলে, কিরে কমলা, জাম আমাদের জন্যে এনেছিস না অন্য কারো জন্যে? কমলা রাখঢাক না করে বলে দিল যে সে সত্যিই অপুর জন্য এনেছে। এই কথা শুনে পূর্ণিমা শেফালী ভীষণ সিরিয়াস হয়ে কমলাকে বোঝালো, কমলা, তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোথায় তুই আর কোথায় অপু, তাছাড়া অপু তোর থেকে ছোট, এটা তুই বুঝতে পারিস না?

কলকাতার ছেলে বেড়াতে এসেছে দুদিনের জন্যে, দুদিন পরে ফিরে যাবে।

মধ্যে পড়ে তোর মনটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে লাভ কি! কমলার চোখ জলে ছল ছল করে উঠলো। যুক্তি বুদ্ধি, জ্ঞান, বিবেচনা, উচিত, অনুচিত সব কিছুর বাইরের এক জগতে তার মন বিচরণ করছে। পাগলপারা মন যে বাঁধ মানতে চায় না। এরই মধ্যে অপু একটা বল নিয়ে খেলতে খেলতে তাঁত ঘরের কাছে এসে পড়ে। কমলা দেখতে পেলো, খুব কষ্ট হলেও কিছু বললো না। শেফালী অপুকে দেখতে পেয়েই ডাকলো। অপু আসতেই পূর্ণিমা বললো, এইনে অপু জাম খা। অপু পূর্ণিমা শেফালির এহেন আচরণে খুব অবাক হলো। মুখে কিছু না বলে কমলার দিকে তাকালো। কমলা কথা না বললেও চোখের ভাষা বুঝিয়ে দিলো সে যেন জাম নেয়।

অপু এক মুঠো জাম নিয়ে চলে গেল।

সেদিন সারা রাত কমলা দুই চোখের পাতা এক করতে পারেনি। বিভিন্ন রকম অযৌক্তিক চিন্তা ভাবনা তার বাস্তবতাকে তালগোল পাকিয়ে দিলো। পরদিন একটু বেলাতে কমলা কাজে আসছিল, অন্য সময় হলে হয়তো আসতো না। অপু গিয়েছিল মুদির দোকানে, ফেরার পথে দুজনের দেখা। অপু কমলাকে জানালো, গতকাল রাতে তার বাবা এসেছেন, আজ দুপুরের পর সে কলকাতায় ফিরে যাবে। কমলার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। এমন একটা কথা শুনবে সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো, তারপর অপুর চোখে চোখ রেখে ছল ছল নয়নে বললো, অপু আমাকে তোমার মনে থাকবে? অপু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ সম্মতি জানাতেই, অপু দেখলো কমলার দুই চোখ দিয়ে অঝোরে জলধারা নেমে এসে চিবুক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। জামার নিচের অংশ দিয়ে চোখ মুছে কমলা বলল, তুমি বাড়ি যাও। অপু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কাজে যাবে না?

না বলে কমলা দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে চলে যায়।

বাড়িতে গিয়ে কমলা বালিশে মাথা গুঁজে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে। পূর্ণিমাদি ঠিকই বলেছে, দোষ তার নিজের, কিন্তু কিভাবে কি হয়ে গেল সে নিজেই বুঝতে পারলো না। কাঁদতে, কাঁদতে কমলা ঘুমিয়ে পড়লো। ঘন্টা দুই পরে কমলার ঘুম ভাঙলে ওর মনে হলো একবার কাজের ওখানে গেলে অন্তত শেষ বারের মতো অপুকে দেখতে পাবে।

কলকাতায় ফেরার জন্য অপু একদম রেডি। সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে নিচ্ছে। পূর্ণিমা, শেফালীও এসে দাঁড়ালো। অপুর মনের ভিতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি হতে লাগলো। কিছু যেন একটা বাকি থেকে যাচ্ছে। ওর চোখ

দুটি যেন কিছু খুঁজছে। হঠাৎ অপুর চোখ পড়ল তাঁত ঘরের দরজা ধরে কমলা দাঁড়িয়ে। অপু বিষণ্ণ মুখে কমলার দিকে হাত নেড়ে বিদায় নিল।

অপু চলে যেতেই কমলা এক বুক মেঘ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সপ্তাহ খানিক কমলার পৃথিবীতে সূর্য ওঠেনি। অঝোরে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

কমলার মেয়ে বিমলা এক গ্লাস লেবুর জল এনে অপুকে দিলো। অপু পুরনো স্মৃতি থেকে বেরিয়ে এসে জলের গ্লাসটা ধরে বলল বাঃ তোমার মেয়ে তো বেশ তোমার মতোই হয়েছে। অপুরও পিপাসা পেয়েছিল, এক লহমায় এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়ে কমলাকে বললো, বিশ্বাস করো, আমি আঠারো বছর আগের সেই অজানা ভাষা বুঝতে পারিনি। বোঝার জন্য যে মন লাগে সে মন তখনো আমার তৈরি হয়নি। বুঝেছি আরো বছর পাঁচেক পর। তখন আমি সেই স্মৃতিগুলো মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছি। ছুটে এসেছি বসিরহাট। তোমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, পাইনি। তাঁত ঘরে ঢুকে দেখি পুরনো একজনই আছে, কেষ্ট কাকা। তিনি বললেন, ওদের সব বিয়ে থা হয়ে গেছে, পূর্ণিমার বিয়ে হয়েছে হাটখোলার মোড়ে। সেখানে গেলে কমলার খবর পাবে। কোনো লাভ নেই ভেবে ফিরে আসি। আজ যে এই ভাবে দেখা হয়ে যাবে সেটা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। ঈশ্বরের অসীম কৃপা না থাকলে এটা সম্ভব হতো না।

সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় হয়ে এলো। অপু রতন মণ্ডলের মৃত্যু থেকে বর্তমান পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে শুনলো। কমলার চোখের ভাষা বলছে, সে আরো খানিক্ষণ থাকলে কমলা খুশি হবে। কিন্তু তার আর উপায় নেই দেখে অপু বললো, কলকাতায় ফিরতে হবে তো, আজ চলি, আমি আবার আসবো। এই বলে অপু পকেট থেকে দুইশ টাকা বার করে বিমলার হাতে দিয়ে বললো, আমি তো হঠাৎ এসে পড়েছি, এটা রাখো কিছু কিনে খেও। বিমলা ইতস্তত করায় কমলা বিমলাকে টাকাটা নিতে বলে। তারপর অপুকে বলে, তোমাকে তো কিছুই খেতে দিতে পারলাম না। অপু কমলার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, আজ থাক অন্য দিন এসে তোমার হাতের তৈরি কিছু খেয়ে যাবো।

অপু ওয়াশ রুম থেকে ফ্রেশ হয়ে, ড্রইং রুমে গিয়ে বাবার পাশে সোফাতে বসলো। অপুর মা হালকা টিফিন আর এক কাপ রেড টি এনে অপুকে দিলো। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ার কারণ জানতে চাইলে অপু জানায় সে আজ হাসনাবাদে রতন মণ্ডলের বাড়িতে গিয়েছিল। অপুর বাবা অপুর কাছে জানতে চাইলেন যে হাসনাবাদে এবার চাষবাস কেমন হয়েছে? অপু ভাবলো শুধুমাত্র চাষের খবর না দিয়ে রতন মণ্ডলের পরিবারে এক বছরে ঘটে যাওয়া ঘটনাক্রম

বর্ণনা করবে। ধূমায়িত রেড টি-তে ঠোঁট ঠেকিয়ে অপু বলতে শুরু করলো।

রতন ভিটে বাড়ির সব্জি খেতে মাটি কোপাচ্ছিলো। এরই মধ্যে এলাকার রুলিং পার্টির হত্যা কত্তা বিধাতা জাকির ভাই এসে খবর দিলো যে কলকাতা থেকে খবর এসেছে আগামী পাঁচ দিনের মাথায় দুইশ কিলো মিটার গতিবেগে ঝড় আসছে। প্রশাসন থেকে নোটিশ জারি হয়েছে। ইছামতী, কাটাখালী রায়মঙ্গল এই সব নদী সংলগ্ন গ্রামগুলোকে জনশূন্য করতে হবে। একই সাথে এটাও বলে যে রতনের বাবা পরান মণ্ডল তাদের দলের সক্রিয় কর্মী ছিল, সেই কৃতজ্ঞতা থেকেই সাহায্য করতে এসেছে। রতন যেন পার্টি অফিসে গিয়ে চার জনের কুপন নিয়ে আসে। শুক্র বার দুপুরের পর অত্যাবশ্যকীয় জিনিস পত্র নিয়ে হাসনাবাদ গার্লস হাইস্কুলে গিয়ে উঠতে হবে। শুক্র বার রাত থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত চার জনের থাকা খাওয়ার দায়িত্ব পার্টির। জাকির ভাই চলে যেতেই কমলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মুরুব্বিরা আসার কারণ জানতে চাইলো। রতন এক বুক হতাশা নিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, এই ভাবে যদি প্রতি বছর ঝড় বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা গরিব মানুষগুলো বাঁচি কি করে! তারপর দয়ার সাগররা আসলেন আমাদের ত্রাতা হয়ে। জানো কমলা, এর মধ্যেও রাজনীতি আছে। নদী বাঁধ পাকাপোক্ত করলে ভাঙ্গন রোধ হয়। বাঁধ ভেঙে নদীর নোনা জল ঢুকে আবাদি জমিগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে সে দিকে নজর নেই। কয়েক দিন খেতে দিলে থাকতে দিলে ক্ষতি পূরণ হয়? বাবা সক্রিয় কর্মী ছিল তাই নাকি ওরা এসেছে। মিথ্যা কথা, টাকা দেয় সরকার আর ওরা পার্টির বলে চালায়। কমলা বললো তুমি আবার ওদের কিছু বলতে যেয়ো না। কেউ তো সত্যি কথা মুখের উপর বলতে পারেনা, তাই ওরা ওদের সুবিধা মতো যা খুশি বলে যায়।

রতন ও কমলা চার দিনের মাথায় মালপত্র গুছিয়ে চৌকির উপর যতটা সম্ভব রাখলো। তার পর টাকা পয়সা দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে নিয়ে, ছেলে মেয়ের হাত ধরে চলে আসলো সেভ সেন্টারে।

পর দিন ঘুম ভাঙল এমন এক সকালে, যাকে সকাল না বলে সন্ধ্যা বললেও ভুল বলা হয় না। স্কুলে একটি ঘরে তিন চারটি পরিবার গাদাগাদি করে বাস করতে হচ্ছে। এও এক নরক যন্ত্রণা, যদি প্রাণটা বাঁচে সেই আশাতে আসা। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। একটা গুমোট পরিবেশ। সবই অপেক্ষমান সন্ধে সাড়ে সাতটার সাইক্লোনের জন্য। স্কুলে থেকেও স্বস্তি নেই, ছাদ হয়তো ভেঙে পড়বে না, দরজা জানালার যা অবস্থা তাতে না ভেজার

কোনো ভরসা নেই।

সন্ধ্যা থেকেই প্রকৃতি তার ভয়ঙ্কর করাল রূপ দেখাতে শুরু করলো। রাত নয়টা পর্যন্ত চললো প্রকৃতির তান্ডব লীলা। সারা রাত আতঙ্কে কেউ দুই চোখের পাতা এক করতে পারলো না।

সকালে বাইরের দিকে তাকালে মনে হলো স্কুল বাড়িটি যেন সমুদ্রের মাঝখানে। ইছামতী, কাটাখালী নদীর বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে চাষের জমি সহ সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে।

সেই জল শুকাতে সময় লেগে যায় সপ্তা খানিক। গ্রামের বাড়ি ঘর সব কঙ্কালসার চেহারা। রতনের কুটিরও সেই তালিকায় পড়ে। ঘরে যে উচ্চতা পর্যন্ত জল উঠেছিল, সেই পর্যন্ত মাটির দেয়ালের মাটি গলে ভিতরের বাখারী, কঞ্চি বেরিয়ে গেছে। ঘরামী ডাকার টাকা নেই, সেই জন্য রতন নিজেই জমি থেকে মাটি কেটে ঘরের দেওয়াল ঠিক করলো। ঘরের চাল খড়ের তৈরি, সেও লণ্ডভণ্ড অবস্থা। চালে অর্ধেক খড়ও নেই। এদিকে স্কুল ঘর ছাড়ার নোটিশ এসে গেছে। অগত্যা রতন নিজেই খড় কিনে ঘরের চাল ছাইতে গেল। তখনই ঘটলো এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, যা রতনের পরিবারকে আর একটা সাইক্লোনের মতো লণ্ডভণ্ড করে দিলো। মাঠ ঘাট সব জলে ডুবে যাওয়ায় এক মেঠো কেউটে সাপ ঘরের চালার খড়ের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। রতন সেই জায়গার চাল সারাতে গেলে, ওকে ছোবল মারে। ঘটনাটা জানাজানি হতে আরো খানিকটা দেরি হয়ে যায়। টাকি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে সাপের কামড়ের আন্টি ভেরাম ইনজেকশন না থাকায় বসিরহাট হসপিটালের দিকে ছুটলো অ্যাম্বুলেন্স, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নিয়ে যাওয়ার পথেই রতনের মৃত্যু হয়।

অপুর মা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন আহারে, তারপর কমলা আর ওর বাচ্চা দুটোর কি হলো? —কি আর হবে! অন্যের দয়া দাক্ষিণ্যে আধপেটা খেয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করছে। বাচ্চা দুটোর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দের ভালো পার্টি থেকে ত্রাণের টাকায় ঘরদোরগুলো ঠিক করে দিয়ে গেছে। ও আর একটা কথা তো বলাই হয়নি, রতন মণ্ডল ধানের ভাগ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছিল, সেটা কমলা শত কষ্টেও খরচ করেনি। এই বলে অপু ড্রয়ার থেকে পাঁচ হাজার টাকা এনে বাবার হাতে দিতে গেল। তিনি টাকাটা হাতে না নিয়ে রীতিমতো অবাক হয়ে এবং অপুর উপর মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, তাদের এই অবস্থার মধ্যে টাকাটা দিলো আর তুমি নিয়ে এলে! অপুর মায়ের কোমল হৃদয় কমলার করুণ পরিস্থিতিতে বিগলিত হয়ে

উঠলো। তিনি বললেন, অপু টাকাটা ফেরত দিয়ে আয়, কমলা সংসারের কাজে টাকাটা লাগাতে পারলে কিছুটা তো সুরাহা হবে। অপু মা বাবার কাছ থেকে এই অনুমতির অপেক্ষায় ছিল।

রতন মণ্ডল মারা যাওয়ার পর কমলা অকূল পাথারে পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঘাত প্রতিঘাতে দগ্ধ হতে হতে বর্তমান পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। নিজের আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত সত্তা বিসর্জন দিয়েছে। দুটি সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের মাতৃসত্তাকে আর বিসর্জন দিতে পারেনি। রক্ত মাংসের কলেবরে বিরহ যন্ত্রণা যে ছিলো না তা নয়, তবে পরিস্থিতির কারণে ছাই চাপা আগুন হয়ে ছিল। অপুকে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখে ফেলার সাথে সাথে সেই আগুনে যেন দামাল বাতাস এসে আছড়ে পড়লো, এবং সেই উষ্ণতা সুপ্ত সত্তাগুলোকে জাগ্রত করে তুলল। তার পর অপু চলে যেতেই কমলার মনে হলো, কিছু যেন পেয়েও হাত ছাড়া করে ফেললো। মন বলছিল অপুকে আরো কিছু সময় তার কাছে থাকতে। কিন্তু সমাজ সংস্কার পুত্র, কন্যার কথা ভেবে মুখে কিছু বলতে পারেনি। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো বিরহ ঢেউ তার মনের উপর আছড়ে পড়ে মনকে বাঁধ ভাঙা নদীর মতো করে তুলল। ন্যায়, নীতি, সমাজ, সংস্কার কিছুই আজ মন মানতে চাইছে না। তার অদম্য ইচ্ছে অনলের মতো সবকিছু গ্রাস করতে চাইছে।

দিন চারেক পরের কথা, কমলা নিজের মনকে অনেক বুঝিয়ে একটু শান্ত করেছে। সকালের দিকে গৃহস্থলীর কাজকর্মে কমলা ব্যস্ত, বিমলা মাকে সাহায্য করছে, আর ছেলেটি রাস্তার দিকে খেলছে। এরই মধ্যে বাচ্চাটি ছুটে বাড়ির ভিতরে ঢুকে মাকে হাত বাড়িয়ে একটা দামি ক্যাডবেরি দেখালো। সে ভীষণ খুশি, এমন একটা খাবার বস্তু এই প্রথম সে হাতে পেলো। কমলা অবাক হয়ে জানতে চায় সে দামি চকলেট কোথায় পেলো। ছেলেটি রাস্তার দিকে হাত বাড়ায়। কমলা সেই দিকে তাকিয়ে খুশির জোয়ারে কয়েক সেকেন্ড বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

অপু দুই তিনটি ভারী ব্যাগ নিয়ে কুথতে কুথতে বাড়ির ভিতরে ঢুকছে। বিমলা তাড়াতাড়ি গিয়ে ব্যাগ ধরলো। মেঘ না চাইতে একবারে জল পেয়ে যাবে সেটা কমলা কল্পনাও করতে পারেনি। সে আজ আর ততটা অবগুণ্ঠনাবৃত নয়, কথা বলায়ও লজ্জার বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে। মনের চঞ্চলতা আজ বড়ো দামাল হয়ে উঠেছে। অপু ব্যাগ রাখতে রাখতে বললো, বড্ড ভারী, অভ্যাস নেই তো কথা বলতে বলতে আর একটা ক্যাডবেরি ব্যাগ থেকে বার

করে বিমলার হাতে দিলো। তুমি যে আসবে এটা আমি ভাবতেই পারিনি। কিন্তু এত কিছু কি এনেছ? অপু একটা প্রাণ খোলা হাসি হেসে বললো আমি নিজে থেকে কিছু আনিনি, মা তোমাদের পরিস্থিতির কথা শুনে সামান্য কিছু পাঠিয়েছেন। আর বাবা এই টাকাটা তোমাকে দিতে বলেছেন এই বলে অপু কমলার হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিলো। কমলা ইতস্তত করে টাকাটা নিয়ে বললো বিমলার বাবার কাছে শুনেছি উনি ভীষণ ভালো মানুষ, কিন্তু উনি যে দেবতুল্য মানুষ এটা আমার জানা ছিল না। যাক ওসব কথা, এবার একটু চা করতো, শরীরটা যেন গরমে ম্যাজ ম্যাজ করছে। আর একটা কথা আমি কিন্তু দুপুরে তোমার এখানে খাওয়া দাওয়া করবো, আপত্তি নেই তো? কমলা অপুর দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। যে হাসির অর্থ যেমন গভীর তেমন সুদূর প্রসারিত।

বিমলারা বাবার মৃত্যুর পর এই প্রথম তৃপ্তি করে দুপুরবেলা একটু ভালো মন্দ খেলো। দুই ভাই বোনের খাওয়ার পর কমলা আর অপু মাটির মেঝেতে আসন পেতে খেতে বসলো। কমলা বললো, তুমি কলকাতার মানুষ, মাটিতে বসে খেতে তোমার খুব অসুবিধা হচ্ছে, তাইনা? অপু হেসে বললো, একদম না, সত্যি কথা বলতে কি, আজকে এই মুহূর্তটাকে আমি আমৃত্যু স্মরণে রাখবো। এতো তোমার একটা উটকো ঝামেলা হলো সুখের স্মৃতিতো নয়। বলে কমলা একটা উত্তরের অপেক্ষায় থাকলো। অপু খেয়ে মুখ ধুতে ধুতে বললো ও তুমি বুঝবে না। কমলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সত্যিই আমি বুঝতে পারছি না। ছোটবেলার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বর্তমানের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করা! অপু কমলার কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, এবার তো আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কি বলতে চাইছ বলতো? অপু আলালের ঘরের দুলাল একটা হৃদয় বিদারক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে ইমশানাল হয়ে পড়েছে, কিন্তু কমলা পরিস্থিতির বাস্তবতা বোঝে, সমাজ এবং অপুর জীবনের কথা ভেবে তাকে অনেক শক্ত হতে হবে। সে অপুর দুই চোখে চোখ রেখে বললো তুমি কি সত্যিই মাতৃ পিতৃ আজ্ঞা পালন করতে এসেছ? অপু বুঝতে পারলো সে ধরা পড়ে গেছে। তার মনের ইচ্ছেটা সে কমলার কাছে বলেই দেবে ঠিক করলো। কমলাকে অনুরোধের সুরে বললো আমি তোমার দায়িত্ব নিতে চাই। অপু আবেগ প্রবণ হয়ে না ভেবে বলা কথা শুনেই কমলা চমকে উঠলো। একটা অজানা ভয় তাকে আড়ষ্ট করে ফেললো। সাথে সাথে নিজেকে অপরাধীও মনে হলো। নিজের সুখের কথা ভেবে অপুর জীবনকে শেষ করে দেয়া যায় না। মা, বাবা, পরিবার নিয়ে তারও তো একটা জগৎ আছে। ঈশ্বর

তাকে ক্ষমা করবেন না। তাছাড়া এই গ্রাম্য সমাজও তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। কমলা অপুকে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলার চেস্টা করলো। অপুও বুঝতে পারছিল কথাগুলো কমলার মনের কথা নয়, দূরদর্শিতার পরিচয়। অপুও নাছোড়বান্দা, কিছুতেই যখন বুঝতে চায় না, তখন কমলা কেঁদে ফেলে, এবং অপুর কাছে নিষ্কৃতি ভিক্ষা করে। অপুও কমলার সমাজ জীবনের কথা ভেবে বলে ঠিক আছে, তাহলে তোমার ছেলে বড়ো না হওয়া পর্যন্ত আমাকে তোমাদের পাশে থাকার সুযোগ দাও অগত্যা কমলা রাজি হয়। 'একটু হাসো অপু অনুরোধ করে। কমলা হাসতেই পরিবেশটা স্বাভাবিক হয়ে গেল। কমলা শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললো, তুমি যা করলে, তা মনে হয় আমার সাত জন্মের তপস্যার ফল। তোমার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারবোনা, অপু একগাল হেসে বললো, শোধ করতে চাও, তবে সেই ষোড়শী গলার ভাটিয়ালি গান একটি গাও, কমলা একটু লজ্জা পেয়ে বললো আমি কি এখন ষোড়শী? আর সেই গলা আছে নাকি! অপু ছাড়বার পাত্র নয়, তুমি নিশ্চয়ই পারবে, আমি না হয় মনটাকে আঠারো বছর আগে নিয়ে যাবো অগত্যা কমলা ইচ্ছা না থাকলেও অপুকে খুশি করার জন্য একটা ভাটিয়ালি গান ধরলো—

পরান পাখি উইড়া যায়
ওই দিকচক্রবালে,
মিলন হওয়ার আসায় থাকে
অপেক্ষারী কালে।—

— বিমলা ভাইয়ের হাত ধরে পাড়ার দিকে গিয়েছিল, ফিরে এসে অনেক দিন পর মাকে গান গাইতে শুনে একটু অবাক হলো। ছোটবেলায় মায়ের গলায় অনেক গান শুনেছে। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর মা আর কখনো গান গায়নি। বিমলা ঘরে না ঢুকে উঁকি মেরে দেখলো, মা মুখে একটা প্রসন্তি এনে প্রাণ খুলে গেয়ে চলেছে, আর ওই ভদ্রলোক মায়ের মুখ পানে উদাস হয়ে চেয়ে রয়েছে। বিমলাকে দেখতে পেয়ে কমলা গান থামিয়ে দিলো। অপু বললো, কমলা আজ উঠি। কমলার মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে গেল আবার কবে আসবে? দেখি বলে অপু যখন ঘর থেকে বেরুচ্ছে ঠিক তখন কমলার ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালো। অপু গালটা একটু টিপে বললো, স্কুলে যাবে, ভালো করে পড়াশোনা করবে, জীবনে অনেক বড় হতে হবে। ছোট শিশু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, তুমি কে হও? অপু একটু মুচকি হেসে বলে একটা মামা। ❑

অধিকার

প্রয়োজন পড়লে আমি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব। দেখি সরকার কি করে আমার বাগান অধিগ্রহণ করে। আর ক্ষতিপূরণ? ক্ষতিপূরণ দিলেই কি সবকিছুর সমাধান হয়ে যাবে! কথাগুলি ফাইল ঘাটতে ঘাটতে উচ্চস্বরে সামনে বসা পরিবেশবিদ সুভাষ পাল, অ্যাডভোকেট সোমনাথ দে, সমাজ কর্মী নিশীথ অধিকারীদের সাথে বলে চলেন রঞ্জিত চক্রবর্তী। যাকে নিন্দুকরা ব্যাঙ্গ করে বলে চলেন 'উদ্ভিদ চক্রবর্তী'।

যে বাগানটি নিয়ে এত কোর্ট কাছারি আমরা সেই বাগানের ইতিহাস একটু জেনে নেই—রঞ্জিত চক্রবর্তীর দাদুর বাবা স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের আমিন। প্রখর বুদ্ধি ও দূরদর্শী মানুষ ছিলেন। ১৯৩০ সাল নাগাদ একবার ওনাকে কলকাতার উপকণ্ঠে এক মামলাকৃত বাগান জরিপের কাজে যেতে হয়। উনি বাগানে গিয়ে দেখেন— বিঘা কুড়ি জমির উপর বাগান আম, জাম, কাঁঠাল, বাতাবী লেবু, পেয়ারা, জামরুল, এছাড়াও শাল, সেগুন, মেহগিনি ইত্যাদি সমস্ত গাছই বতর্মান। বিরাট বিরাট 'সারি' পুরনো গাছের জঙ্গল। এন্তাজ আলি নামে এক মুসলিম বৃদ্ধের শখের বাগান। তিনি বাগানটিকে আর অখণ্ড রাখতে পারছেন না কারণ তার শরিকদের সাথে মামলা মোকদ্দমার কারণে বাগানটা টুকরো টুকরো হবার জোগাড় হয়েছে। বৃদ্ধ শরৎ বাবুকে বলেন, বাবু ওরা টাকার পিশাচ, টাকা পেলে ভাগ ছেড়ে দেবে। কিন্তু আমি গরিব মানুষ অত টাকা কোথায় পাব বলুন যে ওদের ভাগের টাকা দেব। বিক্রি যে করব, এত বড় বাগান কে নেবে? তবে বাবু কেউ যদি নিতে পারত আর বাগানটাকে রক্ষা করত তাতে তার লোকসান হত না। সারাবছর ফল ফলাদি থেকে একটা ভাল রোজগার হয়। সারি পুরনো গাছ আছে প্রচুর আর কাঠের যা দাম কিন্তু কে নেবে জঙ্গলের মধ্যে এত বড় জমি?

শরৎবাবু অনেক হিসেব বিবেচনা করে কিছু ধারদেনা করে বৃদ্ধের পৈতৃক বাগানটি পনেরো হাজার টাকায় কিনে নিলেন। জমি রেজিস্ট্রি হওয়ার পর রেজিস্ট্রি অফিসে এন্তাজ আলি শরৎবাবুর হাত ধরে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন বাবু, এ আমার বড় শখের বাগান। কিনেছি না ভেবে ভাববেন দেখাশুনো করার জন্য নিয়েছেন। কত পাখি এই বাগানের গাছে আশ্রয় নেয়। এই বাগানের গাছে ফল খেয়ে বেঁচে থাকে। কত ছোট ছোট জন্তু জানোয়ার এই বাগানে চরে বেড়ায়

তাদের কথা না হয় একটু ভাববেন। শরৎবাবুও তাকে বাগান রক্ষা করার মৃদু প্রতিশ্রুতি দেন। তখন বৃদ্ধ আশ্বস্ত হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে রেজিস্ট্রি অফিস থেকে বাড়ির পথে পা বাড়ান।

শরৎবাবু অর্থশালী মানুষ হলেও পনেরো হাজার টাকায় জমিটা কিনে তিনি বেশ কিছুটা ঋণগ্রস্ত হলেন তো বটেই তিনি সমস্যায়ও পড়লেন। আলগা জমি, মাপ জোক করে অন্তত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কথা ভাবলেন। তিনি ঠিক করলেন কিছু পুরনো সারি গাছ বেচে দেবেন তাতে অনেকটাই সুরাহা হবে।

কাঠুরে এসে গাছ কাটা শুরু করেছে। বেশ কিছুদিন ধরে মোটা সারি গাছগুলো কাটার কর্মযজ্ঞ চলছে। শরৎবাবু রোজ বাগানে আসেন না। বছর পচিশের ছেলে বাদলবাবুই দেখাশোনা করেন। অবসরে একদিন শরৎবাবু বাগানে এলেন। তখন গাছ কাটার কাজ চলছে। কুড়ল দিয়ে যখন গাছের বড় বড় ডাল গুলো কাটা হচ্ছিল, ঠিক সেই সময় গাছের ডাল থেকে একটা পাখির বাসা নিচে পড়ে যায়। যাতে দুটো পালকহীন সদ্য ডিমফোটা পাখির বাচ্চা ছিল। পড়বি তো পড় একেবারে শরৎবাবুর পায়ের কাছে। বাচ্চাগুলো উঁচু গাছ থেকে পড়ে ফেটে রক্তাক্ত হয়ে মারা যায়। শরৎবাবু ঐ দৃশ্য দেখে কয়েক মুহূর্ত বাকরুদ্ধ হয়ে যান। মনে পড়ে যায় বৃদ্ধ এন্তাজ আলির কথাগুলো। তার সাথে পাখির বাচ্চাগুলোর মা, বাবা ও সঙ্গী-সাথী পাখিগুলোর করুণ কলরব, মুহূর্তে শরৎবাবুর মনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাছ কাটা বন্ধ করে দিলেন। পরে বাগানটি কাঁটাতারের বেড়া দিলেন। শরৎবাবু মাঝে মাঝে বাগান পরিদর্শনে আসতেন। তার অনুমতি ছাড়া বাগানের একটি পাতাও ছেড়া যেত না।

১৯৪৭-৪৮ সাল, ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পর পূর্ববঙ্গ থেকে কাতারে কাতারে মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিল। প্রথমে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। তারপর সরকারের পুনর্বাসনের অপেক্ষাতে না থেকে জলাজমি, খাসজমি দখল করে বাড়ি ঘর বানিয়ে কলোনি গড়ে তুলল। বাদলবাবু তখন ওকালতি পাস করে প্র্যাকটিস করছেন। শরৎবাবু বাদলবাবুর কাছে আগামীদিনের পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা চিত্র তুলে ধরলেন এবং বৃদ্ধ এন্তাজ আলির কাছে বাগান রক্ষা করার প্রতিশ্রুতির কথা বাদলবাবুকে বললেন। বোঝালেন চারদিকে এত বসতি গড়ে উঠলে প্রকৃতির দান পশুপাখি, স্বাভাবিক উদ্ভিদ কোথায় থাকবে? বাদলবাবু যেন তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এই বাগান রক্ষা করার বীজ বপন করে যান।

১৯৭০-৭১ সাল, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছাল। এর মধ্যে পাক ফৌজির অত্যাচারে পূর্ববঙ্গে অবস্থিত হিন্দুদের অবস্থাও চরম পর্যায়ে পৌঁছালো। ভারত-পাক যুদ্ধ দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। পূর্ববঙ্গে বসবাসস্থিত হিন্দুরা শরণার্থী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমে আশ্রয় নিল। ভারতীয় রেললাইন, রেল প্ল্যাটফর্ম পরিত্যক্ত জলাজমি শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল হল। সরকারি খাল, রেললাইনের ধারের গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে বসতি গড়ে উঠল। বাদলবাবু বুঝতে পারলেন এই জনজোয়ার কোথায় গিয়ে ধাক্কা মারতে পারে। স্বাধীন ভারতে দিনে দিনে কলকারখানা গড়ে উঠছে, আর বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি গড়ে উঠছে। এতে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ যেমন বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি অক্সিজেনের পরিমাণও কমছে। বিশুদ্ধ বাতাস দিনে দিনে সমতা হারিয়ে ফেলছে। তাছাড়া আগের মতো এখন আর পাখির কলতান শোনা যায় না। তারা হয়ত বিরল প্রজাতিভুক্ত হয়ে পড়ছে। বাবার কথাগুলি মনে করে বাদলবাবু খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ছুটির দিনে এক বিকেলে বাদলবাবু আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে কিছু বইপত্র ঘাটাঘাটি করছিলেন। হঠাৎ একটি লেখার উপর নজর পড়তে তিনি নড়েচড়ে বসলেন।

শ্রীলঙ্কায় এন. রঙ্গনাথন নামে এক ভদ্রলোকের বাড়ির ঘটনা। তিনি একজন পরিবেশবিদ। তাছাড়া তিনি পশুপ্রেমীও বটে। একদিন বাড়িতে তার বছর পনেরোর ছেলেটি একটা টিকটিকিকে লাঠির আঘাতে মেরে ফেলে। রঙ্গনাথন বাবু ব্যাপারটি জানতে পেরে ভীষণ ব্যথিত হন এবং ছেলে সহ বাড়ির সকলকে ডেকে বলেন দেখো, এই পৃথিবীতে আমরাও জীব হিসাবে জন্মেছি। ওই টিকটিকিটাও জীব হিসাবে জন্মেছে। দুজনেরই এই পৃথিবীতে বাঁচবার সমান অধিকার আছে। আমরা উন্নত জীব তাই বাসস্থান তৈরি করে বাস করি। ওরা নিকৃষ্ট জীব, পারে না— তাই বসবাসের উপযুক্ত স্থল বেছে ওরা বাস করে। আমাদের যেমন কেউ ইচ্ছে করলেই তাড়াতে বা মেরে ফেলতে পারেনা। তেমন আমরাও তা ওদের সাথে এমন করতে পারিনা। আমাদের বাসস্থানের একটা দলিল আছে। তাই আমাদের কেউ স্পর্শ করতে পারেনা। ঠিক তেমন ওদের যদি দলিল থাকত? আমরা কি পারতাম ওদের মেরে ফেলতে বা তাড়িয়ে দিতে?

ঘটনাটা পড়ার পরে বাদলবাবুর মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে গেল। উনি ভাবলেন আমার বয়স হয়েছে, আজ আছি কাল নেই। আমাকে কিছু একটা

করতেই হবে। বাদল চক্রবর্তীর ছেলে অমল চক্রবর্তী। উনি সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পাশাপাশি সমাজ কর্মী, যুক্তিবাদী মানুষ। দাদু ও বাবার চিন্তা ভাবনাতে অনুপ্রাণিত। শিক্ষিত, মার্জিত, অর্থশালী পরিবার বলে এলাকাতে নাম ডাক তো আছেই রাজনৈতিক নেতারাও কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেন। বাদলবাবু একদিন অমলবাবুকে ডেকে তার হাতে একটি সিল করা ফাইল দিয়ে বলেন অমল, আমার কবে কি হয়ে যায়, মানুষের কথা তো কিছুই বলা যায় না। তুমি এই ফাইলটি তোমার কাছে সযত্নে গচ্ছিত রাখ। ফাইলটি কেউ কখনও সিল খুলে দেখবে না। যদি কখনো এই বাগান নিয়ে কোর্ট–কাছারি হয় তবে একমাত্র বিচারপতি আদালতে এই ফাইল খুলে দেখতে পারেন। তুমি বা তোমার বংশধরেরা কেউ খুলতে পারবে না। শুধু কটি কথা বলি শোনো এবং কথাগুলি তুমি তোমার উত্তরসুরিদের বুঝিয়ে বলবে। বাগান রক্ষা করা নিয়ে মুসলিম বৃদ্ধকে তোমার দাদু যে কথা দিয়েছিলেন, তা আমারা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। বাগান রক্ষা করতে একটা খরচ হয় বটে কিন্তু সে টাকার সমস্তটাই বাগানের ফলমূল বিক্রি থেকে আসে। তাছাড়া আমি চারধার উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিয়েছি। ফলে বাইরের সমস্যা আর থাকবে না।

বাগান সংলগ্ন এলাকা এখন আর ফাঁকা নেই। একাত্তর–বাহাত্তরে জলা জমি পরিষ্কার করে যেসব টিনটালির বাড়ি তৈরি হয়েছিল, আজ দিনে দিনে সেসব অট্টালিকাতে পরিণত হয়েছে, মধ্যে শুধু এই কুড়ি বিঘার বাগান ছাড়া। দালালচক্র অমলবাবুর মাথা খারাপ করে দিচ্ছে। ক্রমান্বয়ে কাঠা প্রতি দাম বাড়িয়ে প্রস্তাব নিয়ে আসে। অমলবাবুর একটাই বক্তব্য এই সম্পত্তি তাদের যেমন কেনা নয়, তেমনি বিক্রিরও অধিকার তাদের নেই। শুধু রক্ষা করার দায়িত্ব তারা বংশ পরম্পরায় বহন করে চলেছে। রাজনৈতিক নেতাদেরও ঐ বাগানের উপর নজর কম ছিল না। তারা ঠারেঠোরে অমলবাবুকে বোঝাতেন, এই বাগান যদি উনি বিক্রয় করে সুন্দরবন লাগোয়া জমি কিনতেন, তাহলে অন্তত একশো বিঘা জমি পেতেন এবং তাতে বাগান কেন জঙ্গল তৈরি হয়ে যেত। প্রচুর পশুপাখির আশ্রয়স্থল হত। অমলবাবু যুক্তিবাদী মানুষ। উনি সব শুনে মুচকি হেসে বলেন আপনারা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু সেই জঙ্গলে তো ঐ এলাকার পশুপাখি আশ্রয় নেবে। আর এই জঙ্গলের পশুপাখির কী হবে? তাদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কে নেবে? তাছাড়া এই বাগানের গাছপালা যে পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে তা বন্ধ হয়ে গেলে এলাকার পরিবেশও তো দূষিত হয়ে যাবে। বাগানটা থাক না— এই কংক্রিটের মরুভূমিতে একটুকরো

মরূদ্যান হয়ে।

অমলবাবুর ছেলে রঞ্জিত চক্রবর্তী, যিনি সমাজে উদ্ভিদ চক্রবর্তী নামে খ্যাত। এনার ধ্যানজ্ঞানই পরিবেশ নিয়ে। নিজের বাগান ব্যতীত পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও এনার বিরাট অ্যাক্টিভিটিস। ভীষণ কালচারাল মানুষ। পরিবেশ বাঁচানো নিয়ে এনার মাথায় সবসময় ইনোভেটিভ প্ল্যান তৈরী হয়। ওনাদের সংগঠনের আর একজন অ্যাক্টিভ সভ্য হলেন প্রেমাঙ্কুর মালাকার। যার গাছ এবং পরিবেশ নিয়ে শ্লোগান সরকারি প্রতিষ্ঠানেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটি স্লোগান আজকাল খুব সাড়া ফেলে দিয়েছে।

১) বৃক্ষরোপণ, বনের সৃজন, বনের বিস্ফোরণ!
সুজলা ধরণী, তবেই বাঁচবে, কমে যাবে প্রদূষণ।

২) বৃক্ষনিধন, গড়ে আবাসন, শহরের গ্রাসে গ্রাম
এমন চললে, দূষণের বিষে, ভরে যাবে ধরাধাম!

৩) দূষণের ফলে, বিপন্ন আজ, পৃথিবীর পরিবেশ
বহু প্রাণী আর কীট পতঙ্গ, চিরতরে হলো শেষ!

৪) ধ্বংসের থেকে, বাঁচাও ধরণী এখনো সময় আছে
এসো একজোটে, ধরণী ভরাই সবুজাভ গাছে গাছে!

শিশু দিবসে বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে মাষ্টারদের বোঝান তারা যেন ছাত্রদের পেন, লজেন্স না দিয়ে একটা করে গাছের চারা দিলে পরিবেশ বাঁচবে। কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পুরস্কার হিসাবে চারাগাছ উপহার দিতে উৎসাহিত করেন। ছোটদের অঙ্কন প্রতিযোগিতাতেও উনি চারাগাছ বিতরণে উৎসাহ দেন। তাতে তাদের শিশুবয়স থেকে মনে পরিবেশ সচেতনতা আসবে। রঞ্জিত বাবুর একটি সংগঠনও আছে যার সদস্য— পরিবেশবিদ সুভাষ পাল, সমাজকর্মী নিশিথ অধিকারী ও অ্যাডভোকেট সোমনাথ দে–র মতো নামি দামি লোক। ঠিক এই সময় ওনারা যে প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত সেটা হল বিবাহ বাড়িতে বরযাত্রী বা কনেযাত্রীর হাতে গোলাপের জায়গায় চারাগাছ উপহার দেওয়া। আবার কোনো দম্পতির কন্যা সন্তান হলে তাদেরকে মেহগনি গাছ উপহার দেওয়া হয়। যাতে ২৫ বছর পর বিবাহযোগ্য মেয়ের বিয়ে দিতে টাকার অভাব না হয়। রঞ্জিত বাবুরা এই যে এত চারাগাছ উপহার দেন তা সম্পূর্ণই বিনামূল্যে সংগঠন থেকে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সরকার থেকে প্রচুর গাছ সংগঠন বিনামূল্যে পায়। রঞ্জিত

বাবুদের এই সংগঠনের একটি বিরোধী পক্ষ আছে। যারা দালালি করে সুবিধা করতে পারেনি, প্রোমোটিং করে সুবিধা করতে পারেনি। আর আছে এদের মদত দাতা কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তি। রঞ্জিতবাবুদের বাগানের বতর্মান মূল্য পঁচিশ কোটি টাকার উপর। চাক ভরা মধু, মৌ-চোররা চাক না ভাঙতে পারলে গাত্র দাহ তো হবেই। কুড়ি বিঘা বাগানের উপর যাদের নজর তারা সবসময় ঐ বাগানের ক্ষতির চিন্তা করবে, এটা তো স্বাভাবিক। কখনও কখনও বিড়ালের ভাগ্যেও শিকে ছেঁড়ে। কল্যাণী হাইওয়ে এগিয়ে আসছে, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে স্পর্শ করবে বলে। ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাস্তু জমি কিনে নেওয়া হচ্ছে। সড়ক এগোচ্ছে আর সেখানে যাদের জমি, বাড়ি পড়ছে মোটা টাকা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তারা জমি ছেড়ে দিচ্ছেন। যাদের রাস্তার মধ্যে জমি পড়ছে না তাদেরতো আরও অর্থনৈতিক সুবিধা। কারণ জমির দাম লাফাতে লাফাতে বাড়ছে। প্রমোটারচক্র দালালচক্র যথেষ্ট সক্রিয়। বাধ সাধলো কুড়ি বিঘার বাগান। ম্যাপ অনুযায়ী রাস্তা এগোবে, বাগানের ঠিক মাঝ বরাবর। বতর্মান মালিক রঞ্জিতবাবুর কাছে জমি অধিগ্রহণের নোটিশ আসলো।

সুবিধাবাদীরা মজা দেখতে থাকে। তারা এই সুদিনের আশায় অপেক্ষা করছিল। অনেক চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারেনি। এবার কী হবে? হাইরোড়ের কাজ, সরকার অধিগ্রহণ করলে তো জমি দিতেই হবে। তিনশো ফুটের মত চওড়া জমি বাগানের মাঝ বরাবর চলে গেলে বাগান দু টুকরো হয়ে যাবে। তারপর বাধ্য হয়েই জমি বিলি বন্টন করতে হবে। কিন্তু রঞ্জিতবাবুর এক রা। বাগান উনি দেবেন না। পরিচিত মহলে অনেক আলাপ আলোচনা করে বন্ধু অ্যাডভোকেট সোমনাথ দে-কে দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কেস করলেন। ন্যাশানাল হাইওয়ে অথোরিটিও পিছিয়ে পড়া সংস্থা নয়। কারণ জনগণের কল্যাণমূলক কাজে সরকার যে কোনো সময় ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে জমি অধিগ্রহণ করতে পারে। এদিকে রঞ্জিতবাবুদের সই সংগ্রহের কাজ চলছে। কিন্তু বাগানের মধ্যে দিয়ে রাস্তা বার করার বিপক্ষে যত সই পাওয়া গেছে, পক্ষে তার থেকেও অনেক বেশি। কারণ এলাকার উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। যখন কোর্টে দুই পক্ষের না দেওয়া আর দেওয়ার যুক্তির দড়ি টানাটানি চলছে। তখনই একদিন রঞ্জিতবাবু গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের ডাকলেন। এবং দাদুর দেওয়া সিল করা ফাইলটি অ্যাডভোকেট সোমনাথ দে-কে দেখালেন। সোমনাথ বাবু আগেই শুনেছেন বাদলবাবু অ্যাডভোকেট ছিলেন এবং একটা সিল করা ফাইল বংশ পরম্পরায় গচ্ছিত রাখতে বলে গেছেন। তিনি অনুমান করলেন এই ফাইলটির

মধ্যে নিশ্চয় কোনো সমাধান সূত্র গচ্ছিত আছে। তা না হলে কেন এটি সিল করা রয়েছে এবং অপারক পরিস্থিতিতে কেনই বা কোর্টের বিচারপতির হাতে তুলে দিতে বলা হবে। উনি কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর উপস্থিত সভ্যদের বিশেষত রঞ্জিতবাবুকে আশ্বস্ত করে বললেন, দেখি, মনে হচ্ছে একটা সমাধান সূত্র বার হবে।

পরের শুনানিতে কোর্ট ভর্তি লোক। তিল ধারণের জায়গা নেই। কোর্টের বাইরে সংবাদ বিভাগের লোক ভিড় করে আছে। আজকের রায় পশ্চিমবঙ্গের বড় খবর। দালাল ও প্রমোটারচক্র লাড্ডু নিয়ে রেডি। জাতীয় সড়ক পরিবহণ দপ্তরের পক্ষে রায় গেলে ঐ লাড্ডু বিতরণ হবে। একই সাথে আবার রঞ্জিতবাবুর বাড়িতে হোম-যজ্ঞ চলছে। কারণ ঈশ্বর যাতে একশো বছরের পুরনো বাগানটিকে রক্ষা করেন।

বিচারকের সামনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কিছুক্ষণ প্রশ্নের তির এবং উত্তরের ঢাল ছোড়াছুড়ি পর্ব চলল। তারপর অ্যাডভোকেট সোমনাথ দে বললেন হুজুর, এই বাগান বহু বছরের পুরনো। চক্রবর্তী পরিবার ১৯৩০ সালে এই আদর্শ বাগানটি কেনেন। আদর্শ বাগান বলছি এই কারণে, তখনই অর্থাৎ ১৯৩০ সালে বাগানটিতে বহু পুরনো গাছ ছিল। চক্রবর্তী পরিবার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা না ভেবে বংশ পরম্পরায় প্রায় ১০০ বছরের এই বাগান রক্ষা করে আসছে। হুজুর, রঞ্জিতবাবুর দাদু স্বর্গীয় বাদল চক্রবর্তী একটি সিল করা ফাইল রেখে বলে গেছেন, যদি কখনো এই বাগান নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হয় সেইদিন বিচারপতি একমাত্র এটি খুলে দেখতে পারবেন এই বলে ফাইলটি পেশকারের হাতে দিলেন। পেশকার ফাইলটি নিয়ে বিচারকের হাতে দিলেন। বিচারক অতি সন্তর্পণে গালা দিয়ে সিল করা ফাইলটি খুলতে থাকলেন। নিস্তব্ধ কোর্ট কক্ষে যেন একটি পিন পড়লে আওয়াজ পাওয়া যাবে। সবাই নিশ্চুপ, উদ্বিগ্ন, কী আছে ফাইলে তা জানার আগ্রহ কোর্ট মধ্যস্থ সকলের। এমনকি স্বয়ং রঞ্জিতবাবুরও।

বিচারক ফাইল খুলে দেখলেন তাতে একটি দলিল আছে। যেটি তৈরি হয়েছে ১৯৬৩ সালে। একটি ট্রাস্টি দলিল। দলিলে যা বলা হয়েছে, সেটি হল ঐ কুড়ি বিঘা বাগানটি রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হল ঐ বাগানের প্রতিটি গাছপালা, পশু পাখিদের। তারাও বংশ পরম্পরায় ওই বাগান ভোগ দখল করবে। যেহেতু তাদের রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। তাই চক্রবর্তী পরিবার বংশ পরম্পরায় এটি দেখভাল করবে। গাছের ফল ফলাদির উপর সম্পূর্ণ অধিকার তাদের থাকবে।

কিন্তু কোনো জীবন্ত গাছ কাটার অধিকার তাদের থাকবে না। স্বাভাবিক ভাবেই মৃত গাছ কেটে নিতে পারবে। চক্রবর্তী পরিবারের যতই প্রয়োজন পড়ুক না কেন ভোগদখল করে থাকতে পারবে কিন্তু বিক্রয় করতে পারবে না। কারন সম্পত্তি আর তাদের থাকলো না শুধু রক্ষা করার দায়িত্ব থাকলো। যদি বংশধরেরা কেউ কখনো রক্ষা করতে অপারগ হয়, তবে 'রামকৃষ্ণ মিশন' অথবা 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ' অথবা 'সরকার'–এর হাতে অর্পণ করতে পারবে। অবশ্যই তিন সংস্থার মধ্যে যারা বাগান রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেবে। বিচারক মুসলিম বৃদ্ধের জরাজীর্ণ দলিলটিও ফাইলের মধ্যে দেখলেন। যেটি রেজিস্ট্রি হয়েছিল ১৮৮২ সালে। বিচারক ভাবলেন ১৮৮২ সালের বাগান। এক গরিব বৃদ্ধ অতি কষ্টে রক্ষা করেছেন। তারপর বংশ পরম্পরায় চক্রবর্তী পরিবার অর্থ লালসায় না গিয়ে বাগানটিকে রক্ষা করে চলেছেন। তাহলে সুযোগ পেয়ে কি তারও উচিত নয় যে বাগানটি যাতে রক্ষা হয় সে ব্যবস্থা করার।

বিচারক ফাইল থেকে মাথা তুলতেই আবার গুঞ্জন শুর হল। সবাই জানতে চায় গোপন ফাইলে কী বলা আছে! বিচারক হাতুড়ি ঠুকে কক্ষ মধ্যস্থ কৌতুহলী জনগণকে শান্ত করে বলতে শুরু করলেন এই বাগন প্রায় ১৪০ বছরের পুরনো। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এন্তাজ আলি নামে এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছিল। তারপর শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী কিনে নিয়ে বংশ পরম্পরায় রক্ষা করে চলেছেন। শরৎবাবুর ছেলে বাদলবাবু বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। উনি বুঝেছিলেন এই বাগান কালের নিয়মে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই যাতে বাগান বিক্রয়ের সুযোগ কেউ না পায় তাই তিনি বাগানটি, বাগানস্থিত গাছপালা ও পশুপাখির নামে রেজিস্ট্রি করে একটা ট্রাস্টি করে যান। যেটা বংশ পরম্পরায় চক্রবর্তী পরিবার দেখভাল করবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ। কারণ এতে ঐ এলাকার বাস্তুতন্ত্র রক্ষা হচ্ছে। সেইজন্য এই বাগানের অধিকার শুধুমাত্র বাগানের গাছপালা ও পশুপাখিদের। কোনো প্রচেষ্টাই এই বাগানের পরিবেশ নষ্ট করতে পারবে না। এটা ঠিক যে জাতীয় সড়ক একটি জনকল্যাণমূলক কাজ। তাই বলে একটি জনকল্যাণমূলক কাজকে ধ্বংস করে আরেকটি জনকল্যাণমূলক কাজ করা যায় না। আমি আশা করব সরকার পক্ষ এটা বুঝবে। এবং সমস্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে বাদি–বিবাদিদের প্রশ্ন–উত্তর শোনার পর আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, ঐ বাগান যেমন আছে তেমনই থাকবে। প্রয়োজনে সরকারি বনদপ্তর বাগান অধিগ্রহণ করে আরও সুরক্ষা দিতে পারে। উইলে তেমনই উল্লেখ আছে। আর কল্যাণী হাইওয়ে বাগান থেকে অন্তত

হাজার ফুট দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এতে বাস্তুতন্ত্র রক্ষা হবে কারণ পরিবেশের স্বার্থে তারও প্রয়োজন আছে। আদালত এখানেই মুলতুবি ঘোষণা করা হল।

রায় শোনার পর আদালত কক্ষে খুশি এবং হতাশার গুঞ্জন শুরু হল। সেই সাথে আস্তে আস্তে কক্ষ মধ্যস্থ মানুষজন একে একে বেরিয়ে যেতে থাকল। ঠিক সেইসময় সুভাষ বাবু, সোমনাথ দে ও নিশিথ অধিকারীদের নজর পড়ল রঞ্জিত বাবু একটি চেয়ারে বসে পক্ষে রায় শোনার আনন্দে কেঁদে চলেছেন। আজ সার্থক হল তার ব্যঙ্গক্তি নাম উদ্ভিদ চক্রবর্তী। ❑

তথ্য সহযোগিতায় ঃ দেবব্রত গুহ

নেপো ভূতের ছানা

সোনাই আর দু-বার নিলেই খাওয়া ফিনিশ, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও বলছি, না খেলে এবার কিন্তু নেপো ভূতের ছানাকে ডাকবো। নেপো ভূতের ছানা এসে সব মাছ ভাত খেয়ে যাবে—

আয় রে আয় নেপো ভূতের ছানা,
তোকে কেউ করবে না মানা।
গাছের ডালে বসে খাবি—
নিত্য নতুন খানা।
মাছ ভাজা আর ডিম সিদ্ধ—
আরও আছে অনেক খাদ্য,
খেতে চাস যদি ডালিয়ার খিচুড়ি—
চলে আয় তুই খুব তাড়াতাড়ি।

সোনাই, একটি বছর তিনের এক মেয়ে, কথার বহরে সে পাঁচ বছরের শিশুর সমান। তাকে নিয়ে বাড়িতে কারোর কোনো সমস্যা নেই, একমাত্র খাওয়া ছাড়া। ছোট্ট আধ বাটি ভাত সঙ্গে একটু মাছ ভাজা খেতে তার পাক্কা দুই ঘন্টা সময় লাগে। তাও সবটা খায় না। মা, দিদার চিৎকার প্রতিবেশীদের বুঝিয়ে দেয় সোনাই এখন খাচ্ছে। সোনাই দুই গালে দুই দলা ভাত নিয়ে গালটা ফুলিয়ে জানালা ধারে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে উল্টে প্রশ্ন করে, কোথায় ভূতের ছানা? ওর মা চোখ বড় বড় করে বলে, তাড়াতাড়ি খাও এখুনি এসে পড়বে। সোনাই মুখের ভাত না গিলেই বলে, আগে ভূতের ছানা দেখি!— ইত্যাদি ইত্যাদি। সোনাই-এর মা বানিয়ে বানিয়ে ছড়া ধরে—

গাছের ডালে বসে আছে—
নেপো ভূতের ছানা,
মাথাটি তার কলসির মতো—
চোখ দুটি নয় কানা।
দাঁতগুলো তার মুলোর মতো—
কান যেন তার কুলো,
হাড় সাজানো শরীর খানা—
নয়তো মোটেই তুলো।

চোখ দুটি তার ভাঁটার মতো—
জ্বলতে থাকে রাতে,
দস্যি মেয়ের খোঁজ পেলে সে—
ধরতে আসে তাকে।

এটাই ছিল রোজকার রুটিন। এদিকে, সোনাইদের বাড়ির পশ্চিম দিকে ছিল এক প্রকাণ্ড পুরনো পাকুড় গাছ। সেই গাছে সত্যি সত্যি নেপো ভূতের সাত পুরুষের বাস। নেপো ভূত, তার বউ পেত্নি, আর তাদের ছানা, এই তিন জনের ছোট্ট সংসার। পেত্নির এই জায়গাতে থাকার একদম ইচ্ছা নেই। চারদিকে মানুষের বাস, তাদের কত ভয় দেখিয়ে টিঁকে থাকা যায়!! মানুষদের স্বভাব বড় গোলমেলে, একদিকে ভূতকে ভয় পায়, আবার ভূত তুলেই যত বাচ্চা ভুলায়। পেত্নির ইচ্ছা অন্য কোন বাগানে চলে যাবে, যেখানে ভূতই বেশি অর্থাৎ ভূতের পাড়া হবে। নেপো ভূত বউকে বোঝায় এটা তাদের সাত পুরুষের ভিটে বলে কথা, ছেড়ে গেলে চলে! ওদের ছানার নাম ডেপো, সার্থক নাম তার। বাবা মার কথা শোনে না একদমই। শুধু মানুষদের কাছে যাবে। ভয় দেখানোর মুরোদ নেই, খালি মানুষের ছানাগুলো কি করে তাই দেখে, আর গাছে এসে বায়না ধরে। একদিন সারারাত খেটেখুটে দিনের বেলা সবে নেপো গাছে ফিরেছে। ডেপো এসে নেপোকে জিজ্ঞাসা করলো, বাবা মানুষেরা বলে, মানুষ মরলে ভূত হয়, তাহলে ভূত মরলে কি হয়? এত সব জটিল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতা নেপোর নেই। ডেপো বিজ্ঞের মতো বলে— জাননাত, আমি জানি, ভূত মরে কাক হয়। এই কথা শুনে পেত্নি চেঁচিয়ে ওঠে— কি অলুক্ষুণে কথাবার্তা!! মানুষদের কাছ থেকে যা খুশি তাই শিখে আসছে। টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া এত পাখি থাকতে শেষে কিনা কাক!! ডেপোর মাথাটাই মানুষেরা খারাপ করে দেবে। ফলে ডেপোকে নিয়ে পেত্নির বড় চিন্তা।

কিছুদিন ধরে পেত্নি খেয়াল করছে ডেপো ভূতের গায়ে মানুষের গন্ধ। তার মানে মা বাবার কথা না শুনে মানুষে ধারে কাছে যাওয়া শুরু করেছে। সেদিন পেত্নি কত আশা করে ডেপোর জন্য চ্যাং মাছ পোড়া জোগাড় করে আনলো, তা ডেপো যদি একটু মুখে দেয়, বলে কিনা— চ্যাং মাছ পোড়া খাবো না, ভাজা খাবো। কখনো বলে চাউমিন খাবো, ক্যাডবেরি খাবো, একে বারে সমাজ ছাড়া কথাবার্তা। এ সব কথা কি ভূতদের মুখে মানায়? সব ওই সামনের বাড়ির বাচ্চাটাকে দেখে শিখছে। ওর মা, দিদার যা আদিখ্যেতা, মোরে যাই, মোরে যাই। অমন মা যেন কক্ষনো না হই। খাওয়াবি খাওয়া তা সব সময় আমাদের

নাম নিয়ে টানাটানি কেন? আবার বাপ তুলে কথা বলে। আমরা কি তোদের খাবার খেতে গেছি! কৈ আমার ছানাকে তো মানুষের ভয় দেখিয়ে খাওয়াই না!!

সোনাইকে ডেপোর খুব ভালো লাগে। সোনাই যখন যে পাখীকে নিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কবিতা বলে, ডেপো অমনি তার সামনে সেই পাখির রূপ ধরে খেলা করে। সোনাই বেশ মজা পায়, ডেপোও খুশি হয়। ডেপো কখনো আসল চেহারায় সোনাই-এর সামনে আসে না, পাছে যদি সোনাই ভয় পায়, তাহলে তো বন্ধুত্বটাই নষ্ট হয়ে যাবে। যখন যে সময়ের ছোটখাটো ফল পাকে, ডেপো বড় পাখীর রূপ ধরে সেই ফল ঠোঁটে করে এনে সোনাইকে দেয়। সোনাই-এর বাড়ির লোকেরা একটু অবাক হয় বটে, তবে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে না।

সেদিন সোনাই জানালা ধরে আপন মনে ছড়া ধরেছে—

আয় রে ময়ূর আয়,
নাচ দেখাবি আয়
বড় বড় পাখা মেলে,
ছুটে চলে আয়।
সাপ ব্যাঙ তো ধরে খাবি,
না খুঁজে তুই আপেল পাবি
আরো আছে শস্য দানা,
তাড়াতাড়ি আয়।

সোনাই-এর সামনে গাছের ডালে বসে ডেপো ময়ূর সেজে নাচ দেখাতে থাকে, যেটা সোনাই ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পায়না।

একদিন দুপুরে ঘটতে যাচ্ছিল এক বিরাট দুর্ঘটনা, সেদিন যদি ডেপো ভূত না থাকতো—

সোনাই-এর মা আর দিদা কোমর বেঁধে সোনাইকে খাওয়ানোর যুদ্ধে নেমে পড়েছে। সোনাই খাবেনা বলে এঘর ওঘর ছোটাছুটি করছে। ওর মা, দিদা পিছন পিছন দৌড়াচ্ছে। সে এক মজাদার কাণ্ড কারখানা। ডেপো জানালায় বসে দেখছে এবং বেশ মজা পাচ্ছে। এরই মধ্যে সোনাই এঘর ওঘর করতে করতে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে দোতলা থেকে একতলায় নামতে গেল। কয়েকটা ধাপ নামতেই পা পিছলে গেল। বাড়ি শুদ্ধু লোকজন চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করে ফেললো। তারপর সবাই হঠাৎ করে একদম চুপ করে গেল। প্রত্যেকে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, যা দেখলো তা কি সম্ভব!!! —

ভোজবাজির মতো, সোনাই পা পিছেলে পড়ার আগেই একটা ভল্ট খেয়ে মাথাটা উপর দিকে করে দাঁড়িয়ে পড়লো। সবাই ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে থাকলো, কিন্তু আসল কাজটা যে ডেপো করলো সেটা কেউ বুঝতে পারল না।

পেত্নির সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ। ছানাকে আর ভূত করতে পারছে না। তার ঘাড়ে মানুষ ভর করেছে। ভূত সমাজে আর মুখ দেখানো যাচ্ছে না। ভূতদের আসরে গিয়ে সব ভূত ও তাদের ছানারা কত ভৌতিক কান্ড কারখানা করে, ডেপো সেখানে চুপ করে বসে থাকে। ভূতের ছানাদের আনন্দ ফূর্তির ধরন যেন তার একদম পছন্দ নয়। চিন্তায় পেত্নির দিনের ঘুম ছুটে যাওয়ার জোগাড়। মায়ের মাথা ব্যথা নিয়ে ডেপো ভূতের কোনো মাথা ব্যথা নেই, সে সুযোগ পেলেই সোনাইদের জানালার ধারে চলে আসে। সোনাই-এর দুষ্টুমির কায়দা কসরতগুলো মনদিয়ে রপ্ত করে। সারাদিন না ঘুমিয়ে সোনাইদের জানালার ধারে বসে থাকবে, আর সন্ধে হলেই ঘুমে ঢুলতে থাকে।

এদিকে সোনাই ক্যারাটে স্কুলে ভর্তি হয়েছে, যোগা এবং ক্যারাটের কিছু প্রাথমিক পোজ শিখেছে। সোনাই-এর মা বাড়িতে সোনাইকে খেলার ছলে প্র্যাকটিস করায়। হাত পা নাড়াচাড়া ডিগবাজি খাওয়া কসরতগুলো ডেপো শিখে নিয়েছে এবং গাছে ফিরে ডালে বসে দিব্যি নকল করে মজা পাচ্ছে।

এইসব কান্ড কারখানা পেত্নি তো কিছু জানেও না, বোঝেও না। সে ভেবেছে ভূতকে যদি মানুষে পায় তাহলে মনে হয় এমনিই হয়। পেত্নি কান্নাকাটি করে নেপোর সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দিলো। সে অনেক আগেই নেপোকে সাবধান করেছিল। নেপোর হয়েছে যত জ্বালা, সারারাত মাঠে ঘাটে ঘুরে খাবার সংগ্রহ করে দিনে এসে একটু ঘুমায়, পেত্নির জ্বালায় তার উপায় নেই! পেত্নিকে বোঝায় ডেপো এখন ছোট বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তখন মানুষদের ঘেন্না করবে, ওর সামনে থেকে মানুষকে তাড়াবার জন্য ভয় দেখাবে। নেপো বোঝালে কি হবে, পেত্নি বুঝলে তো। অগত্যা নিরুপায় হয়ে ভূত পেত্নিতে মিলে ব্রহ্মদৈত্যের স্মরণাপন্ন হলো।

ব্রহ্মদৈত্যকে দেখলে ভূতেরাই ভয় পায়, মানুষ তো দুরস্ত। পেল্লায় চেহারা, গলায় গরু বাঁধা দড়ির মতো পৈতে, চোখে থালার মতো বড় কাঁচ লাগানো একটা চশমা, পায়ে কাঠের খড়ম। ন্যাড়া মাথায় বিরাট এক টিক্কি, বেল গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে হুঁকো টানে। ভীষণ রাগী, ভূতেরা তার নির্দেশ মতো চলে।

নেপো আর পেত্নি ডেপোর কথা সব ব্রহ্মদৈত্যকে বলল। ব্রহ্মদৈত্য চোখ

বন্ধ করে নেপো আর পেত্নির সব কথা মন দিয়ে শুনলো। তারপর হাতটাকে বাঁশের মতো লম্বা করে পাশে থাকা বট গাছের কোটর থেকে হুঁকোটা নিয়ে আসলো। দু-চার বার হুঁকোতে টান দিয়ে চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া করে দিয়ে বলল, দ্যাখ, সব ছানা ছানাই হয়, সেটা ভূতের হোক বা মানুষের। ওদের ভিতর ভূতত্ব বা মনুষ্যত্ব কিছুই জন্মায় না। ওরা নিছক খেলার ছলে কাছাকাছি আসে, বড় হলে নিজেদের সমাজকে বুঝতে শিখবে, এবং দুজনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হবে। এখন ডেপোকে মনের আনন্দে খেলতে দে, বাধা দিসনে, তাতে ডেপো তো খুশি হবেই তোরাও শান্তিতে থাকবি।

পেত্নি ব্রহ্মদৈত্যকে ভুতেশ্বর মানে, ফলে পেত্নির মনে আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ থাকলো না। পাকুড় গাছে ফিরে গিয়ে ডেপোকে সোনাই-এর সাথে খেলার অবাধ অনুমতি দিয়ে দিল—

যা রে ডেপো যা—
সোনাই-এর কাছে যা,
সে আছে যে অপেক্ষাতে—
বন্ধু আসবে এই আশাতে,
দ্বিধা দ্বন্দ থাকলো না আর—
খেলতে চলে যা। ❑

জামাইষষ্ঠী

গোপাল বক্সীর আজ বছর পাঁচেক হলো কারখানা লকআউট হয়ে আছে। হঠাৎ করে লকআউট হওয়ায় টাকা পয়সার হিসাবও পাননি। মৃতপ্রায় কারখানাটি ধিকধিক করে চলছিল, বাদ সাধলো দাবিদাওয়া। ইউনিয়ন লিডারদের কথা মতো চলতে হয়। ইচ্ছা না থাকলেও নেতাদের কথা মানতে বাধ্য। আজ পাঁচ পাঁচটা বছর নুন আনতে পান্তা ফুরোনো অবস্থা। ঈশ্বরের কৃপায় তিনটি মেয়েকে কারখানা বন্ধের আগে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। এই সময় সংসারের হাল ধরার মতো কেউ নেই। ছেলেটি সবার ছোট, সে এখন তার ব্যক্তিগত খরচই জোগাড় করতে পারে না। দুশ্চিন্তার ভারে গোপালবাবুর বয়সটা আসল বয়সের থেকে অনেকটা বেশিই মনে হয়। হাই পাওয়ারের চশমা চোখে, মুখে একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরেঘুরে ধার দেনা করে কোনোরকমে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন।

ছোট জামাই কর্মসূত্রে থাকে দুবাই, বিয়ের পর মেয়েকে শশুর বাড়িতে রেখে সে বিদেশে চলে যায়। ইচ্ছে করলে তো আর ফিরতে পারে না, ফলে এখনো পর্যন্ত জামাইষষ্ঠীতে আসতে পারেনি। এবার জামাইষষ্ঠীতে ছোট জামাই কলকাতাতে থাকায় বক্সী গিন্নি গোপালবাবুর সাথে আলোচনা না করেই, ছোট জামাইকে জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। একই জায়গাতে বাকি দুই জামাইকে তো বাদ দেওয়া যায় না।

নিমন্ত্রণের খবরটা গোপাল বক্সীর কানে যেতেই তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বার-তের জন মানুষের একদিনের খাবার আয়োজন করা যে কি দুঃসাধ্যের ব্যাপার তা একমাত্র তিনি আর তাঁর সমগোত্রীয় কেউ বুঝতে পারবে।

সাধাসিধে নির্ভেজাল মানুষটি বেরিয়ে পড়লেন অর্থান্বেষণে। ধারের ব্যাপারে তিনি বড়ই সন্ধিহান, কারণ যেখানে যা ধার করেছিলেন কথা মতো শোধ করতে পারেননি। পাড়ার মুদি দোকানদাররা মনে হয় না ধার দেবে। অনেক ভেবেচিন্তে গেলেন কারখানার ইউনিয়ন লিডারের বাড়িতে। যদি কারখানার পাওনা গণ্ডা থেকে কিছু মেলে। ঝান্ডা নিয়ে মিটিং মিছিলে প্রথম সারিতে থাকতেন বলে ইউনিয়ন লিডার রজত সাহা গোপাল বক্সীকে চিনতেন।

বিশাল ঝাঁ চকচকে তিনতলা বাড়ি, বাড়ির সামনে সিকিউরিটি আছে। গোপালবাবু তার কাছে গিয়ে রজতবাবুর সাথে দেখা করার আর্জি জানালেন।

আধ ঘন্টা পর রজতবাবু দেখা করলেন। গোপাল বক্সীর মুখ তাঁর চেনা, তবুও মুখে একটা বিরক্তি প্রকাশ করে জানতে চাইলেন কেন তিনি এসেছেন। গোপাল বাবু সংক্ষেপে বললেন— স্যার, বাজারে অনেক ধার দেনা হয়ে গেছে, সেই জন্য আপনার কাছে আসা।

— হ্যাঁ, আপনাদের ভালোর জন্য তো আমাদের পার্টি মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে অবিরত লড়াই করে চলেছে।

— জানি স্যার, তবুও যদি আমার পাওনা টাকা থেকে কিছু ব্যবস্থা করে দেন। কাতর অনুরোধে কথাগুলো বললেন।

— আরে ওই ভাবে দুম করে চাইলেই কি হয় নাকি!! টাকা কি আমার কাছে, যে আমি দেব। মুখের বিরক্তি আরো বেশি করে ফুটে উঠলো। বৃদ্ধ গোপালবাবু প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, একটু দেখুন স্যার, আমার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। সুইসাইড করা ছাড়া আমার আর কোনো পথ নেই।

রজতবাবু একটু নরম হয়ে বললেন— ঠিক আছে সপ্তা দুই পর আসুন দেখি কি করা যায়!

এক বুক হতাশা নিয়ে গোপালবাবু রজতবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। কাল যে জামাই ষষ্ঠী, কিংকর্তব্যবিমূঢ় গোপাল বাবু অর্থান্বেষণে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে করতে, বিফল হয়ে নিজ এলাকাতে ফিরে এলেন। তাঁর মাথা কাজ করছে না। অন্তত হাজার দুই টাকা না জোগাড় করতে পারলে তো জামাই ষষ্ঠী পর্ব থেকে নিষ্কৃতি নেই। এমতবস্থায় গোপালবাবুর মনে হলো, পাড়াতে একটা নতুন মুদিখানার দোকান হয়েছে, সাজানো গোছানো দোকান, ছাব্বিশ সাতাশ বছরের সদালাপী দোকানদার সোমনাথ ঘোষাল, হবে নাই বা কেন, বুদ্ধিমান ছেলে, শিক্ষিত যে,পরিচয় নেই তবুও একবার যাবেন, যদি কোনো সুরাহা হয়।

দোকান ফাঁকাই ছিল, ফলে গোপাল বাবুর ধার চাইতে বিশেষ কোনো অসুবিধা হলো না। ভয় ছিল প্রতিবেশী কেউ থাকলে হয়তো ইশারা করে সোমনাথকে বাকি দিতে বারণ করে দিত। সাধাসিধে গোপালবাবু দোকানে গিয়ে সোমনাথকে তাঁর সব কথা বলেন— দেখো বাবা, তুমি তো আমার সব কথা শুনলে, এখন যদি তুমি প্রয়োজনীয় মুদি মশলাটা আমাকে দাও তো আমার মানটা বাঁচে। আমি তোমার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব। তবে টাকাটা তুমি পাবে দুই সপ্তাহ পর। রজতবাবু আমাকে তেমনটিই বলেছেন।

সোমনাথ তাঁর অসহায়তা উপলব্ধি করে আর না করতে পারলো না।

ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে ধার কোনো মতেই দেয়া যায় না। সব থেকে বড় কথা সোমনাথ শুধু মাত্র তাঁর মুখ টুকুই চেনে, তাঁর পরিস্থিতির কথা ভেবে বললো, বলুন কি কি লাগবে? গোপাল বক্সী সাত আটটা মালের একটা ছোট লিস্ট করে দিয়ে, একটু নিশ্চিন্ত হয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে দোকানের পাশে একজায়গায় বসে ধূমপান করতে থাকেন। আর সোমনাথ অন্য খরিদ্দার সামলিয়ে তার ফাঁকে গোপালবাবুর মালটা রেডি করতে থাকে। সেই সময় দোকানের সামনে দিয়ে বক্সী গিন্নী যাচ্ছিলেন, গোপালবাবুকে বসে থাকতে দেখে কাছে এসে কারণ জানতে চাইলেন। গোপালবাবু সবিস্তারে স্ত্রীকে সকাল থেকে যা যা ঘটেছে বললেন। স্ত্রী সব কথা শুনে বললেন সব তো হলো কাল সকালে কাঁচা বাজারের কি হবে? বার তেরশ টাকা তো লাগবেই, মাছ, মাংস, সবজি, ফল, মিষ্টি—গোপালবাবু বিড়ির শেষ টানটি দিয়ে বিড়িটা ফেলে বললেন, দেখি কার কাছে গিয়ে হাত পাতা যায়!!! স্ত্রী একটু অভিমানের সুরে বললেন, কে আর তোমাকে ধার দেবে? তার থেকে আমি বলি কি–আমার একটা সোনার চুড়ি আছে ওটা—গোপাল বাবু স্ত্রীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, না –না, তোমার সব বেচে খেয়েছি, বানিয়ে দিতে পারিনি কিছুই। শেষ সম্বল ওই একটা চুড়ি, ওটা থাক। বক্সী গিন্নি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, যা পারো করো, আমি ওদিকটা দেখিগে।

দুজনের কথোপকথন হাতের কাজ করতে করতে সোমনাথ সব শুনলো। তারপর মুদি মশলাগুলো রেডি করে গোপাল বাবুকে ডাকলো। গোপালবাবু মালটা নিতে নিতে বলল— তুমি চিন্তা করো না বাবু, আমার বাড়ি পঞ্চানন্দ ঠাকুর মন্দিরের ঠিক ডান পাশে। টাকাটা হাতে এলে আমি দিয়ে যাব। সোমনাথ গোপালবাবুর ভাগ্যের পরিহাসের কথা ভেবে, মুখে বলল ঠিক আছে, মনে মনে ভাবল, হায়রে সামাজিকতার দায়বদ্ধ শ্বশুর, দায়ের যাঁতাকলে পড়ে নিজের মান, সম্মানটুকুও পিষে ছাতু হওয়ার জোগাড়।

পশ্চিমবঙ্গের একটা অর্থনৈতিক উৎসব এই জামাইষষ্ঠী। জামাইরা সারা বছরে কতবার শ্বশুর বাড়িতে আসে সেটা ধর্তব্যের বিষয় নয়। এই নির্দিষ্ট দিনে মেয়ে জামাই, যদি অপত্য থাকে তারাও সবান্ধবে সসম্মানে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হন। শ্বশুর মশাইকেও চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় সহকারে আপ্যায়ন করতে হয়। হেঁসেলের গুণমান বাড়াতে অগ্নিমূল্য বাজারই যথেষ্ট। আপাত নয়নে সবই সুন্দর লাগে, ব্যবসায়ীরা কত টাকা ঘরে তুলছে তার হিসাব করছে, শাশুড়ি মাতা কতটা জামাই আপ্যায়ন করা যায় সেই চিন্তায় নিমগ্ন। শাশুড়ি

মাতার সেই ইচ্ছাকে সামাল দিতে দুই হাত ভরে শ্বশুরকুল খরচ করছে। এতো পর্দার সামনের দিকের চিত্র, আর পেছন দিক!!

দিনমজুর, হকার, ফুটপাথ ব্যবসায়ী, ছোটোখাটো কাজকর্ম করা শ্বশুরকুলদের ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে যায়। ধারদেনা করে সামাজিকতা পালন করতে হয়। আবার যাদের ন্যূনতম আয়টুকু নেই, কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে, যা গোপাল বক্সীর ক্ষেত্রে হয়েছে। জামাইষষ্ঠীর গুরুত্ব বড়লোক বা গরিবলোক সবার ক্ষেত্রে এক, শুধু অর্থের পার্থক্য।

রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ ধূমায়িত চা খেতে খেতে কথাগুলো সোমনাথ ভাবছিল। গোপালবাবুর তিনটি মেয়ে, তাদের সন্তান, ভাগ্যিস ছেলের বিয়ে হয়নি। মা ষষ্ঠীর কৃপা না পেয়ে যদি মা লক্ষ্মীর কৃপা পেতেন তাহলে হয়তো এমন দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো না। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে গোপালবাবুর ওপর সোমনাথের করুণা হলো। কি জানি আগামী কালকের বাজার খরচটা জোগাড় করতে পেরেছেন কিনা! সোমনাথ মনে মনে এই সিদ্ধান্ত নিল যে আগামীকাল সকালে দোকান খোলার আগে গোপাল বক্সীর বাড়ি যাবে। তখন যদি তিনি টাকাটা জোগাড় করতে না পারেন তবে বারোশ টাকা ওনার হাতে দিয়ে বলবে যে, গোপাল বাবুর হাতে টাকা এলে যেন একসাথে মুদি মশলার টাকা এবং নগদ টাকাটা দিয়ে দেন।

গোপাল বক্সী সমস্ত বিকালটাই ব্যয় করলেন, এ-দোর ও-দোর ঘুরে ঘুরে, যদি হাজার বারশ টাকা ধার পাওয়া যায়। অবশেষে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। বেশিরভাগ লোক পালটা তাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছেন, কয়েকজন অবশ্য ধার দিতে চাননি, তবে পঞ্চাশ একশ টাকা সাহায্য করতে চেয়েছিলেন। গোপালবাবু হাত পেতে তা নিতে পারেননি। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে মনমরা হয়ে চুপ করে চৌকির উপর বসে আছেন। বক্সী গিন্নী এক কাপ চা দিয়ে বললেন, বিকালে চা না খেয়ে কখন বেরিয়ে গেছো বলেও যাওনি, টাকার কিছু ব্যবস্থা হলো? গোপালবাবু গিন্নীর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, গরিব মানুষের হঠাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত নয়, আগুপিছু ভেবে চিন্তে তবেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। চা খেতে খেতে আপন মনে বলতে থাকেন নিজের কত টাকা মালিকের কাছে পড়ে আছে, আর কটা টাকার জন্য ভিখারীর মতো মানুষের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাকে দেখেই পরিচিত মানুষেরা পালাবার চেষ্টা করে। হা ভগবান এই ছিল কপালে। কথাগুলো বক্সী গিন্নীকে

না শুনিয়ে বললেও তিনি শুনতে পেয়ে বললেন, বললাম কারোর কাছে যেতে হবে না, এই চুড়িটা বিক্রি করে কাজ মিটিয়ে নাও, তা আমার কথা শুনলে তো!! মাথায় হাত দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোপালবাবু বললেন, কাল সকালে হয়তো তাইই করতে হবে।

আজ জামাইষষ্ঠী, বক্সী গিন্নী সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা পরে মেয়ে জামাইরা নাতি নাতনীদের নিয়ে এসে পড়বে। সকালে উঠে প্রাথমিক কাজকর্মগুলো ঝটপট সেরে ফেললেন। তারপর চা করে এক কাপ চা নিয়ে গোপালবাবুর বিছানার দিকে যেতে যেতে বললেন– কই ওঠো, আর ঘুমালে চলবে না। চা হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে চুড়িটা নিয়ে স্যাকরার দোকানে যাও দিকিনি। (চা রেখে, মশারির সামনের কোণের দড়ি খুলতে খুলতে) বাজার আসবে তবে রান্না হবে। ঠিক তখনই রান্না ঘর থেকে কিছু পড়ার আওয়াজ পেয়ে, বিড়াল ভেবে সেদিকে ছুটলেন। রান্না ঘরে গিয়ে দেখেন একটা মিসমিসে কালো কুকুর শুকে শুকে কিছু খোঁজার চেষ্টা করছে। বক্সী গিন্নী ঘরের ভিতরে কালো কুকুর দেখে চিল চিৎকার দিয়ে ওঠেন— দুরহ দুরহ, সক্কাল বেলা কি অলুক্ষুণে কাণ্ড!! কুকুর তাড়িয়ে জলছড়া দিয়ে খেয়াল করলেন, ছেলে স্বামী কেউই তখনো ওঠেনি। একটু রেগে গিয়ে বক্সী গিন্নী উচ্চ স্বরে গোপাল বাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছ, দায় দায়িত্ব সব কি আমি সামলাব!

কথাটা বলে বক্সী গিন্নী ঘুমন্ত গোপালবাবুর শরীরটা নাড়িয়ে দিতে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। পাশের ঘর থেকে ছেলে ছুটে এল, ছুটে আসল একদম কাছাকাছি কয়েক জন প্রতিবেশী। গোপালবাবুর শরীর ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পাড়া প্রতিবেশী বাড়তে থাকল। ছেলে ছুটলো ডাক্তার ডাকতে। ঘন্টা খানিক পরে ডাক্তার এসে বাহ্যিক লক্ষণগুলো দেখে জানালেন ঘন্টা চার পাঁচেক আগে গোপালবাবুর ঘুমের ঘোরে মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণের ফলে মৃত্যু ঘটেছে। ❑

বন্ধু

ভগা, এবার যদি কারোর গাছে উঠে আম পাড়িস, আর কেউ যদি বাড়ি বয়ে এসে নালিশ করে যায়, তবে তোকে ঠিক বোর্ডিং-এ রেখে আসবো। দেখবি কেমন মজা। মা শাসনের সুরে ভগাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললেন।

ভগা ওরফে 'ভগবান বসু'। বংশের প্রথম নাতি, তাই দাদু ঈশ্বরের সাথে নাম মিলিয়ে 'ভগবান' নাম রেখেছেন। বর্তমানে বাড়ি এবং পাড়ায় এমনকি স্কুলেও মাস্টার মহাশয় ছাড়া 'ভগবান' নাম অপভ্রংশ হয়ে 'ভগা'-তে পরিণত হয়েছে। ও এতো বিচ্ছু যে 'ভগবান' বলে কারোর ডাকতেই ইচ্ছা করে না। হয়ত ওকে 'ভগবান' ডাকলে ভগবানকেই ছোট করা হবে।

গাংনাপুরের সেজদিয়া গ্রামে অনিল বসুর পৈতৃক ভিটে। অবস্থাপন্ন না হলেও সজ্জন ব্যক্তি হিসাবে পাড়ায় নাম আছে। ভগা অর্থাৎ ভগবান বসু গাংনাপুর হাইস্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র। ছোট ভাই প্রবীর ও বিজয় সেজদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। তারা বেশ শান্তশিষ্ট। (ভগা হাইস্কুলে পড়াতে একমাত্র স্কুল থেকে রিপোর্ট আর প্রতিবেশীর নালিশ ছাড়া তার দৌরাত্ব বাড়িতে ঠিকঠাক জানতে পারতো না।)

মা ভগাকে চালের কাঁকর বাছতে দিয়েছেন। ভগা চালের কাঁকর বাছতে বাছতে ঠাকুরমার সাথে গল্প করছে। আজ নাকি পাশের পাড়ায় পেঁচো, ঠাকুরদার পেয়ারা গাছে পেয়ারা পাড়তে উঠেছিল। পেঁচো পেয়ারা পাড়তে পাড়তে গাছের একদম মগডালে উঠে পড়েছে। তারপর সেই ডাল পেঁচোর ভার রাখতে না পেরে বেঁকে নিচের দিকে কাত হয়ে পড়তে থাকে। ততক্ষণে সবাই টের পেয়ে গেছে। পেঁচোকে তখন ধরে মারবে কি! সবাই তখন হায় হায় করছে যাতে ও নিচে পড়ে মারা না যায়! ঠাকুমা ফোকলা দাঁতে বিস্ময়ে জানতে চান তারপর কি হল? ভগা চাল বাছা বন্ধ করে ঠাকুরমার দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো পাকিয়ে সাসপেন্সটা বর্ণনা করতে থাকল। পেয়ারা গাছের নিচে ছিল চিচিঙ্গার মাচা আর সেই ডাল ভেঙে এসে পড়ল মাচার উপর। আর তাতেই রক্ষে। অনিলবাবু একটা কচার ডাল ভেঙে এনে ভগার পাছায় কটা বাড়ি মেরে বলেন জানোয়ার পেঁচো পড়ে মরছিল? ভগার পাছায় কচার বাড়ি পড়ায়, ভগা বাবাগো বলে এক লাফে মাঠের দিকে দৌড়। পরে জানা গেল পড়ে মরছিল পেঁচো নয় ভগা নিজেই। নিজের বিপদের কথা পেঁচোর উপর দিয়ে চালাচ্ছিল।

ভগা বড়দাদা, সুযোগ পেলেই শান্ত দুই ভাইকে একটু শাসন করে নেয় আবার শিক্ষাও দেয়। যেমন অনিলবাবু বাজার থেকে পনির কিনে এনেছেন। ছোট দুইভাই কয় পিস পনির খাবে তাই নিয়ে খুব উৎসাহিত। ছোট ভাই উচ্চারণ ভুল করে বলছে আমি চার পিস ফনি খাব পাশে বসে অঙ্ক করছিল ভগা বিজ্ঞের মত মাথা তুলে ভাই–এর দিকে তাকিয়ে বললো কথাটা ফনি নয় পনি। মনে থাকবে, পনি আবার বাবা হয়ত তিন ভাইকে পড়াতে বসিয়ে একটু এদিক ওদিক গেছেন সঙ্গে সঙ্গে ভগা দুই ভাইকে শাসন শুরু করে দেবে। পারলে দুই একটা চড় চাপড় মেরে বাবার কাছে নিজে খাওয়া চড় চাপড়টা উশুল করে নেয়।

ক্লাস টিচার অশোক মাস্টারকে ভগার একদম পছন্দ নয়। শুধু বকাবকি করবেন আর ফাস্টবয় অরিন্দমের সঙ্গে তুলনা করবেন। ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলবেন যা বুঝতে ভগার খুবই অসুবিধা হয়। অরিন্দমের হাতের লেখা ভাল, অরিন্দম রোজ পড়া করে স্কুলে আসে, অরিন্দম আশি শতাংশ নম্বর পায় আরও কত কি। ভগা ভেবে পায় না উনি এমন করেন কেন? অরিন্দম মণ্ডল আর ভগবান বসু কি এক? পার্থক্য তো থাকবেই, এতে এতো বলার কি আছে! একদিন মনের কথাটা পাশে বসা বিলেকে ভগা বলে দিল। পেট পাতলা বিলে সেটা আবার অশোক মাস্টারকে বলে দেয়। অশোক মাস্টার বিলের মুখ থেকে কথাটা শুনে ভগাকে ব্যঙ্গ করে বলেন, কি হে ভগবান বোস তুমি একটু অরিন্দম হয়ে দেখাও না। অরিন্দম কিন্তু ইচ্ছা করলেই তুমি হতে পারবে। ভগার ক্ষোভ আরো বেড়ে যায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে সুযোগ যদি পায় তো অরিন্দমকে ভগা করেই ছাড়বে।

স্কুলে যাওয়ার সময় ভগা কখনই সময় মত তৈরি হয় না। ওর সহপাঠি রতন এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে। দুজনে এক সাথে স্কুলে যায়, আবার ফেরেও এক সাথে। ভগার কিছু দুষ্টুমি বাড়ির লোক রতনের থেকেই জানতে পারে।

একদিন স্কুল ছুটির পর ভগারা কয়েক জন বন্ধু মিলে বাড়ি ফিরছে। এর মধ্যে এক আইসক্রিমওয়ালা এসে পড়ায় সবাই টিফিনের পয়সাতে আইসক্রিম কিনে খেতে শুরু করল। পারল না ভগা কারণ ওর পয়সা স্কুলে ঢোকার আগেই ঘুগনি খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। গরমের দিনে ঠান্ডা আইসক্রিমের মজাই আলাদা। কিন্তু ভাগ দেওয়া খুব মুশকিল। ভগা, আইসক্রিমওয়ালার কাছে একটা আইসক্রিম বাকি চায়। কিন্তু আইসক্রিমওয়ালা না দেওয়ায় নিরাশ হয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। হঠাৎ পিছন থেকে এই খোকা বলে কেউ ডাকতেই ভগা ঘাড়

ঘুরিয়ে দেখে মোড়ের মাথায় বসা মদন খোঁড়া। ভগা এগিয়ে যেতেই ওর হাতে চারআনা দিয়ে বলে যা আইসক্রিম কিনে খা। ভগা ইতস্তত করায় ভিক্ষুক বলল, এতো ভাবতে হবে না। আইসক্রিমওয়ালা যে চলে গেল। ভগা ভিক্ষুকের হাত থেকে চার আনা পয়সা নিয়ে ছুটল আইসক্রিম কিনতে।

মদন দাস, জন্ম থেকেই নিম্নাঙ্গ পলিও আক্রান্ত। সরু লিকলিকে দুই পায়ে কোনো জোর পায় না। গরিব ঘরে জন্ম, পড়াশোনা শিখতে পারেনি। যতদিন বাবা–মা বেঁচেছিলেন ততদিন শারীরিক কষ্ট ছাড়া খাওয়া দাওয়ার কষ্ট ছিল না। বাবা–মা মারা যাওয়ার পর বাকি দুই ভাই মদনকে ভাঙাচোরা দরমার ঘরটাকে দিয়ে বাকি অংশ বিক্রয় করে দূরে চলে গেছে, যাতে মদনকে না দেখতে হয়। অগত্যা মদন মোড়ের মাথায় বসে খঞ্জনি বাজিয়ে হরিনাম করে ভিক্ষা করে। ওকে 'মদন খোঁড়া' বলে সবাই ডাকে। চার আনা, আট আনা যা পায় তাই দিয়ে ভাতে ভাত ফুটিয়ে দিনের বেলাটা কেটে যায়। রাত্রে অর্ধেক দিন খাওয়া জোটে না। তবুও মুখে হাসি নিয়ে হরিনাম করে, যেন ওর কোনো কষ্টই নেই। হয়ত, এটাই শ্রীহরির কৃপা।

মদন হরিনাম করে ভিক্ষা করছে। সেই সময় ভগা এসে হাজির। মদন গান করতে করতে ভগাকে বসতে ঈশারা করে। ভগা না বসে চার আনা পয়সা নিয়ে হাতটা মদনের দিকে এগিয়ে দেয়। মদন গান থামিয়ে অবাক হয়ে বলে, কি ব্যাপার খোকা?

— ভগা – কালকের চার আনা।

মদন অবাক হয়ে বলে, আমি কি তোকে ফেরত দিতে বলেছি! ভগা মাথা নাড়িয়ে, না, মা বকেছে।

মদন একটু হেসে বললো, ''না বললেই হতো ভগা বলে রতন বলে দিয়েছে। মদন বললো ওটা রাখ। আজ কিছু খেয়ে নিস। ভগা বললো আজ স্কুল ছুটি, তুমি পয়সা নাও। মদন আর জোর করল না। সে বুঝল গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করে লাভ নেই। তারও তো দানের পয়সা। মদন ভগার হাত থেকে চারআনা নিয়ে ওকে বসতে বললো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, খোকা তোর নাম কি? ভগা বলল, ভগবান বোস। মদন বেশ আনন্দিত হয়ে বলল, বা! বা! স্বয়ং শ্রীহরি আমার কাছে এসেছেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। ভগা অবাক হয়ে গেল। মা ছাড়া কেউ কখনও তাকে কাছে ডেকে নামের প্রশংসা করে কথা বলেনি। ভগাও আপ্লুত হয়ে গেল। ভাবল, এতো দিনে বুঝি মনের মত একজন মানুষ পেল।

বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ভগার লম্ফ-ঝম্ফ নেই। খাওয়ার জন্য চেঁচামেচিও করছে না। বই-এর ব্যাগটা তাকে রেখে চৌকির এক কোণে গিয়ে চুপ করে বসে আছে। মায়ের মন যে, উনি দেখে একটু অস্বাভাবিক লাগায় কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করেন। ভগা কিছুই বলতে চায় না। কিছু হয়নি বলে চুপ করে বসে থাকে। মা এর অনেক প্রশ্ন বানে শুধু বলে অশোক মাস্টার মেরেছে। কেন মেরেছে প্রশ্ন করায় অনেক জোরাজুরি করে জানতে পারল খাতায় চার-এর জায়গাতে পাঁচ লিখেছিল তাই। মা জামা খুলতেই দেখেন ফরসা গায়ে লাল লাল বেতের বাড়ির দাগ পড়ে গেছে। উনি একটু রাগান্বিত ভাবে বললেন, শুধু চার এর জায়গায় পাঁচ লেখার জন্য এই ভাবে মারলেন। অনিলবাবুর সন্দেহ হল। উনি বিজয়কে বললো রতনকে ডেকে আনতে, তাহলেই সব জানা যাবে। অতঃপর রতন আসলে জানা গেল, স্কুলে ইংরেজি মাস্টার অশোকবাবু কুমিরের রচনা লিখতে দিয়েছিলেন। সবাই লিখছে। ভগার পাশে বসা অরিন্দমও লিখছে। হঠাৎ করে অরিন্দমের হাত থেকে কলমটা বেঞ্চের নিচে পড়ে যায়। অরিন্দম বেঞ্চের নিচে কলম কুড়াতে গেলে ভগা সেই ফাঁকে অরিন্দমের খাতায় Crocodile has four legs and one tail-এর four কেটে five করে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল অশোক মাস্টারের প্রিয় ছাত্র অরিন্দমকে একটু বকুনি খাওয়ানো। কিন্তু তার পাশের বেঞ্চে বসা বিলে সেটা দেখে ফেলে। এক সময় খাতা জমা পড়ল। স্বভাবসিদ্ধ ভাবে অশোক মাস্টার অরিন্দমের প্রশংসা করতে করতে খাতার মধ্য থেকে অরিন্দমের খাতাটি খুঁজে বার করলেন। কারণ ওর লেখাই অন্য সকলের কাছে উদাহরণ হয়। অশোকবাবু পড়তে গিয়ে যেই দেখলেন কুমিরের চারটি পায়ের জায়গাতে পাঁচ লেখা হয়েছে। ভিষণ রেগে গিয়ে উনি অরিন্দমকে বেঞ্চের উপর দাঁড়াতে বললেন। কারণ ভাল ছেলেরা ভুল করলে শাস্তি বেশি পেতে হয়, যাতে তারা ভুলেও যেন ভুল না করে। ভগার বুকটা জুড়িয়ে গেল। বহু দিনের সাধ ছিল অরিন্দমকে একটু বকা খাওয়ানো। এদিকে অরিন্দম হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে জানায় যে সে চারটি পাই লিখেছে। ও যে জানে কুমিরের চারটি পা। খামোখা পাঁচটি লিখতে যাবে কেন? এদিকে বিলে প্রথমে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। ব্যাপারটা যখন বুঝল, সটান উঠে দাড়িয়ে বলে দেয়। অরিন্দম যখন বেঞ্চের নিচে কলম তুলতে গিয়েছিল, ঠিক তখন ওর খাতায় ভগা কিছু একটা লিখেছিল। ব্যাস ঘটনাটা অশোক মাস্টারের কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। উনি অরিন্দমকে বসিয়ে ভগাকে ডেকে এনে উত্তম-মধ্যম বেতের বাড়ি দেন।

মা–এর মন তো রক্ত জমা দাগ হওয়া শরীরে নারকেল তেল লাগাতে লাগাতে অপত্য স্নেহ এবং শাসনের মিশেলে বলেন, ভগা একটু মানুষ 'হ'। দাদু অনেক আশা করে তোর নাম রেখেছিলেন 'ভগবান'। আর তুই সেই নামটা ডোবাচ্ছিস। ছোট ভাই দেখতো কত শান্ত, পড়াশোনায় ভাল। কই ওদের দুজনের নামে কেউ কখনো তো কোন নালিশ করে না। আজ আর ভগা মাকে কোনো অজুহাত দেখায় না। মার কথাগুলো শোনার পর ওর শরীরের জ্বালাটা যেন আরো বেড়ে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো। মা কোলে টেনে তাঁর বুকের মধ্যে নিয়ে পুত্রের যন্ত্রণার কিছুটা ভাগ নেওয়ার চেষ্টা করলেন। অশ্রুসজল চোখে বললেন, ভগা নিন্দেটা আমাদের হচ্ছে কিন্তু শরীরের কষ্টটা শুধু তোরই হচ্ছে। ওর ভাগ যে কেউ নিতে পারবে না। ভগা বন্ধু–বান্ধব সব ছেড়ে দিয়েছে। ওরা শুধু তার অসময়ের মজা নেয়। একাই স্কুলে যায় একাই বাড়িতে আসে। মনে মনে ভাবে মার কথা শুনে চলবে। এখন তার এক মাত্র বন্ধু মদন কাকা। মদন কাকাই তাকে বোঝে। স্কুলে যাওয়ার পথে মদনের কাছে একটু বসে। মদন হরিনাম করে গান করে আর ভগা সেইসময় খঞ্জনি বাজায় তারপর স্কুলে যায়। এমন ভাবেই দিন কাটছিল।

হঠাৎ একদিন ভগা স্কুলে যাওয়ার পথে মদনের অখড়ায় গিয়ে দেখে মদন নেই। শিশুমন ভাবল মদন কাকার কুঁড়ে ঘর চাপা পড়ে কিছু হল না তো? ছুটল জীর্ণ কুটিরের দিকে গিয়ে দেখল, না ঘর তো ঠিকই আছে। ভগা বাইরে থেকে ডাকল ও কাকা ভেতর থেকে করুণ স্বরে উত্তর আসে, আয় বাপ ভেতরে আয়। ভগা ভেতরে গিয়ে দেখে মদন কাকা বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে নিম্নাঙ্গের অকেজো অংশের যন্ত্রণা উপর পর্যন্ত উঠে গেছে। ঘাড় সোজা করে বসতে পারছে না। হাত ও নাড়তে পাড়ছে না। কাতর স্বরে জলের কুজোটা হাতের কাছে দিতে বললো। ভগা এগিয়ে এনে দিলে কিছুটা জল খেয়ে বললো, যা বাপ ইস্কুলে যা, দেরি হয়ে গেলে তোকে আবার মাস্টার মারবে।

বিকালে স্কুল থেকে ফিরে ভগা খেতে বসে। কিছুটা খেয়ে ভগা উঠে পড়ে। মনে পড়ে যায় মদন কাকার কিছুই খাওয়া হচ্ছে না। শুধু জল খেয়ে মড়ার মত বেঁচে আছে। সন্ধ্যা বেলা ঠিক সময়ে পড়তে বসে। মন দিয়ে পড়াগুলো করে। মাও ভগার পরিবর্তন দেখে খুশি হন। রাত্রের খাওয়া দাওয়ার পর মাকে জড়িয়ে ধরে বলে মা ইস্কুলে আমার ভীষণ খিদে পায়। মা হাসতে হাসতে বলেন কেন স্কুলে যাওয়ার সময় তো তোমার টিফিন খাওয়ার পয়সা দেওয়া হয়। ভগা বলে, ধুস ওতে পেট ভরে না। মা আরো জোরে হেসে ঠাট্টা করে বলেন কাল

থেকে একথালা ভাত নিয়ে যাবি, দেখবি পেট ভরে গেছে। ভগা অতি আনন্দে এক মউকায় মার কোল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, সত্যি দেবে?

ভগাকে পর দিন সকালে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে হয়নি। সময় মত উঠে হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসে। পড়া হয়ে গেলে চৌকির তলা থেকে পুরনো টিফিন কেরিয়ারটা বার করে মায়ের কাছে নিয়ে যায়। মা তাতে রুটি সব্জি আর একটু গুড় ভরে দেন। ভগা স্কুল টাইমের একটু আগেই বেরিয়ে পড়ে।

ক্লাস টিচার অশোকবাবু ক্লাসে ঢোকার পর ভগা ছুটতে ছুটতে এসে ক্লাসে ঢোকে। প্রথম দিন অশোকবাবু সতর্ক করে দেন, এমন যাতে না হয়। কিন্তু এতে কোনো কাজ হয় না। পরদিনও ভগা দশ মিনিটের বেশি দেরি করে ক্লাসে ঢোকে। অশোকবাবু রেগে গিয়ে ভগার দুই হাতে তিন তিন ছয় বার জোরে জোরে বেত্রাঘাত করেন। ভগা চুপচাপ, কোনো অজুহাত না দেখিয়ে বেত্রাঘাত হজম করে বেঞ্চে গিয়ে বসে। এই ভাবে চার পাঁচ দিন চলার পর অশোকবাবুর সন্দেহ হয়। উনি ভাবেন চুপচাপ রোজ রোজ বেতের বাড়ি হজম করে ক্লাসে ঢোকে, দুষ্টুমি করে না। অন্য ছেলেরা হাসাহাসি করলে প্রতিবাদ করে না। ওনার কাছে ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। স্কুল চলাকালিন উনি পরেরদিন ভগাদের বাড়িতে চলে এলেন। ইদানিং ভগার আচরণগুলো অনিলবাবুকে বললেন। ভগার মা শুনে অবাক। ভগা রোজ স্কুল টাইমের কিছুটা আগেই বেরিয়ে যায়। আরও অবাক হয়ে বললেন, স্কুলে যে মার খায় তাও আমরা জানতে পারিনি। অশোকবাবু বললেন, আমি খোঁজ নিচ্ছি। তবে আপনারাও নজর রাখুন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে পৌঁছাতে কেন এতো সময় লাগে!

সময় মত স্নান খাওয়া সেরে টিফিন গুছিয়ে নিয়ে ভগা রোজকার মত স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা হল। পিছনে ভগার বাবা–মাও ওকে অনুসরণ করবেন বলে বাড়ি থেকে বার হলেন। পথে দেখা অশোক বাবুর সাথে। উনি ব্যাপারটা জানার জন্য ভগাদের বাড়ির কাছাকাছি অপেক্ষা করছিলেন। তিনজনে মিলে ভগার আচরণের আলোচনা করতে করতে ভগাকে অনুসরণ করে চলেন। ভগা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে মদন খোঁড়ার কুটিরে গিয়ে ঢুকল। এদিকে অশোকবাবু, অনিলবাবু আর ভগার মা কুটিরের কাছে এসে অতি সন্তর্পণে দরমার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগল ভগা ওখানে কি করছে! মদন খোঁড়া আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছে। সারাদিন ওই একবার চারটে রুটি খায়। ভগা কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল ভরে মদনের পাশে বসে। তারপর টিফিন কৌটো খুলে রুটি ছিঁড়ে সব্জি মাখিয়ে মদনের গালে তুলে দেয়। মদন অশ্রুসজল চোখে

বলে, আগের জন্মে তুই আমার বাপ ছিলি। ভগা হেসেই খুন। হাসতে হাসতে বলে তাই হয় নাকি। তোমার বাবা তো আমার থেকে কত বড় তুমিও তো আমার থেকে বড়। মদনের চোখের কোণ দিয়ে নোনা জল গড়িয়ে মুখ পর্যন্ত চলে আসছে। ভাঙা গলায় বলে, জানিনা, মনে হয় একটু পুণ্যি করেছিলাম, না হলে স্বয়ং শ্রীহরি তোর রূপ ধরে আমার কাছে আসেন! ভগা বিরক্ত হয়ে বলে খাও তো। আমার আবার দেরি হয়ে যাবে। অশোক মাস্টারের বেতের বাড়ি তো খাওনি, খেলে বুঝতে আমার হাতে এখনো দাগ আছে। হাতটা মদনকে দেখায়। মদন একই ভাবে বলে চলে তুই আসিস না। ভগা শাসনের সুরে বলে ওঠে, আমি না এলে তোমার কি হবে? মদন একরাশ হতাশা নিয়ে বলে, কি আবার হবে! বেঁচে আর আছি কই বল? নাহয় না খেয়ে শুকিয়ে মরে যাব। আমার আত্মা যাবে শ্রীহরির চরণে আর শরীরটা পড়ে থাকবে ঘরে। তারপর যখন পচন ধরবে, পুলিশ এসে শরীরটা নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

ভগার চোখ জলে ছলছল করে উঠল। নরম সুরে আস্তে আস্তে বললো আমার বন্ধুর কি হবে? মদন বুঝতে পারে ভগা কচি মনে আঘাত পেয়েছে। হালকা করার জন্য বলে যা, ভগা স্কুলে যা। তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই সব কথোপকথন–এর মধ্যে মদনের খাওয়া হয়ে যায়। ভগা টিফিন কৌটো গুছিয়ে রেখে মদনকে বলে, সাবধানে থাকবে আমি ইস্কুল ছুটির পর আসব।

এগারোটা বেজে দশ মিনিট হয়ে গেছে। ভগা স্কুলের দিকে দৌড়ায়। কুটিরের পেছন থেকে সমস্ত ঘটনা নিরীক্ষণ করে তিনজনে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। অশোক মাস্টার বাঁ–হাত দিয়ে চশমাটা খুলে, ডান হাতের রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলেন—

I am proud of my boy. You are not Bhagaban Bose. You are only Bhagaban. ❑

সলিল চক্রবর্ত্তী একজন লেখক। তার লেখনীতে প্রান্তিক মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চস্থানে বসবাসকারী মানুষের মনে কথাগুলো সাহিত্যের ভাষায় পরিবেশন করে খ্যাত হয়েছেন। তার এই চিন্তা অনেক মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। তার ভাবনায় উঠে আসা কাব্যিকরস সমৃদ্ধ মানুষ স্বকীয় সৃজনশীল প্রতিভাকে তুলে ধরতে পেরেছে। তাই ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক সাহিত্যপত্রিকা 'বোধিভারতী'-র সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে সমাদৃত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এর আগে 'সবুজ স্বপ্ন আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা' অনলাইন ভিত্তিক সাহিত্য পত্রিকাগোষ্ঠী তাকে যথার্থ সম্মানে ভূষিত করেছেন। আমি তার উত্তরোত্তর লেখনীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। অদূর ভবিষ্যতে তাকে নিয়ে, তার লেখনি নিয়ে গর্ববোধ করতে আমরা সকলেই মুখিয়ে থাকলাম।

ডঃ ভিক্ষু রতনশ্রী,
সভাপতি, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা এবং
উপ-সংঘরাজ, ভারতীয় ভিক্ষু মহাসভা (বিহার)

.....

শ্রী সলিল চক্রবর্ত্তী একজন সৃষ্টিশীল মনোভাবাপন্ন উদীয়মান তথা নবীন লেখক। মতাদর্শ আর সৃষ্টিশীল চিন্তাধারায় ও ব্যবসায়ীক ব্যস্ততায় রত থেকেও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত করে, পরিবার তথা সমাজের প্রতি থাকা দায়বদ্ধতা প্রতি সদা সচেতন এক যুবক। ব্যবসায়ীক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও শ্রী সলিল চক্রবর্ত্তী অনেক কষ্ট স্বীকার করে সমাজের বিবিধ বিষয়ে আলোকপাত করে মনোরঞ্জনজনিত লেখনীর উৎকর্ষতা প্রমাণ স্বরূপ এই বইখানি পাঠকের মনের খোরাক যোগাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রী দেবব্রত গুহ,
প্রাক্তন মুখ্য নিরাপত্তা পরিদর্শক,
উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

.....

সাধুবাদ জানাই সলিল চক্রবর্ত্তীকে। ওনার এত কাজকর্মের মধ্যে যে এই লেখনী-বিদ্যাটা চর্চা করেছেন সেই জন্য আবারও ওনাকে অভিবাদন জানাই।

তবে কি জানেন তো আমাদের মাঝে যতক্ষণ একজন স্বীকৃতি না পায় ততক্ষণ তো আমরা তার মূল্যায়ন করি না সেভাবে! তবে আপনার হয়তো সেই দিনটা আসন্ন, এই বইটাই হয়তো তার সূচনা।

আপনার একদুটি লেখার কথা না বলে পারলাম না। যেমন— নিঃসঙ্গ, আব্বাস একটি মনের নাম, ফুলমনির আখ্যান, বন্ধু, জামাইষষ্টি ইত্যাদি। যা আমার মনে দাগ কেটে গেছে। আসাকরি এই বইটি পাঠকদের মনেও দাগ কেটে যাবে। আপনি এগিয়ে চলুন আমি ও আমার পরিবার তো আপনার সাথে একই সারিতে দাঁড়িয়ে আছি, বিপরীত দিকে নয়, পাশাপাশি এক একজন গুণমুগ্ধ হিসেবে। যাঁরা এই বইটি পড়বেন তাদের জন্য রইলো আমার প্রণাম ও ভালোবাসা।

—অনিরুদ্ধ চক্রবর্ত্তী,
অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম ট্যাক্স অফিসার

.....

আজকের বর্তমান আধুনিক জীবনে একজন উদীয়মান লেখক হিসাবে শ্রী সলিল চক্রবর্ত্তী, প্রতিটি গল্পকে পাঠকদের কাছে যেভাবে পরিবেশন করেছেন সেটি তাঁর প্রতিভার এক দুর্লভ নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করতে হয়। আমি একজন তার গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবে এইটুকু বলতে পারি যে, লেখক তার লেখনি বৈচিত্রের মাধ্যমে এক নিজস্ব ঘরানা তৈরি করেছেন।

সৌমিক সেনগুপ্ত,
বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত।

.....

স্বল্প সংখ্যক মানবগণ অনবদ্য লেখনী সৃষ্টির অবদান রাখিয়া যান। লেখক ভদ্রমহোদয়টিকে আমার নিকট তাহাই মনে হইয়াছে। মানব মনের কল্পনা

শক্তিকে অতি যত্নসহকারে শব্দগুচ্ছ দ্বারা চক্ষু সম্মুখে গল্পাকারে চিত্রিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। আমার মনাভ্যন্তরে ওনার প্রত্যেকটি গল্পলেখনি এক বিশেষ চিহ্ন রাখিতে পারিয়াছে। আশাকরি ব্যক্তি বিশেষে এই মন্তব্যটি আগামীতে প্রতিটি পাঠকবর্গের নিকট অতি গ্রহণযোগ্য হইবে।

সোমনাথ প্রামাণিক,
সম্ভ্রান্ত ব্যাবসায়ী।

.....

আমি লেখক শ্রী সলিল চক্রবর্ত্তীর সব লেখা গল্প পড়েছি। ওনার লেখাগুলো মনকে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে এবং ওনার লেখার মধ্যে সবসময় একটা শিক্ষনীয় বিষয় পরিলক্ষিত হয়।

সঞ্জয় মাসিদ,
বিক্রয় ব্যবস্থাপক, পরাগ ফুড প্রাইভেট লিমিটেড

.....

শ্রদ্ধেয় শ্রী সলিল চক্রবর্ত্তী 'সবুজ স্বপ্ন আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা' অনলাইন পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ও কবি। তার লেখা ছাড়া আমাদের পত্রিকা বলা যেতে পারে অসম্পূর্ণ।

তিনি তার প্রতিটি সাবলীল লেখার মাধ্যমে বার বার সমাজের ভালোমন্দের প্রতি একটি সুন্দর সুস্পষ্ট বার্তা বহন করেন। তার লেখার দক্ষতা এতটাই নিপুণ ও অতুলনীয়, যে তার চারপাশের পরিচিত মানুষদের ঘটনার রসদ নিয়ে, তিনি মুহূর্তের মধ্যে একটি সুন্দর গল্পের রূপ দিতে পারেন। তাই সৃষ্টিশীল এই লেখক

অতি সাধারণ ঘটনাদি বুদ্ধিমত্তার সাথে বিশ্লেষণ করে এক অসাধারণ রসবোধাত্মক মুহূর্তের আস্বাদ দেন তার লেখার মাধ্যমে। লেখাগুলির মধ্যে ‘অধিকার’, ‘আত্মার আকুতি’, ‘নিঃসঙ্গ’, প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাবসায়ী হবার পাশাপাশি যে একজন সুন্দর মানের লেখক হওয়া যায়, জীবনে ওনার সংস্পর্শে না আসলে সেটা হয়তো উপলব্ধিই করতে পারতাম না। পরিশেষে আমি তার চিন্তাশীল লেখনী প্রতিভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও সম্বৃদ্ধি কামনা করি।

রঞ্জিত চক্রবর্ত্তী,
সম্পাদক – সবুজ স্বপ্ন

লেখক পরিচিতি

সেদিনটা ছিল ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৬৭ সাল। বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত হিঙ্গলগঞ্জ থানার এলাকাধীন চার নম্বর স্যাণ্ডেলেরবিল নামক গ্রামে 'রামধনু' নামীয় গল্পগ্রন্থের লেখক শ্রী সলিল চক্রবর্ত্তী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বনামধন্য শ্রী কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন সরকারি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিভাগের একজন বিশ্বস্ত সুদক্ষ কর্মচারী। মাতা শ্রীমতী কাবেরী চক্রবর্ত্তী গৃহকর্মনিপুনা এক বিদুষী মহিলা। তাঁদের পাঁচ সন্তানের অন্যতম শ্রী সলিল চক্রবর্ত্তী। ছোট বেলায় ছিলেন এক ভবঘুরে বাউন্ডুলে প্রকৃতির বালক। তাঁর শৈশবের তিন বছর অতিবাহিত হয় নিজ গ্রামেই। পরের সাত বছর অর্থাৎ কৈশোরকাল অতিবাহিত হয় বসিরহাট থানার অন্তর্গত ধলচিত্রা নামক গ্রামে। এখানেই শেষ হয় প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব। পরে দমদম জংশনের শেঠবাগান আদর্শ বিদ্যামন্দির থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাঠ শেষ করে, দমদম মতিঝিল কমার্স কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক হন। পরে নানা বাধাবিপত্তির মাঝে পড়ে পড়াশুনায় ইতি পড়ে। অবশেষে আত্মনির্ভর হওয়ার তাগিদেই মুদিখানা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ উক্ত কাজেই লিপ্ত আছেন। এবং সময় ও সুযোগ পেলেই কিছু লেখালেখি করেন।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সুসাহিত্য একজন সুমনা সংস্কৃতিবান মানুষের মনমুকুরে সদা অনুরণিত উন্নততর চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ। তিনি আত্মমগ্ন নন। আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া। লেখক এই মন্ত্রে বিশ্বাসী। তাই সামান্য একখানা মুদিখানার মালিক হয়েও অন্তরের তাগিদেই অন্তরের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসাই তাঁর আনাড়ী হাতে তুলে দিয়েছে প্রতিবাদের মশিলিপ্ত পথ চলার মহামন্ত্র। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরও তাঁর কলম পথচলা বন্ধ করেনি।

সুগ্রন্থিত গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে একজন সুদক্ষ গল্প লেখকের সুচিন্তিত মননের সফল প্রতিফলন। সাহিত্যচর্চা ও শিল্প সাধনাকে গতিশীল রেখে সমাজের কল্যাণের স্বার্থে সৃজন উদ্যোগকে দীপিত করার লক্ষ্যে লেখনীকে সচল করার প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই। সাহিত্য লেখকের নিজ মনমুকুরের তলে প্রতিফলিত নিজ অন্তরের ব্যাথা বেদনা, আশা আকাঙ্খার মুখচ্ছবির সহস্র প্রতিরূপের প্রকাশ। সুস্থ সমাজ গঠনে তাড়নায় পরিচ্ছন্ন চিন্তার বাহন হয়ে। মূর্ত হয়ে উঠেছে লেখনীর প্রতিটি আঁচড়। তৈরী হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বিপুলবেগ ও অদম্য প্রাণশক্তি। তাই ছোট গল্প লেখক হিসাবে তিনি সার্থক। আমি তাঁর সাহিত্য জীবনের সার্বিক উত্তরণের সাফল্য কামনা করি।

দেবীরঞ্জন রায়

প্রাক্তন শিক্ষক, যোগেশগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়,

উত্তর ২৪ পরগনা।